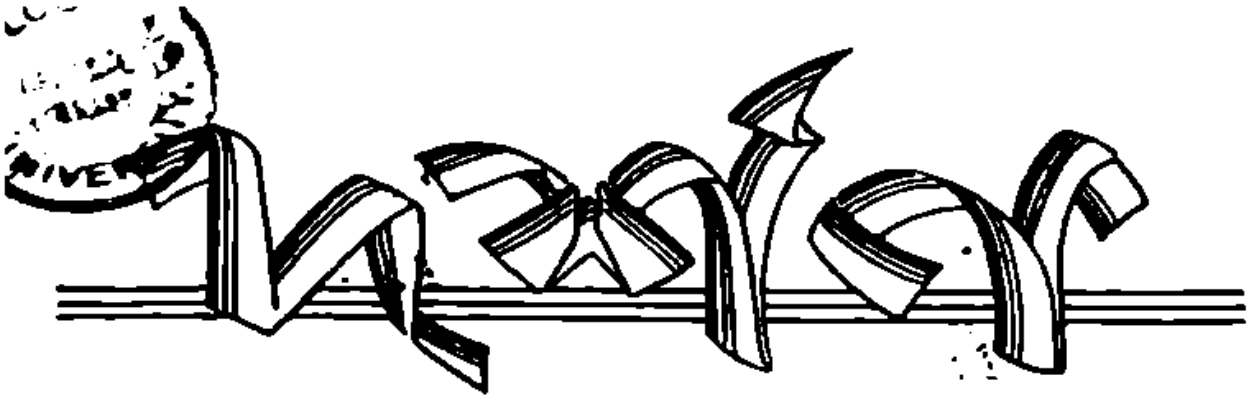

CALCUTTA UNIVERSITY

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ [১৩৬৭ সাল

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী, এম.এ.

মূল্য ১।০ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, তালদহ বাগান লেন, কলিকাতা-৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

756.3
.007

১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ [১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কথার কথা	শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
২।	কার্য-কারণ সাদৃশ্য	শ্রীমিহিরবিকাশ চক্রবর্তী	১৫
৩।	দর্শনের সপক্ষে	শ্রীজয়দেব চক্রবর্তী	২২
৪।	অদ্বৈতাচার্য	শ্রীসীতানাথ	৩০
৫।	সম্পাদকীয়		৩৭

IV

কথার কথা

পোষাকী ও আটপৌরে

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব (পূর্বপক্ষ)

কথা আর আগুন, বলে থাকে, বেশ থাকে, উল্লসিত হয়ে ওঠে 'অস্ত্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়'। কিন্তু বশ যায় কি লুপ্ত হয় সম্মুখের সৃষ্টি, পশ্চাতের নিবারণ, থাকে শুধু নিয়ে নিদারুণ নিপাতের ঘোর আকর্ষণ—একেবারে 'পাপের ছুতোরে পাপ সন্ধায় মাগিছে'। বশ-না-মানা আগুন যা পায়, তাই ছারখার করে। খুবই ভয়ঙ্কর। কিন্তু বশ-না-মানা কথা আরও ভয়ঙ্কর। এ যায় পায় তা ত' ছারখার করেই যা পায় না তাও। আসলে এ কি যে পাচ্ছে, আর কি যে পাচ্ছে না, বলে আছে কি নেই, তা অনেক সময়ই বুঝতে পারা যায় না। তাই 'আপনি কি হারাইতেছেন, তাহা জানেন না', কথন তীরে ফেলে ফিরে নিলেন, সোনা মাটিতে রেখে আঁচলে গিরে দিলেন, হিসাব ছুট নিয়েই মেতে রইলেন কি না, তাই টের পাবেন না। বশ না মানা কথার মত ভয়ঙ্কর কিছু নাই। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি শুধু নয়, শত্রাবুরিতি বক্তব্যে ত্বত্রাবু ত্বওয়াই নয়—আরও গুরুতর ক্ষতির ফল ফলে কথা যখন বশের বাইরে যায়। মনন হয় অবশ, বিচার বিবশ, সত্য মিথ্যার ভেদ ঘুচে গিয়ে সত্য হয় উৎখাত বাস। উচ্ছিন্ন বস্তু অপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠেয়, ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ তত্ত্বই পরাবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য। তাই একথা সঙ্গত বলেই মনে হয় যে ভাষা যখন বশের বাইরে যায়, বিচার যখন ছুটি নেয়, মননের হাল হয় আলগা, তর্কবিধি শাসিত অনুসন্ধানী জাগ্রত চৈতন্য হয় অবসন্ন এবং সময় বুঝে চুপিসারে মোহনিদ্রার বিষ্ণুপদ ঘায় চৈতন্য আসর জুড়ে বসে, তখনই তত্ত্বলাভ করে

পরাবিজ্ঞান। পরাবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয় বৈজ্ঞানিকও নয়। আচারে, বিচারে, রীতিতে নীতিতে বিজ্ঞান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের।

পরাবিজ্ঞান সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য বর্তমানে অনেকেই করে থাকেন। পরাবিজ্ঞানে অবিশ্বাস যদিও কোন আনকোরা নূতন ঘটনা নয়, যদিও পরাবিজ্ঞানের মতই প্রাচীন, তবু আজকের দিনে এই অবিশ্বাসের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বিশেষ করে ইংরাজী ভাষাভাষী দার্শনিক মহলে এত অল্প আয়াসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে একে একটি নূতন ঘটনাও বলা যায়। বলা বাহুল্য, এমন ব্যাপক একটি ঘটনার উদ্ভবের পিছনে একটি মাত্র কারণই নাই। অনেক কারণই রয়েছে। এবং এদের কোনটি সাধারণ ঐতিহাসিকের আলোচ্য, কোনটি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের, কোনটি বা রাষ্ট্রিক ঐতিহাসিকের এবং কোনটি দর্শনের ইতিহাসের সংকীর্ণ অর্থে দর্শনের ঐতিহাসিকের। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী নিলে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো উন্নতি, নিত্য সীমা ছাড়ানো বিস্তৃতি, দর্শনকে, দার্শনিককে বিচলিত করেছে। এক সময় সব কিছুই ছিল দর্শনের অন্তর্গত। 'নিরবধি বিরাট স্বরূপ যুগ যুগান্তের', 'পূর্ণের পূর্ণজ্ঞান করব আহরণ', এই ছিল দার্শনিকের প্রতিজ্ঞা। জড়, প্রাণ, মন সব কিছুরই রহস্য ভেদ করার আকাঙ্খা ছিল দর্শনের। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসার এই আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করেছে। জড় প্রাণ, মন, এমন কি প্রেতাত্মার পর্যন্ত বিজ্ঞানের—বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য হয়েছে। দর্শনের অধিকার খর্ব হতে হতে, সঙ্কুচিত হতে হতে শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। একথা গ্রাহ্য যে জড়, অথবা প্রাণ অথবা মনের সকল রহস্যই বিজ্ঞান ভেদ করতে পারে নাই। বিজ্ঞান বেলা ভূমিতে উপল খণ্ডই সংগ্রহ করছে এবং জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু দর্শনের মহিমা এজন্য বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই, এ তার অর্থ নয়। এর তাৎপর্য, বিজ্ঞানের জয়রথ আজও তার অধিকারের শেষ সীমায় পৌছায় নাই, হয়ত কোন দিনই পৌছাবে না। তবু যে রহস্য আজও অজ্ঞাত, যে তথ্য আজও অজ্ঞান-অবগুণ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সীমার বাইরে রয়েছে, সেই রহস্য ভেদ করতে হলে সেই অবগুণ্ঠন লুণ্ঠন করতে হলে বিজ্ঞানেরই আরও অধিক চর্চা করতে হবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই ব্যবহার করতে হবে, নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ-সম্পর্ক-রহিত বিশুদ্ধ দার্শনিক মনন একাজে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। আসল কথা, তথ্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর নিরীক্ষণ পরীক্ষণের সাহায্যেই অথবা যে পদ্ধতির মূলে রয়েছে নিরীক্ষণ পরীক্ষণ সেই পদ্ধতির সাহায্যেই দেওয়া যায়। বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা তথ্য জিজ্ঞাসা, তথ্য নিয়ামক

নিয়ম জিজ্ঞাসা, এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতিও নিরীক্ষণ মূলক। তাই বিজ্ঞান অর্জন করেছে বিস্ময়প্রফুল্ললোচননিরীক্ষ্য সাফল্য, তার বিজয়-বেদ-আত্র-মর্দলে ধ্বনিত হয়েছে বিজ্ঞানদেবকত্রাস গর্বগুরু ধ্বনি। দর্শন, বিশেষ করে পরাবিজ্ঞান, এত দিন ধরে ভেবেছে তার জিজ্ঞাসাও তথ্য জিজ্ঞাসা; কিন্তু ব্যবহার করে নাই নিরীক্ষণাদি নির্ভর পদ্ধতি। পরাবিজ্ঞানী তাঁর জিজ্ঞাসাকে তৃপ্তি দেবার জন্য, তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তর্কের পর তর্ক করেছেন, রচন করেছেন সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার জাল, একান্ত ভাবে নির্ভর করেছেন মননের উপর। ফল যা হবার তাই হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতসারে দার্শনিক নিজেরই বল-না-মানা কথার জালে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছেন, আবেগকে দিয়েছেন যুক্তির মর্যাদা, কথার জাল ছিন্ন করবার জন্য নির্মাণ করেছেন আরও সূক্ষ্ম, আরও শ্বাসরোধী আরও বিভীষণ কথার জাল, সৃষ্টি করেছেন নব নব অচলায়তনের।

বিজ্ঞান যেন মুক্ত অঙ্গন, আর দর্শন যেন অচলায়তন। এদের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে দার্শনিক পদ্ধতি, নিরীক্ষণে অপ্রতিষ্ঠিত মনন সর্বস্ব, বিচার-সর্বস্ব পদ্ধতি তথ্য সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন যদি দাবী করে যে মনন-সর্বস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে, বিজ্ঞান যে তথ্য আবিষ্কার করতে পারে নাই, অথবা যে তথ্য নিয়ামক নিয়ম নির্ণয় করতে সক্ষম হয় নাই, সেরূপ কোন তথ্য অথবা নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, তাহলে সে দাবী অগ্রাহ্য হবে, উদ্ভব হবে বিশুদ্ধ বিরক্তি অথবা বঙ্কিম হাস্যেরই। দার্শনিক জিজ্ঞাসা তথ্য জিজ্ঞাসা নয়, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা নয়, বিজাতীয় জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ জিজ্ঞাসা দুরকমের :- তথ্য জিজ্ঞাসা এবং বাক্য জিজ্ঞাসা, পদার্থ জিজ্ঞাসা এবং পদ জিজ্ঞাসা, ভাষিত জিজ্ঞাসা এবং ভাষা জিজ্ঞাসা, অর্থ জিজ্ঞাসা এবং সংকেত জিজ্ঞাসা। প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে না যদি না নিরীক্ষণ পরীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার জিজ্ঞাসার জন্য এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। অবশ্য ভাষা জিজ্ঞাসা বলতে যদি সাধারণ বৈয়াকরণ জিজ্ঞাসা বোঝা হয় তাহলে সেই ঐতিহাসিক, অনুভব-সাপেক্ষ তথ্যবিশেষ জিজ্ঞাসার জন্য পরীক্ষণ প্রয়োজনীয় না হলেও নিরীক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু ভাষা জিজ্ঞাসা বলতে যদি গণিত জিজ্ঞাসার মত কোন জিজ্ঞাসা বোঝা হয় তা হলে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন হয় যে এরূপ কোন পদ্ধতি অপেক্ষিত নয়। বর্তমানে বাক্য জিজ্ঞাসা, ভাষা জিজ্ঞাসা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তাই বোঝা হচ্ছে। ভাষার বৈয়াকরণ, শব্দতাত্ত্বিক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আলোচনা হতে দার্শনিক বৈশ্লেষিক আলোচনা পৃথক।

ভাষার দার্শনিক আলোচনা এক প্রকার গাণিতিক আলোচনা। ভাষা দর্শন সামান্যীকৃত, অধিক বিমূর্ত গণিত। কথাটিকে এভাবেও বলা যায়। গণিত এক প্রকার ভাষাই। তবে এই ভাষার syntax আছে, আকার আছে, কিন্তু semantics নাই, বস্তু-সংকেতক সংকেত নাই। আমাদের স্বাভাবিক ভাষার দুইই আছে। তবু দার্শনিকের চোখে, দর্শনের নিরিখে ভাষা সামান্যীকৃত গণিতই। কারণ ভাষা 'ক' 'খ' প্রভৃতি অসংখ্য বাক্যের সমূহ মাত্রই নয়। তার অন্তর্গত বাক্যগুলির মধ্যে প্রসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বিদ্যমান। তার একটি গঠন পারিপাট্য আছে। 'ক' এবং 'খ'—এই দুটি বাক্যই যদি সত্য হয় তাহলে 'ক' এবং 'খ', 'যদি ক তাহলে খ' 'হয় ক অথবা খ' 'হয় ক অথবা না-খ প্রভৃতি বাক্যগুলি সত্য হয়। এই কথা ভাষার গঠন পারিপাট্যেরই কথা, যদিও বৈয়াকরণ পারিপাট্যের অন্তর্গত কথা নয়, ব্যাকরণ অনুশীলন সাপেক্ষ কথা নয়। একথা নৈয়ায়িক পরিপাট্যের কথা—এবং এই ন্যায় আকার-মাত্র-ধর্মী, সম্পূর্ণ বিমূর্ত, সামান্যীকৃত গণিত। দার্শনিকের বাক্য জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানীয় জিজ্ঞাসা, বৈয়াকরণ বাক্য জিজ্ঞাসা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুভব নির্ভর নিরীক্ষণাদি সাপেক্ষ পদ্ধতি এ জিজ্ঞাসায় অপেক্ষিত নয়। তাই, মনন-সর্বস্ব-পদ্ধতি-নির্ভর দর্শনেরও বিষয় তথ্য নয়, বাক্য; পদার্থ নয়, পদ; ভাষিত নয়, ভাষা; অর্থ নয়, সংকেত; বস্তু নয়, কথা। দর্শন, সংক্ষেপে, কথার কথা।

দর্শনের এই নবরূপের কল্পনা করেন লর্ড রাসেল। গণিত, তার ভিত্তি, গাণিতিক ন্যায় প্রভৃতির আলোচনা তাঁকে উৎসাহিত করেছে এইরূপ কল্পনায় এবং দার্শনিক অচলায়তনের কলুষিত বায়ুমণ্ডল এই কল্পনাকে পাইয়ে দিয়েছে, তাঁর এবং বিপরীত-মূল-বিচার-খিন্ন দার্শনিক সমাজের সহজ স্বীকৃতি। গণিত-বিৎ লর্ড রাসেলের চোখে উনবিংশ শতাব্দীর গণিত শাস্ত্রবেত্তারা কেবল গণিত শাস্ত্রেই বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আনেন নাই, সার্থক দার্শনিক চিন্তার, দর্শনের নব রূপায়নের পথও তাঁরাই খুলে দিয়ে গেছেন। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নির্মাণ করে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে কান্টের দেশ বিষয়ক তত্ত্ব মূল হীন। অন্তর কলন ও সমাকলন শাস্ত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতির সূচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা যে সব কথা গতি এবং দেশের অবিচ্ছিন্নতা, সীমাহীনতা ও বিশ্রামহীন বিভাজনতা সম্পর্কে বলেছেন তা নির্ভেজাল ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্রেগের সংখ্যাতত্ত্বও তেমনি কান্টের পাটীগণিত বিষয়ক মত যে নিষ্প্রমাণ তাই দেখায় নাই, মধ্য যুগীয় পণ্ডিতদের অনেক পরাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন অদ্বয় সত্তা বিষয়ক তত্ত্ব

যে ভ্রান্ত তাও দেখিয়েছে। উপরন্তু ফ্রেগে এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন যার সাহায্যে অবাস্তব, বিমূর্ত, কায়ানিরপেক্ষ ছায়াবৎ অনেক কিছুই, যারা দর্শনকে ভূশণ্ডীর মাঠ বিশেষে পরিণত করে তাদের, সহজেই অপনীত করতে পারা যায়।

অর্থাৎ গণিতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই গণিতবিৎদের এমন অনেক সংখ্যার কথা বলতে হয় যাদের আমরা সচরাচর সংখ্যা বলতে যা বুঝি, যেরূপ ধর্ম-বিশিষ্ট বলে বুঝি, তা বোঝা যায় না, সেরূপ-ধর্ম বিশিষ্ট বলে বোঝা যায় না। ১, ২ এবং এদের সদৃশদেরই আমরা সংখ্যা বলে বুঝে থাকি। কিন্তু −১, −২ প্রভৃতি বিয়োগ চিহ্ন অঙ্কিত সংখ্যাকে কি আমরা ঠিক সংখ্যা বলে বুঝি? তেমনি $\sqrt{2}$ একে কি আমরা সংখ্যা বলে বুঝি? এর বাচ্য যে কি তা কি আমরা ঠিক বুদ্ধিস্থ করতে পারি? $\sqrt{-1}$ এর সম্পর্কে একথা আরও প্রযোজ্য। যাই হ'ক, সংখ্যা বলতে গণিতজ্ঞেরা ১, ২ এবং এদের সদৃশদেরই বোঝেন না। তাঁরা $\sqrt{2}$, $\sqrt{-1}$ এদেরও বোঝেন। কিন্তু এই সব সংকেতের দ্বারা কি সংকেতিত হয়? একটি আম, দুটি জাম, প্রভৃতি যেমন বলা যায় $\sqrt{2}$, অথবা $\sqrt{-1}$ আম কি জাম কি অন্য কিছু বলা যায় কি? প্রথম প্রকার শব্দ ব্যবহারে সংখ্যা বাচক শব্দগুলি বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং আমরাও এক অথবা একত্ব প্রভৃতিকে কোন ধর্মীর ধর্ম বলে, গুণ বলে বুঝি। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারেও সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বৈয়াকরণ অনুশাসনে বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাদের দ্বারা সংকেতিত হয় যে সব সংখ্যা, সেই সব সংখ্যাকে কোন ধর্মীর ধর্ম বলে বুঝব কি? যদি বুঝি তাহলে সেই ধর্মীরা আবার কেমন? এই সংকেতগুলি যে নিরর্থক, কোন কিছুই সংকেতিত করে না, তা বলা যায় না। গণিতের স্বার্থে এদের আমরা অলীক-সংকেতক-সংকেত বলে মনে করতে পারি না। ১, ২ এবং তাদের মত সংখ্যাকে শাসন করে যে সব মহাব্যাপক নিয়ম তারা $\sqrt{2}$, $\sqrt{-1}$ প্রভৃতিকেও শাসন করে। অথচ এদের আমরা বস্তুর ধর্ম, অনুভবে ভাসমান হয় যেরূপ পদার্থ সেরূপ পদার্থ কিংবা সেরূপ পদার্থের ধর্ম বলেও মেনে নিতে পারি না। তাই গণিত দর্শনে একটি অতি অনুপাদেয় অবস্থার উদ্ভব হয়। ফ্রেগের পদ্ধতি এই অবস্থার অবসান ঘটাতে সমর্থ। এই পদ্ধতি প্রয়োগ পূর্ব্বক $\sqrt{2}$, $\sqrt{-1}$ প্রভৃতির স্বরূপ, সকল সংখ্যারই স্বরূপ, বোঝা যায়—এবং দেখতে পাওয়া যায় যে এই সংকেতগুলি অসংকেতকও নয়, অথচ কোন কায়াশূন্যছায়াবৎ অশরীরি বস্তুকেও সংকেতিত করে না। এই পদ্ধতির সাহায্যে দেখান যায় যে অমূলদ (Irrational) সংখ্যাগুলি মূলদ সংখ্যার ন্যায়-নির্মিতি, মূলদ সংখ্যারা স্বাভাবিক (natural) সংখ্যারা ন্যায়নির্মিতি, অঙ্কবাচক

(cardinal) সংখ্যারা শ্রেণীর (class), এবং শ্রেণীরা (যৌক্তিক) বাক্য প্রসবকারী বাক্য-প্রকৃতির (propositional function)। সহজ ভাষায়, তিলোত্তমা নাই, কিন্তু যে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে আমাদের সৌন্দর্যাস্বাদী কল্পনা তাকে নির্মাণ করে, সেই সৌন্দর্যকণাগুলি প্রসিদ্ধ বস্তু, এবং অপ্রসিদ্ধ তিলোত্তমা আমাদের রসানুগ কল্পনার, সৌন্দর্যাস্বাদী কল্পনার নির্মাণ। তেমনি আমাদের বৈজ্ঞানিক কল্পনা, বিচারানুগ কল্পনা, নৈয়ায়িক কল্পনা, বাক্য প্রকৃতি হতে শ্রেণী, শ্রেণী হতে সংখ্যা প্রভৃতি নির্মাণ করেছে। যে সব বাক্যে $\sqrt{2}$, $\sqrt{-1}$ প্রভৃতি সংকেত রয়েছে তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে হবে বাক্য প্রকৃতি ঘটিত বাক্যে। তাহলেই তাদের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে এবং অশরীরী বস্তু অঙ্গীকারের অনুপাদেয় কর্তব্য আর আমাদের দার্শনিক সত্তাকে পীড়িত করবে না।

এই বৈশ্লেষিক পদ্ধতি লর্ড রাসেলকে দর্শনের নবরূপ কল্পনায় উৎসাহিত করল। দর্শনের রাজ্যে আমরা প্রায়ই অশরীরি বস্তুর আমদানি করি। নিঃস্বরূপ বস্তু অনেক দর্শনেই স্বীকৃত হয়। অথচ এদের অস্বীকার করতে পারলে আমরা সকলেই, যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। ফ্রেগের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এই কাজটি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। দৃষ্টান্তরূপে 'হৈম-গিরি'কেই নেওয়া যেতে পারে। কোন বাস্তব গিরিই হৈমগিরি নয়—কোন ভূগোলের গ্রন্থে এরূপ গিরির অবস্থিতির কথা বলা নাই, এবং কোন ভূতাত্ত্বিকও এরূপ গিরি নিয়ে মাথা ঘামান না। 'হৈমগিরি' শব্দের শক্তি কোন বাস্তব গিরিতে নাই। অথচ শব্দটি শক্তিশূন্য নয়, নিরর্থক নয়। তাই অনেক দার্শনিক অবাস্তব বস্তুরূপে, নিঃস্বরূপ বস্তুরূপে, বিজাতীয়সত্তাক বস্তুরূপে হৈমগিরিকে স্বীকার করে থাকেন। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে বাস্তব জগতে হৈমগিরি না থাক, কল্পনার জগতে আছে, প্রসিদ্ধ সত্তায় হৈমগিরি সত্তাবান্ না হোক, অপ্রসিদ্ধ, বিজাতীয় সত্তায় সত্তাবান্ হৈমগিরি বটে। সত্তা এক প্রকার নয়, বস্তুও এক প্রকার নয়। প্রসিদ্ধ বস্তু আছে, অপ্রসিদ্ধ বস্তুও আছে। প্রসিদ্ধ সত্তায় সত্তাবান্ পদার্থ আছে, আবার আবার অপ্রসিদ্ধ বিজাতীয় সত্তায় সত্তাবান্ পদার্থও আছে। Existent বস্তুও আছে, subsistent বস্তুও আছে। 'আছা' অনেক রকমের হয়। এই মতটিকে খণ্ডন করা খুব সহজ নয়, আবার মেনে নেওয়া আরও অসহজ। এখন, ফ্রেগের পদ্ধতি যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এই মতের গ্রাহ্য অংশকে রেখে আমাদের সহজ বুদ্ধি সিদ্ধ মতকে প্রতিষ্ঠা করা খুবই সহজ হয়।

এই পদ্ধতির মূল কথা হল সংকেত মাত্রই অসংকুচিত সংকেত নয়। অসংকুচিত সংকেত, কুশক্ত সংকেত, অখণ্ড সংকেত, বস্তুসংকেতক সংকেত। কিন্তু সংকুচিত (incomplete) সংকেত,কুশক্ত সংকেত, অপূর্ণ সংকেত, খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ কিন্তু অখণ্ড প্রসিদ্ধি শূন্য পদার্থ সংকেতক সংকেত। আমাদের দৈনন্দিন ভাষায়, আটপৌরে কথায়, এমন কি বিজ্ঞানের ভাষাতেও উভয় প্রকার সংকেতই বিদ্যমান থাকে, এবং আমরা সংকেত রহস্য অনেক সময়ই অনুধাবন করি না বলে, দু প্রকার সংকেতই যে বস্তু সংকেতিত করে না, বস্তুর চিত্র অঙ্কনে সমর্থ নয়, একথা খেয়াল করি না বলে, উদ্ভট সত্তায় সত্তাবান বহু পদার্থকে অঙ্গীকার করি, জন্ম দিই শ্বাসরোধী পরাবিজ্ঞানের। যেমন দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্যবাচক বহু শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমরা 'আম', 'জাম' প্রভৃতি সংকেত ব্যবহার করি। এই সংকেতগুলি নিরর্থক নয়। 'আম জাম অপেক্ষা আকারে বড়', এই বাক্যে আম এবং জামের স্থান শূন্য রেখে, অথবা '—' কিম্বা 'ফ্রোঙ্ঙ'র মতন শব্দ দিয়ে ভরাট করে বলতে পারি না যে বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ করলাম। শব্দগুলি নিরর্থক নয়। অথচ নীল পীতাদি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি অতিরিক্ত অথচ তাদের আশ্রয়রূপ কোন দ্রব্য স্বীকার করা অনুভব বিরোধী কথা বলা। সেইজন্য এই সংকেতগুলি যে ঐরূপ কোন পদার্থকে সংকেতিত করে তাও বলা যায় না। বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে নীল পীতাদি অতিরিক্ত দ্রব্য, তা সে আমই হক, আর জামই হক, আমিই হই, আর তুমিই হও, অনুভবে ভাসমান তত্ত্ব নয়, সাক্ষাৎকার হয় যেরূপ তত্ত্বের সেরূপ কোন তত্ত্ব নয় প্রত্যক্ষবেদ্য নয়। এরা অনুমিত পদার্থ। আর, মনন ন্যায়ের প্রধান নীতিই হল লাঘব ন্যায়। সুতরাং এইরূপ অনুমিত পদার্থ যে ন্যায়-নির্মিতি, অথবা কল্পনা জন্য, অথবা বস্তুশূন্য বিকল্প মাত্র, এ যদি দেখান যায়, এবং তাতে যদি কোন তথ্যের অপলাপ না হয় তাহলে অনুমিত পদার্থের পরিবর্তে ন্যায়-নির্মিতিকেই গ্রহণ করতে হবে। আসলে, 'অনুমিত পদার্থেরই উপযুক্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রত্যক্ষে পাই না, বিকল্পমাত্র বহু পদার্থকে আমরা অনুমিত পদার্থের মর্যাদা দিয়ে থাকি। খেয়াল রাখি না যে আমাদের তথ্য সংক্রান্ত সকল বিবেচনা প্রত্যক্ষেই আরম্ভ হয় এবং প্রত্যক্ষেই শেষ হয়। তাই এমন কোন পদার্থ যদি আমরা অনুমান করি, যা কদাচ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই, যা প্রত্যক্ষের একান্ত অবিষয়, ত' সেই পদার্থকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, তাকে বস্তু বলে অঙ্গীকার করা চলবে না। কারণ, ঐরূপ বস্তু সংকেতক সংকেত ফাঁকা সংকেত মাত্র হবে। কোন কিছুই, অনুভূত কোন কিছুই, সংকেতিত করতে পারবে না। এরূপ সংকেত পদার্থ বিজ্ঞানেও আমদানি করে। 'ইথর' এর প্রকৃষ্ট

দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাতে তার বস্তুত্ব সিদ্ধ হয় না। তারা যে এক প্রকার ন্যায়-নির্মিতি এই কথাই সিদ্ধ হয়। আম-দ্রব্য, জাম-দ্রব্য প্রভৃতি দ্রব্য ন্যায়-নির্মিতি মাত্র। ইথরও তাই। দ্রব্যবাচক সংকেতগুলি বস্তু সংকেতক সংকেত নয়, নিরর্থকও তারা নয়। তারা কুণ্ঠিত সংকেত, সংকুচিত সংকেত। যে বাক্যে 'আম', 'জাম' প্রভৃতি সংকেত ব্যবহৃত হয়, সেই বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের জন্য পুনর্লিখন প্রয়োজন। পুনর্লিখিত বাক্যে 'আম', 'জাম' প্রভৃতি দ্রব্য-সংকেতক সংকুচিত সংকেত থাকবে না, থাকবে নীল পীতাদি সংকেতক অসংকুচিত সংকেত। যাই হোক, আটপৌরে ভাষায়, বিজ্ঞানের ভাষায় সংকুচিত এবং অসংকুচিত দু রকমের সংকেত থাকে। তাই এই ভাষাকে বস্তুর যথার্থ চিত্র বলে মনে করা যায় না। সুতরাং এ প্রশ্ন থেকেই যায়, যে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানে, আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তার বিশ্লেষণ কি হবে? কোন সংকেত দৈনন্দিন জীবনে অথবা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় বলেই কি তাকে বস্তু সংকেতক বলে মনে করতে হবে? এই প্রশ্নই দর্শনের। আটপৌরে ভাষার, বৈজ্ঞানিক ভাষার, সংক্ষেপে ভাষার, তাৎপর্য কি, এই প্রশ্নই বিবেচনা করে দর্শন। দর্শন কথার কথা, ভাষার শাস্ত্র, বাক্যের বিশ্লেষণ।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষ্য কিছু থাকে। তারই বিশ্লেষণ করা হয় এবং বীজ-গণিতের সমীকরণ লিখন রীতিতে বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণকে লেখা যায়। আমরা বাঁ দিকে বিশ্লেষ্যটিকে লিখে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে বিশ্লেষণকে, বিশ্লেষণ বাক্যকে লিখতে পারি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বিশ্লেষণকে লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও লক্ষণ থাকে, এবং বীজগণিতের সমীকরণ লেখার রীতিতে আমরা বাঁ দিকে লক্ষ্যকে লিখে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে লক্ষণ বাক্যকে লিখে থাকি। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষ্য এবং বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতগুলি যে এক তলের হবে, অসমতল হবে না এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ সুসংকুচিত সংকেত ঘটিত বাক্যের বিশ্লেষণের অর্থই হল কল্পনাজন্য, ন্যায়নির্মিত, বস্তু অ-সংকেতক বাক্যকে সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত বস্তু সংকেতক বাক্যে, অসংকুচিত সংকেত ঘটিত বাক্যে বিশ্লেষণ করা। তা যদি না করা হয়, অর্থাৎ বিশ্লেষণ বাক্যেও যদি সংকুচিত সংকেত রাখা হয়, তাহলে কোন দার্শনিক সাফল্য লাভ করা যাবে না। বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতগুলি সমতাল হলে অথবা রচনা প্রসূত বাক্যের বোধ অথবা অন্য কোন অস্পষ্ট বোধ, বাক্যের নৈয়ায়িক প্রসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্ণয় সহজ সাধ্য হতে পারে। কিন্তু কোন দার্শনিক সাফল্য

লাভ করা যায় না। দার্শনিক সাফল্যের অর্থই হল বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতের অসমতলতা। অর্থাৎ বিশ্লেষণ দু রকমের : অনপেত, সমতাল বিশ্লেষণ, (same-level analysis) এবং অভিমৌল (directional), পর্যবসানী (reductive), নবতাল (new level) বিশ্লেষণ। 'বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর লেখক' এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করে যখন বলি, 'দুর্গেশ-নন্দিনী একজন লিখেছিলেন ; একজনের অধিক লেখেন নাই ; এবং তাঁতে আশ্রিত এই লেখকত্ব ধর্মের সামানাধিকরণ্য রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রবতে', তখন বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ সমতলেই থাকে, দেখা যায় বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণের সম্বন্ধ তাদাত্মনপেতম। এই প্রকারের বিশ্লেষণকে অনপেত বিশ্লেষণ অথবা সমতাল বিশ্লেষণ বলা হয়। কিন্তু যখন কোন দ্রব্যবাচক সংকেত বিশ্লেষ্য বাক্যের ঘটক হয় এবং বিশ্লেষণে এই সংকেতটি বা তার সমতাল কোন সংকেত থাকে না, থাকে নূতন তলের অধিক মৌলিক, 'নীল পীতাদি' সংকেত তখন বিশ্লেষণটি হয় অভিমৌল বিশ্লেষণ অথবা পর্যবসানী বিশ্লেষণ, অথবা নবতাল বিশ্লেষণ। ফ্রেগের যে বিশ্লেষণের কথা উপরে বলা হয়েছে, তা এই অভিমৌল বিশ্লেষণই এবং দার্শনিক বিশ্লেষণও এই বিশ্লেষণ।

কথাটিকে এভাবে খুলে বলা যায়। অনাদি কাল হতে দার্শনিক জিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা বলে অভিহিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই তত্ত্ব (reality) সম্পর্কে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন বোধ না থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছিন্ন আলোচনা না করার জন্য তত্ত্ব হতে তথ্যের, তত্ত্বজিজ্ঞাসা হতে তথ্য জিজ্ঞাসার, দর্শন হতে বিজ্ঞানের ভেদ অনুধাবন করা হয় নাই ; এবং দর্শনকে এক প্রকার বিজ্ঞান বলে, খণ্ড বিজ্ঞানের সমন্বয়াত্মক বিজ্ঞান বলে মনে করা হয়েছে। এর ফল যে কি হয়েছে তা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দর্শনকে বাঁচাতে হলে তাকে নতুন ভাবে গঠন করতে হবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা বলতে ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ গুহায় নিহিত, রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি বলতে আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু বুঝতে নাকাল হতে হয় এমন কোন কিছুর জিজ্ঞাসা বোঝা চলবে না। বুঝতে হবে আদর্শ ভাষা জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিজ্ঞানে বহু সংকেতই ব্যবহৃত হয় যা অনুভূত, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কল্পনাদিমুক্ত সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত পদার্থকে সংকেতিত করে না। এরা অসংকুচিত সংকেত নয়, তবু আমরা অনেক সময়ই এদের অসংকুচিত সংকেত বলে মনে করি। ফলে অনেক উদ্ভট পদার্থ অঙ্গীকারে বাধ্য হই। উপরন্তু ভাষার, লৌকিক, স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ভাষার—গঠন প্রণালী, পদের অন্বয় ও বাক্যের রচনা প্রণালী, বৈয়াকরণ প্রণালী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই হয়ে আছে যে

সংকেতিতদের অন্বয়, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অনুভব বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের হাত এড়ান যায় না। আর্য দার্শনিক মণ্ডলে অন্বয়বাদের প্রভাব এবং আর্য-ভাষা সমূহের পদার্থয় প্রণালীর তুলনা করলে, এই মন্তব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। এই সব ভাষায় সম্বন্ধজ্ঞাপক বাক্যগুলিকে বিনা পরিশ্রমে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়; এবং তা হ'তে এই সিদ্ধান্ত করা সহজ হয় যে সম্বন্ধ কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, গুণপদার্থেরই অন্তর্গত। সুতরাং আরও সিদ্ধান্ত করতে হয় যে সম্বন্ধী হওয়া আর সাপেক্ষ হওয়া একই কথা, সসীম মানেই সাপেক্ষ, এবং অদ্বয় অসীম ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ বস্তু। এই সব কথা সম্পূর্ণ অনুভব বিরোধী কথা। তবু ভাষার কুহকজালে আবদ্ধ হয়ে এদের আমরা ফেলতে পারি না, গলাধঃকরণ করি, এমন কি সহজ অনুভবকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই। তাই প্রয়োজন হয় ভাষার বিশ্লেষণের। আসলে ভাষা যে ছলনাময়ী, এ কোন নব আবিষ্কৃত তথ্য নয়। এর আগেও অনেকে এমন কথা বলেছেন যে ভাষার আকার নির্ণয় পূর্বক যথার্থ জ্ঞানের আকার, তত্ত্বের আকার নির্ণয় করা যায় না। তারপর তাঁরা আবার বলেছেন তত্ত্ব প্রপঞ্চের প্রপঞ্চিত, বাক্ ও মনের অতীত। বলা বাহুল্য, যে এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। ভাষা যে অযোগ্য তাও ভাষাকেই বলতে হয়, এবং কেন অযোগ্য তাও বলতে হয়। তত্ত্বনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষাকে ত্যাগ করতে হবে, একথা গ্রাহ্য নয়। তেমনি একথাও গ্রাহ্য নয় যে ভাষাই তত্ত্ব। কারণ ভাষাই তত্ত্ব এই ভাষাখণ্ডটি যে স্বপর নয়, স্বভিন্নপর তা সকলকেই স্বীকার করতে হয়। তাই ভাষা ও তত্ত্ব সম্পর্কে এই মতই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে ভাষা বিষয় নিরূপ্য, ভাষার আকারই তত্ত্বের আকার, ভাষাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, ভাষাতত্ত্বের চিত্র, ভাষামুকুরে তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ভাষা স্বাভাবিক ভাষা নয়, ঐতিহাসিক ভাষা নয়, আটপৌরে ভাষা নয়। এ ভাষা পোষাকী ভাষা, কৃত্রিম ভাষা, আদর্শ ভাষা। এই ভাষার সব সংকেতই অসংকুচিত সংকেত, এবং এর ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়। দার্শনিকের কর্তব্য এইরূপ ভাষা নির্মাণ, অথবা এইরূপ ভাষায় পৌঁছান, এবং সাধারণ আটপৌরে ভাষার বৈশ্লেষিক অনুবাদ।

যে ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়, সে আবার কেমন ভাষা? এবং ঐ ভাষায় যে বস্তুর স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তাই বা কেমন করে বুঝব?—এই দুটি আপত্তির কথা বিচার করে দেখতে হয়। প্রথম আপত্তিটি দু ভাবে দেওয়া যেতে পারে। যদি কেউ মনে করেন যে ভাষার ব্যাকরণ ব্যাকরণই, ন্যায় নয়, তাহলে

তিনি এই আপত্তিটি দিতে পারেন। আবার যদি কেউ মনে করেন যে ভাষার ব্যাকরণ সহজ স্বাভাবিক ন্যায়, গাণিতিক ন্যায় নয়, তাহলেও তিনি এই আপত্তিটি দিতে পারেন। এই দুটি আপত্তির মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে প্রথম আপত্তিটিকেই অধিক প্রতিকূল মনে হতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে দ্বিতীয় আপত্তিটিই অধিক প্রতিকূল। প্রথম আপত্তির উদ্ধার সহজেই হয়; কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তির উদ্ধার তত সহজ নয়। যাই হ'ক প্রথম আপত্তিটির উদ্ধার এই ভাবে করা যায়। ভাষার ব্যাকরণ ন্যায়ই, কারণ ভাষা এক প্রকার ক্যাল্‌কুলাস্। অর্থাৎ, ভাষা বলতে যদি আমরা লৌকিক ভাষাও বুঝি, তাহলেও দেখা যাবে যে ভাষা ক্যাল্‌কুলাস্ বিশেষ। যেমন, সব মানুষই নশ্বর, সব দার্শনিকই তার্কিক, সব কবিই কল্পনাবিলাসী প্রভৃতি কয়েকটি এই ধরণের বাক্য নেওয়া যাক্। তারপর প্রশ্ন করা যাক্ যে ব্যাকরণ এই সব বাক্যকে শাসন করছে সেই ব্যাকরণটি কি? প্রথমে মনে হতে পারে যে এই প্রশ্নটি আবার একটি প্রশ্ন নাকি, বাক্যগুলি যে ভাষায়, যেমন আলোচ্যস্থলে বাংলা ভাষায় লিখিত সেই ভাষার অর্থাৎ বাংলা ভাষার ব্যাকরণই এই সব বাক্যকে শাসন করছে। কিন্তু তা নয়। বাক্যগুলির দুটি করে দিক আছে, একটি নিছক ভাষার দিক, আর একটি প্রমাণের দিক; এবং এই দুটি দিকের মধ্যে দ্বিতীয়টিই মৌলিক, অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈয়াকরণ ঔচিত্য অনৌচিত্য, অনেক সময় প্রামাণিকত্ব, অপ্রামাণিকত্বের ব্যভিচারী হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অথবা আসে অনেক কিছুই, কিন্তু যায় না কোন কিছুই। ভাষার বৈয়াকরণ ব্যাকরণ যে নৈয়ায়িক ব্যাকরণ সাপেক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাকরণেই দর্শনের সূত্র রয়েছে এই প্রতিজ্ঞার কোন হানি হয় না। কারণ, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে লৌকিক ভাষা, নৈয়ায়িক ভাষা নয়; এই ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তত্ত্বের আকার আকারিত হয় না। তাই কোন একটি বিশেষ বৈয়াকরণ ব্যাকরণ পূর্বোক্ত বাক্যগুলিকে শাসন করছে, একথা যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তার উত্তরে বলা চলবে না। এদের শাসন করছে কোন্ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ বা কোন ন্যায় তা দেখতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরিষ্টটলের ন্যায়ই এই বাক্যগুলিকে শাসন করছে। আমরা 'মানুষ', 'নশ্বর' প্রভৃতি অব্যভিচারী (constant) নামকে ত্যাগ করে 'S' এবং 'P' এই ব্যভিচারী (variable) সংকেত দুটির ব্যবহার করতে পারি; এবং তখন দেখতে পাই এদের নৈয়ায়িক কাঠামো, ন্যায়সিদ্ধ আকার। আমরা সব কটি বাক্যকেই সব S-ই P, Sa P এই ভাবে লিখতে পারি; তারপর যদি আবার

PQ বাক্য, অথবা বাক্য-প্রকৃতি নিয়ে আসি, তাহলে সিদ্ধান্তও করতে পারি SQ। এই ভাবেই আমরা এই সব বাক্যের প্রকৃত রূপ, তাৎপর্য অন্য বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রসক্তি প্রভৃতি টের পাই। সুতরাং ভাষার ব্যাকরণ ব্যাকরণ মাত্রই, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাষার ব্যাকরণ ন্যায়, এবং আমাদের ঘরোয়া ভাষার ন্যায় মোটামুটি এরিষ্টটলের ন্যায়। প্রথম ভাবে যদি প্রথম আপত্তিটি দেওয়া হয়, তাহলে তার উদ্ধার মোটেই অসহজ নয়।

দ্বিতীয় ভাবে আপত্তিটি দিলে তার উদ্ধার কিছু বেশী অসহজ। কারণ, এই ভাবে আপত্তি দেওয়ার মূলে রয়েছে সাধারণ ভাষার ন্যায় ও গাণিতিক ন্যায়ের সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব। অনেকেই এই দুই প্রকারের ন্যায়কে একই অর্থে ন্যায় বলতে চান না, এবং না চাওয়াটিই রয়েছে এইভাবে আপত্তি দেওয়ার মূলে। অবশ্যই এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে বিস্তৃত আলোচনার, সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে তা করার অবসর নাই। সংক্ষেপে কেবল এইটুকুই বলা যায় যে এরিষ্টটলীয় ন্যায়কে নানাভাবে বোঝা হয়েছে। আগের দিনে দার্শনিকরা একভাবে বুঝেছেন এবং বর্তমানে গাণিতিক ন্যায়বিদ্‌গণ আর এক ভাবে বোঝেন। তাঁদের মতে দার্শনিকরা এরিষ্টটলের অভিপ্রায়, তাঁর ন্যায়ের গূঢ়, রহস্য ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই। এরিষ্টটলের ন্যায়ও আকার সর্বস্ব ন্যায়, গাণিতিক ন্যায়ের বিজাতীয় ন্যায় নয়। গাণিতিক ন্যায় এরিষ্টটলের ন্যায়েরই পূর্ণাঙ্গ রূপ, বিস্তৃত তন্ত্রবদ্ধ রূপ। এরিষ্টটলের ন্যায় গাণিতিক ন্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়। উপরন্তু, দৈনন্দিন ভাষার যে 'না', 'উভয়', 'যদি-তাহলে', 'হয়-অথবা' প্রভৃতি নৈয়ায়িক করণগুলি (logical operation) ব্যবহৃত হয়, তাদের PM এর '~', '.', 'ɔ' এবং 'v'তে অনূদিত করা যায়। দৈনন্দিন সহজ ভাষার ন্যায় এবং গাণিতিক ন্যায় বিজাতীয় নয়। এদের প্রভেদ কেবল এই খানেই যে একটি অসম্পূর্ণ, অন্যটি সম্পূর্ণ, একটি অঙ্কুর, অন্যটি ঐ অঙ্কুরের বিবৃদ্ধিরূপ মহীরুহ; একটি প্রথম, অন্যটি শেষ; একটি অস্বতঃপ্রমাণ, অন্যটি প্রথমটিকেও প্রমাণ করে, এবং নিজেও প্রমাণ করে। এই দৈনন্দিন ভাষার ন্যায়, এরিষ্টটলের ন্যায় একথা স্বীকার করলে আরও স্বীকার করতে হয় যে আদর্শ ভাষার ন্যায় গাণিতিক ন্যায়ই।

দ্বিতীয় আপত্তিটির উদ্ধারের চেষ্টা আমরা এখন করতে পারি। এই আপত্তিটির মূল কথা হল এই ভাষায় যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হবে এ কথার প্রমাণ কি? বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই বাক্যের সপক্ষে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। কিন্তু সেইজন্য যে বাক্যটিকে নিষ্প্রমাণ বলতে হবে তা নয়। বাক্যটিকে অস্বীকার করলে যে মহৎ

অনিষ্ট হয় তাই এর প্রমাণ। অর্থাৎ কোন ভাষাতেই যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তাও আমাদের স্বীকার করতে হয়। সুতরাং আমাদের আরও স্বীকার করতে হয় যে সুগঠিত, সুরচিত ন্যায় যে ভাষার ব্যাকরণ এবং যে ভাষায় কোন সংকুচিত সংকেতই স্থান পায় না, সেই আদর্শ ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। সংক্ষেপ, গাণিতিক ন্যায় হতে গণিতকে লাভ করা যায়। সাধারণ আকারৈকধর্মী ন্যায়কেও, সহজ ভাষার ন্যায়কেও এই ন্যায় হতে লাভ করা যায়। এবং ভাষার মূল ব্যাকরণ যেহেতু ন্যায় সেই হেতু এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত হয় যে আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়ই। আদর্শ ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, একথা অর্থ, কোন ভাষাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বাক্ ও মনের অতীত। এরূপ সিদ্ধান্ত কারও ইষ্ট নয়।

আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়। অথবা, যে ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায় সেই ভাষাই আদর্শ ভাষা। এই ভাষাই যা কিছু প্রকাশযোগ্য, তাই প্রকাশে সমর্থ। ভাষা ক্যাল্‌কুলাস্ বিশেষ। সাধারণ ক্যাল্‌কুলাস্ হতে আদর্শ ভাষার পার্থক্য কেবল এইখানে যে ওতে বস্তু সংকেতক সংকেত আছে, এর একটা vocubulary, শব্দ সম্ভার আছে। গণিত দর্শনে যেমন ভাষাকে সত্যতা-অপেক্ষক truth-functional বলে মনে করে, দর্শনেও তাই করবে। দার্শনিকের আদর্শ ভাষা হবে আণবিক এবং পরমাণবিক, molecular এবং atomic বাক্যের একটি অশেষ সমাহার। এই ভাষার পরমাণবিক বাক্যগুলির সত্যতা অনুভবের সাহায্যে, অনৈয়ায়িক পদ্ধতির সাহায্যে, নিরীক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে, এবং অন্য প্রকার বাক্যের সত্যতা নির্ণীত হবে নৈয়ায়িক পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্যেই। সুতরাং দার্শনিক কাজও হবে বিশ্লেষণ, প্রথমতঃ স্বাভাবিক ভাষাকে আদর্শ ভাষায় অনুদিত করার জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করার জন্য।

যা বলা হল তা থেকে বোঝা যাবে যে দর্শনের নবরূপ কল্পনার মূলে রয়েছে একটি বিশ্বাস এবং একটি অবিশ্বাস। গণিত-দর্শনে অভিনৌল বিশ্লেষণের ক্রিয়া সাধকত্ব লক্ষ্য করে এই বিশ্বাস এসেছে যে দর্শনেও এই অভিনৌল বিশ্লেষণ পদ্ধতি ক্রিয়াসাধক হবে। সুতরাং আরও একটি বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে এমন আদর্শ ভাষা আছে, বা নির্মাণ করা সম্ভব, যাতে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, যা হতে এক নজরে তত্ত্বের আকার বুঝে নেওয়া যায়। অবিশ্বাসটি হল মননধর্মী পরাবিজ্ঞানে, অনুভবে অপ্রতিষ্ঠিত অনুমিত সত্তায় বিশ্বাসী পরাবিজ্ঞানে, অবিশ্বাস। এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হাত ধরাধরি করে চলেছে; একে অপরকে লালন করেছে, পালন

করেছে, পুষ্ট করেছে। অন্ততঃ পক্ষে বিশ্লেষণী দর্শনের প্রথম পর্বে তাই মনে করা হ'ত। ভাবা হত যে এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এমনই গাঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে এদের একটিকে ত্যাগ করলে অন্যটিকেও ত্যাগ করতে হয়, অথবা একটি একটিকে ত্যাগ না করলে, অন্যটিকে ত্যাগ করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

কার্য-কারণ সাদৃশ্য

অধ্যাপক মিহিরবিকাশ চক্রবর্তী

কার্য ও কারণ সর্বক্ষেত্রেই পরস্পর সদৃশ, অথবা সদৃশবস্তুর মধ্যেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ সম্ভব, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের এই প্রয়াসের সার্থকতা বুঝতে চলে পাশ্চাত্য দর্শনে সিদ্ধান্তটির বিশেষ যে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তা বোঝা দরকার।

॥ এক ॥

সিদ্ধান্তটির সত্যমিথ্যা আধুনিক দর্শনে দেকার্তে প্রবর্তিত জড় ও মনের দ্বৈতবাদের সত্যমিথ্যার অন্যতম নির্ধারক; তার ফলে দেকার্তোত্তর দর্শনের মূল্যায়নেও এর আংশিক ভূমিকা আছে। সংক্ষেপে, এইখানেই সিদ্ধান্তটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

যে-সব কারণে দেকার্তেকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পথিকৃৎ বলা হয় তার মধ্যে জড় ও মন সম্বন্ধে তাঁর দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত প্রধানতম। কারণ, এক অর্থে এই সিদ্ধান্ত দেকার্তের পরবর্তীকালীন দর্শনের গতিপ্রকৃতির নিয়ামক। বস্তুতঃ দেকার্তের পরবর্তী দর্শনের ইতিহাস তাঁর দ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ারই ইতিহাস। দেকার্তের পরবর্তীকালীন দার্শনিক প্রয়াস প্রধানতঃ তাঁর এই দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তেরই কোন একটি উপযুক্ত বিকল্প সন্ধানের অনবচ্ছিন্ন প্রয়াস। এরই ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে কখনও জড়কে মনের অধীন, কখনও মনকে জড়ের অধীন করা হয়েছে। আবার কখনও বা জড় ও মন উভয়কে কোন অসঙ্গ সত্তার দ্বৈতরূপ বলে গণ্য করা হয়েছে।

কিন্তু কার্তেজীয় দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এই যে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া, তার উপযুক্ত বিকল্পের জন্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন সন্ধিৎসা, এর কারণ কি? কারণ একাধিক। কিন্তু সুবিদিত ও সর্বপ্রধান যে কারণ তা হচ্ছে কার্যকলাপের দিক থেকে দেহ ও মনের মধ্যে যে পারস্পরিক অনুগামিতার সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে তাদের দ্বৈতধর্মের সুসঙ্গত সমন্বয় সাধনে দেকার্তে ও তাঁর দ্বৈতবাদী উত্তরসূরীদের ব্যর্থতা।

দেহ ও মনের এই কার্যকলাপগত পরস্পরানুসারিতার ব্যাখ্যা হিসেবে দেকার্তে তাদের মধ্যে মিথঃক্রিয়া বা interaction-এর প্রকল্পনা করেছিলেন। দেহমনের মিথঃক্রিয়া বলতে দেকার্তে অবশ্য তাদের পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্কই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ কার্তেজীয় মতে দেহ ও মনের কার্যকারণ সম্পর্ক এমন যে, কোন একটি মানসিক সংঘটনের কারণ যে জড়সংঘটন তা হয়ত আর একটি মানসিক সংঘটনেরই ফল হতে পারে; ঠিক তেমনিভাবে যে মানসিক সংঘটন একটি জড়-সংঘটনের কারণ তার উৎপত্তি হতে পারে আর একটি জড়সংঘটন থেকে।

কিন্তু দেহমানসিক পরস্পরানুগামিতার এই কার্তেজীয় ব্যাখ্যা দেকার্তের দ্বৈতবাদী-উত্তর দার্শনিকদেরও মনঃপূত হয়নি। কেননা, দেহ ও মনের মিথঃক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্পর্ক তাদের দ্বৈতধর্মবিরোধী মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহ ও মনের মধ্যে আমূল বৈপরীত্য স্বীকারের অর্থই তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের সমস্ত সম্ভাবনা অস্বীকার। কার্তেজীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এই আপত্তি কিন্তু একটি অনতিপ্রশ্নের অভ্যুপগম-ভিত্তিক এবং সে অভ্যুপগমটি হচ্ছে: পরস্পর সদৃশবস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভব।

আশ্চর্য লাগে যে এই অভ্যুপগমটি দেকার্তের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত স্বতঃ-সিদ্ধের মত একটা প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে চলে আসছে। তাই যাঁরা এই অভ্যুপগমেরই ভিত্তিতে কার্তেজীয় দ্বৈতবাদকে আক্রমণ করেছেন তাঁরাও একে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইউইং[১], হেস্[২] এবং লাভজয়[৩] প্রমুখ দার্শনিকের মধ্যে একদা-অবলুপ্ত কার্তেজীয় দ্বৈতবাদের একটা পরিশোধিত পুনঃপ্রবর্তনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। দেহমনের অন্যোন্যানুসারিতার ব্যাখ্যা হিসেবে স্পিনোজার যে সমান্তরালবাদ তাকে তাঁরা সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করেছেন। পরমকারুনিক কোন অধিপুরুষের সাহায্যে লাইবনিজ বা অকেসনা-লিষ্টরা অন্যোন্যানুসারিতার যে আজব একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকেও তাঁরা প্রশ্রয় দেবার বিরোধী। দেহ-মানসিক পরস্পরানুগামিতার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হিসেবে

---

১. 'Are Mental Attributes the Attributes of the Body ?', 'Is there Mind-Body Interaction ?' এবং 'Prof. Ryle's Attack on Dualism'—যথাক্রমে Proceedings of the Aristotelian Society (New Series) এর Vols XIV, XXXI এবং LIII তে প্রকাশিত। Fundamental Questions of Philosophy'—ও দ্রষ্টব্য।

২. 'Russell's Neutral Monism': Philosophy of Bertrand Russell (Schilip কর্তৃক সম্পাদিত)।

৩. 'Revolt Against Dualism'.

এই নব্য দ্বৈতবাদীরা দেকার্তের সেই মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকেই পুনর্গ্রহণ করেছেন। তাত্ত্বিক প্রয়োজনে এই সব দার্শনিকরা তাই এই নিরপেক্ষত অভ্যুপগমটির সত্যতা অবশেষে অস্বীকার করেছেন। এই অভ্যুপগম তাঁদের মতে একটি মধ্যযুগীয় ধারণা বা একটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এখন এই অভ্যুপগমের সত্যতার অস্বীকৃতি যদি যথার্থই সিদ্ধ হয় তবে দেকার্তের দেহমানসিক দ্বৈতবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় এই সব দার্শনিকেরা যে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছেন তা স্বীকার করতেই হবে। এবং কার্তেজীয়-দ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই সাফল্যকে স্বীকারের অর্থই দেকার্তোত্তর দর্শনচিন্তার তাৎপর্য ও মূল্যের অস্বীকার। কেননা, আগেই বলা হয়েছে দেকার্তোত্তর পরবর্তী যুগের দর্শনচিন্তা এই দ্বৈতবাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং এরই একটি উপযুক্ত বিকল্প সন্ধানের প্রচেষ্টা। সুতরাং দেকার্তোত্তর দর্শনকে তার স্বমূল্যে ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন কার্যকারণ সাদৃশ্যের প্রতিষ্ঠা।

॥ দুই ॥

নব্য দ্বৈতবাদী মতে কার্যকারণের মধ্যে আবশ্যিক সাদৃশ্যের সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা-অসমর্থিত। অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্য হিসেবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিসদৃশ বস্তুর মধ্যেও কখনো কখনো কার্যকারণ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, 'বিদ্যুৎ বজ্রের কারণ, তবু উভয়ের পার্থক্য আমূল ……;' আবার, 'শৈত্য জলের মধ্যে কঠিনতার সৃষ্টি করে, কিন্তু শৈত্য ও কঠিনতা সম্পূর্ণ সাদৃশ্যহীন'।*

এখন এই যুক্তির যা কিছু মূল্য আছে তা দুটি ধারণার সত্যতা-সাপেক্ষ। প্রথম ধারণা হচ্ছে : বিদ্যুৎ-বজ্র অথবা শৈত্য-কঠিনতার সম্পর্ক যথার্থই কার্যকারণ সম্পর্ক ; এবং দ্বিতীয় ধারণা : বিদ্যুৎ ও বজ্র অথবা শৈত্য ও কঠিনতা সম্পূর্ণ বিসদৃশ। কিন্তু এই দুটি ধারণার কোনটিই সন্দেহের অবকাশমুক্ত নয়। বিদ্যুৎ বজ্রের মধ্যে অথবা শৈত্য ও কঠিনতার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের আরোপ বোধ করি একটি অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাদ। কেননা, এদের মধ্যে যথার্থ আরোপিত হতে পারে যে সম্পর্ক তা হচ্ছে সমকারণক কার্যের সম্পর্ক। আবার বজ্র ও বিদ্যুৎ অথবা শৈত্য ও কঠিনতা যে বিসদৃশ এই ধারণারই বা উৎস কি? উৎস সম্ভবত চিরাচরিত এই ধারণা যে সাদৃশ্য সমদ্রব্য বা সমগুণাশ্রয়ী। কিন্তু

*. 'Russell's Neutral Monism', পৃঃ ৩৮।

প্রবন্ধান্তরে* আমরা প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে সাদৃশ্য সম্পর্কে এই চিরাচরিত ধারণা ভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অসচেতনতা বোধ করি দেকার্তের দেহমানসিক দ্বৈত-বাদের অন্যতম কারণ।

কার্যকারণ-সাদৃশ্য-সিদ্ধান্ত যে অভিজ্ঞতা বিরোধী বা অভিজ্ঞতা-অসমর্থিত এই যুক্তি তাহলে ভ্রান্ত। কিন্তু এই ভ্রান্তি প্রমাণ একদিক থেকে অপ্রয়োজনীয়। কেননা, এই যুক্তিকে গ্রহণ করলেও কার্যকারণের সাদৃশ্য অপ্রমাণিত হয় না। যুক্তিটির সত্যতা স্বীকারে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্য-কারণের সাদৃশ্য প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাই তো সত্যের একমাত্র ভিত্তি এবং প্রমাণ নয়। অভিজ্ঞতায় যে সত্যের প্রমাণ অসম্ভব অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ উপায়েও তো তার প্রমাণ সম্ভব হতে পারে; এবং বর্তমান প্রবন্ধে কার্যকারণের আবশ্যিক সাদৃশ্যের যে প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করতে চলেছি তা এমনই একটা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ প্রমাণ।

কার্যকারণের সাদৃশ্য যদি তাদের কার্যকারণত্বের কারণ হত তবে কার্যকারণ সাদৃশ্যের একটা অবরোহ প্রমাণ সম্ভব হত। কিন্তু কার্যকারণের সাদৃশ্যকে কোন-ভাবেই তাদের কার্য্যকারণত্বের কারণ মনে করা চলে না। সাদৃশ্য কার্যকারণত্বের কারণ হলে সমস্ত সদৃশবস্তুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক থাকত, কিন্তু একথা কেবল-মাত্র বাস্তববিরোধীই নয় কল্পনারও অতীত। বস্তুত কারণের মাধ্যমে কার্য-কারণত্বের ব্যাখ্যা বোধ করি অসম্ভব। সকারণ ব্যাখ্যার দিক থেকে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক বোধ করি একটি চরম সম্পর্ক। কিন্তু সকারণ ব্যাখ্যার দিক থেকে চরম হলেও কার্যকারণের ঐক্য সম্পর্ককে অবরোহ ব্যাখ্যার দিক থেকেও চরম মনে করা ঠিক নয়। কারণ, তাতে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীত একটি দুর্বোধ্য রহস্যে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াবে। সহজ কথায় কার্যকারণের এই ঐক্যসম্পর্কের কোন কারণ নির্দেশ সম্ভব না হলেও তার ব্যাখ্যার জন্য কোন একটি ভিত্তি বা আশ্রয়ের নির্দেশ করতেই হবে। ভাষান্তরে বলা চলে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ককে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রমাণ করা প্রয়োজন যে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক একটা বৃহত্তর ও বিস্তৃততর ঐক্যের মধ্যে আশ্রিত।

---

*. লেখকের 'Is the Unity of a Class Ultimate or Derivative' প্রবন্ধ, Journal of the Philosophical Association, জানুয়ারী—এপ্রিল, ১৯৫৭।

কিন্তু কোথায় সন্ধান পাওয়া যাবে এই বৃহত্তর ও বিস্তৃততর ঐক্যের ? সন্ধানের জন্য ঐক্যসম্পর্কের যে বিভিন্ন রূপ আছে তাদের স্বরূপ সমীক্ষণের প্রয়োজন।* আত্মিক ঐক্য বা সামাজিক ঐক্য জাতীয় ঐক্যসম্পর্কের কথা বলা হয়। কিন্তু বলাবাহুল্য, তাদের আলোচনা কার্যকারণ সম্পর্ক প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর। একই বস্তুর গুণের মধ্যে অথবা বিভিন্ন জড়বস্তুর মধ্যে অথবা একই মনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে ঐক্য তাও আমাদের উদ্দিষ্ট ঐক্য পদবাচ্য নয়। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবার যথোপযুক্ত বিস্তার এদের কারও নেই। কার্যকারণের সম্পর্ক কেবলমাত্র জড়বস্তু বা বস্তুর গুণ বা মানসিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবার জীবদেহ বা যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সংহতি অথবা রাসায়নিক যৌগিকের মধ্যে উপাদানসমূহের যে ঐক্য কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে তা আরও অনুপযুক্ত। এই সব ঐক্যই জড়বস্তুর ঐক্যের বিভিন্নরূপ। সুতরাং কার্য-কারণ সম্পর্ককে আশ্রয় দেবার বিস্তার এদের কারও নেই। তাছাড়া এই সব ঐক্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্পর্কের সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাই অবৈধ। কারণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য এই সব ঐক্যের প্রত্যেকটি কার্যকারণ-সম্পর্ক-নির্ভর। জীবদেহ, যন্ত্র বা রাসায়নিক যৌগিক প্রত্যেকেরই অংশ বা উপাদানের মধ্যে কিছুটা অন্তত কার্য-কারণের বন্ধন রয়েছে। এসব ঐক্যের কোনটাই তাহলে কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে চরমতর নয়। সুতরাং এদের কারও ভিত্তিতেই কার্যকারণ-ঐক্যসম্পর্কের অবরোহ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যত প্রকার ঐক্যের কথা আমরা জানি তার মধ্যে একমাত্র বর্গীয় ঐক্যই (ইংরাজীতে যাকে বলে unity of the class) আমাদের মতে আমাদের উদ্দিষ্ট ঐক্যের লক্ষণ-সমৃদ্ধ। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবার মত যথোপ-যুক্ত বিস্তার এই বর্গীয় ঐক্যের আছে। তাছাড়া কার্যকারণের ধারণা বা দৃষ্টান্তের সঙ্গেও বর্গীয় ঐক্যের কোন অসংগতি নেই। কিন্তু একথার সমর্থনে যুক্তি অবতারণার পূর্বে বর্গীয় ঐক্যের ধারণার সুস্পষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য।

আমাদের মতে কারণের মাধ্যমে বর্গীয় ঐক্যের কোন প্রকার সংজ্ঞা সম্ভব নয়। এমন কি কারণাত্মক ভাষায় তার বর্ণনাও অসমীচীন। মিল ও জনসন এই বর্গীয় ঐক্যকে এমন বস্তু বা ব্যক্তির ঐক্য বলেছেন যাদের ব্যাপ্ত্যর্থ জাত্যর্থ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মিল-জনসনের এই সংজ্ঞা বা বর্ণনা স্বীকার করায় আমাদের বাধা আছে।

---

*. বর্গীয় ঐক্যের শ্রেণীবিভাগে আমরা Mackenzie-র Elements of Constructive Philosophy থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

কেন না, মিল-জনসনীয় বর্ণনার মধ্যে বর্গীয় ঐক্য একটি আরব্ধ ঐক্য এমন একটি কথা অনুস্যূত রয়েছে। কিন্তু ষ্টাউটের চিন্তাধারার অনুসরণে আমরা প্রবন্ধান্তরে[৮] বিস্তৃতভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে বর্গীয় ঐক্য আরব্ধ ঐক্য নয়,—চরম ঐক্য। সাধারণ পদনির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর ঐক্যই বর্গীয় ঐক্য—কারণ বা কারণাত্মক ভাবা পরিহার করে বর্গীয় ঐক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এইটুকুই বর্তমানে বলা চলতে পারে।

এখন, কার্যকারণ সমবর্গভুক্ত এবং তাদের সংহতি বর্গীয় সংহতিরই রূপ-বিশেষ, স্ববিরোধী বা বাস্তববিরোধী না হলে এই ধারণার সত্যতা অবশ্য গ্রহণীয়। কারণ, তাছাড়া কার্যকারণ সংহতি সমস্ত ব্যাখ্যার অতীত একটি রহস্য হয়ে দাঁড়ায়। বর্গীয় সংহতিভুক্ত হবার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বিরোধই নেই। একটি ক্ষেত্রের চতুষ্কোণত্বের সঙ্গে তার যুগপৎ বৃত্তাকারত্বের স্ববিরোধ আছে। কিন্তু এ জাতীয় কোন স্ববিরোধই দুটি জিনিসের কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হবার এবং সমবর্গভুক্ত হবার মধ্যে নেই। এখন প্রশ্ন: কার্যকারণ যে সমবর্গভুক্ত এ বিশ্বাস কি বাস্তবেও অবাধিত? অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের কি এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে যা এই বিশ্বাসের বিরোধী! আমরা জানি মিথঃক্রিয়া প্রকল্পে বিশ্বাসী দেহমানসিক দ্বৈতবাদীরা দেহ ও মনের মধ্যে এই জাতীয় কার্যকারণ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবেন।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের উল্লেখে কার্যকারণের সমবর্গভুক্তির সিদ্ধান্ত আমাদের মতে বাধিত হয় না; বাধিত হয় বরং দেহমানসিক দ্বৈতবাদেরই সত্যতা। দেহ ও মনের দ্বৈতবাদ 'আকাশ নীল' বা 'আগুনের দাহিকা শক্তি আছে' এই জাতীয় কোন সুনিশ্চিত সত্য নয়। 'কোন জিনিস যা তাই' এই জাতীয় কথার স্বতঃপ্রামাণ্য সত্যতাও এই দ্বৈতবাদে নেই। দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত একটি বহু বিতর্কিত কল্পনামাত্র, এবং এই কল্পনার সত্যতাও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণাপেক্ষী। সুতরাং কোন বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যায় অপরিহার্য ও উপযুক্ত কোন প্রকল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দেহমনের দ্বৈতবাদী কল্পনা নিতান্তই দুর্বল। বস্তুত বাস্তব ঘটনার (যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক) ব্যাখ্যাবিরোধী হওয়া দেহ ও মনের

---

৭. Studies in Philosophy and Psychology.

৮. লেখকের 'Is the Unity of a Class Ultimate or Derivative' প্রবন্ধ, Journal of the Philosophical Association জানুয়ারী—এপ্রিল, ১৯৫৭।

দ্বৈতবাদেরই অসত্যতার অন্যতম প্রমাণ। তাছাড়া কার্যকারণের সমবর্গভুক্তি দেহ ও মনের দ্বৈতবাদবিরোধী — এই যুক্তির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন চক্রকতা আছে। কারণ এই যুক্তির সাহায্যে কার্যকারণের সমবর্গভুক্তির খণ্ডন কোন সিদ্ধান্তের বিরোধী যুক্তিকে সেই সিদ্ধান্তেরই সাহায্যে খণ্ডন করার মত। কারণ কার্যকারণের এই সমবর্গভুক্ততা, একটু পরেই আমরা দেখতে পাব, তাদের অবশ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তি এবং কার্যকারণের আবশ্যিক সাদৃশ্যের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হলে দেহমানসিক দ্বৈতবাদকে একটি অনতিক্রম্য দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাটি হচ্ছে: দেহমানসিক পরম্পরানুগামিতার ব্যাখ্যা হিসেবে দ্বৈতবাদীরা যদি মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকে আশ্রয় করেন তবে (কার্যকারণের সাদৃশ্য সিদ্ধান্ত সত্য হলে) অসংগতির মধ্যে দ্বৈতবাদের সত্যতার সর্বনাশ হয়; আর যদি এই সর্বনাশকে পরিহার করবার জন্য তাঁরা মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকে পরিহার করেন তবে পরম্পরানুগামিতার ব্যাখ্যায় তাঁদের অসামর্থ্য ও ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে হয়।

কার্যকারণের ঐক্যকে অর্থপূর্ণ হতে হলে কার্য ও কারণকে তাহলে আবশ্যিক ভাবে সমবর্গভুক্ত হওয়া দরকার। এখন কার্যকারণের এই সমবর্গীয়তার মধ্যেই আছে তাদের সাদৃশ্যের প্রমাণ। কার্যকারণের সাদৃশ্যকে তাদের এই সমবর্গীয়তা থেকেই সমবর্গীয়তার ফল বা ভিত্তি হিসেবে অনুমান করা চলতে পারে। আমাদের মত যাঁরা বর্গীয় ঐক্যের চরমতায় বিশ্বাসী এবং তদনুযায়ী দুটি জিনিষের সাদৃশ্যের অর্থ যাঁদের মতে নিছকমাত্র তাদের সমবর্গীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়, কার্যকারণের সাদৃশ্যপ্রমাণে তাঁরা প্রথম পথ অবলম্বন করবেন। আর যাঁরা চিরাচরিত ধারণা অনুসরণ করে বর্গীয় ঐক্যকে সাদৃশ্যভিত্তিক মনে করেন কার্যকারণের সাদৃশ্য প্রমাণে তাঁরা গ্রহণ করবেন দ্বিতীয় পথ। তাহলে প্রমাণিত হল যে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোন দুটি জিনিসই পরস্পর সদৃশ, অথবা ভাষান্তরে সদৃশ বস্তুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভব। এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা সবক্ষেত্রে সচেতন না থাকতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় এইটুকুই যে সাদৃশ্য আবিষ্কার সাপেক্ষ।

23432

দর্শনের সপক্ষে

জয়দেব চক্রবর্তী

সভ্যতার যখন সঙ্কটাবস্থা, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক অভ্যুদয় যখন স্বৈরাচারী একনায়কত্বের প্রবল প্রতাপে পর্য্যুদস্ত, মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত তখন 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল' দার্শনিকের এই কূট জিজ্ঞাসাকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়। এবং সেই বিচারেই তাঁর কল্প রাষ্ট্র (Republic) থেকে মহাকবি প্লেটো যেমন কবিদের বিতাড়িত করেছেন, দর্শনিকরাও তেমনি, আধুনিক গণমানসের শ্রদ্ধার নিরিখে সমাজ থেকে ক্রমশঃ বহিষ্কৃত হতে চলেছেন। শাশ্বত অস্তিত্বের নিরপেক্ষ দর্শক (Spectator of all time and existence) দার্শনিক অলস বিচার মগ্ন বলে প্রায়শঃ উপহসিত, এবং ঐতিহ্যাগত চিন্তাধারায় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

দর্শনের উৎপত্তির হেতু নির্দ্ধারণ করেছেন শাস্ত্রকার :—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ,
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ—এতে দর্শনহেতবঃ।

শ্রুতিবাক্যের সশ্রদ্ধ শ্রবণ, বিশ্লেষণাত্মক বিচারে তার মনন এবং সেই বিচারের সতত নিদিধ্যাসন হতেই নাকি দর্শনের উদ্ভব। আর, শ্রুতিতে যেহেতু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেই শ্রুতিবাক্যের নিরন্তর মননে যে দর্শন প্রসূত সে দর্শন স্পষ্টতঃ লৌকিক জীবনবিমুখী। ইহলৌকিক প্রতিকূল পরিবেশে আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অহর্নিশ যে সংগ্রামে লিপ্ত আছি দর্শনে তার কোন সহায়তা পাই না। দর্শনের চিন্তা পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক।

হ্বিটগেনষ্টিন (Wittgensten) প্রমুখ দার্শনিকের মাধ্যমে দর্শনের ক্ষেত্রে অধুনাতন কালে লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম্ নামধেয় যে এক অভিনব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, সেখানে আবার দর্শন ভিন্নতর সংজ্ঞায় অভিহিত। জগৎ এবং জীবনের সামগ্রিক যে রূপ কল্পনা দর্শনের চিরন্তন অভীপ্সা এঁরা তাকে অলীক ও অর্থহীন non-sensical বিবেচনা করেন। দর্শন সম্পর্কে এঁদের সুচিন্তিত অভিমত

এই যে, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ এবং প্রত্যয়সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই তার প্রধান কর্তব্য (Philosophy is the Critique of Language). এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, দর্শন নিতান্তই যদি ভাষার বিশ্লেষণ হয়, দার্শনিক যদি বিজ্ঞানভাষিত শব্দ এবং প্রত্যয়সমূহের সুষ্ঠু অনুধাবনেই সমুৎসুক হন, দার্শনিক আর বৈয়াকরণের কর্তব্যে তবে প্রভেদ থাকে কিসে ? দর্শন তো তাহলে ব্যাকরণেরই নামান্তর।

স্থূলকথা এই যে, দর্শন অপ্রয়োজনের আলোচনায় বিভোর। দারিদ্র্যক্লিষ্ট, দুশ্চিন্তাজর্জর প্রাত্যহিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না দর্শন চর্চায়; দর্শন জীবন-সংক্রান্ত নয়, জীবন-অতিরিক্ত। ফিলজফি শব্দটিতেও সেই নিছক জ্ঞানপ্রীতির ইঙ্গিত (philos অর্থে প্রেম, sophia—জ্ঞান), অপ্রয়োজন আনন্দের হলকর্ষণ।

চিরাচরিত তত্ত্ববিদ্যার বিরুদ্ধে তাহলে অভিযোগ এই যে, এর কোনও ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। বিশ্বের চরম দুরবস্থাতেও পদার্থবিদের অণু সম্বন্ধীয় গবেষণাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। কেন না, তাঁর আণবিক-চিন্তা হয়ত প্রকৃতির ওপর বৃহত্তর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। অতএব, প্রত্যক্ষে যদিও তেমন লক্ষ্যণীয় কোন কর্মে ক্রিয়াশীল নন পদার্থবিদ্, তবু তাঁর গবেষণা নিতান্ত অলসচিন্তা নয়। প্রয়োজনবোধে পদার্থবিদের আবিষ্কৃত সত্যকে যুদ্ধকর্মে কিংবা শান্তিকর্মে নিয়োজিত করা যেতে পারে। কিন্তু আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার যতই করি অনুশীলন, প্রকৃতির ওপর তার কোন প্রভাব নেই, তত্ত্ববিদ্যার কোন কার্যকারিতা নেই। তাই আজ যখন সমাজের চতুর্দিকে প্রচণ্ড এক কর্মোন্মাদনা, নিষ্কর্মা দার্শনিক তখন সমাজের সর্বস্তরে নিতান্তই উপেক্ষিত। এমন কি, যুগোচিত কর্তব্য সম্পর্কে দার্শনিককে অবহিত করে দিয়েছেন সাম্যবাদী চিন্তার জনক মার্ক্স, বলেছেন—জগৎ এবং জীবনের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাদানে লিপ্ত ছিলেন এতকালের দার্শনিক। এ যুগে দার্শনিকের দায়িত্ব অনেক; জগতের স্বরূপ নির্ণয় নয়, তার সংস্কার-সাধন করতে হবে তাঁকে। (not to interpret, but to change this world

এখন, যুক্তিসিদ্ধ হয় যদি দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত উপর্যুক্ত অভিযোগ, দর্শনচর্চা নিঃসন্দেহে অর্থহীন, দার্শনিক সমাজের আত্যন্তিক বিনাশ তাহলে একান্তই কাম্য। অন্যথায় কিন্তু উদরসর্বস্ব, অর্থপিশাচ এই 'সভ্য' সমাজেরও সামান্য একটু অনুকূল-স্নেহ দার্শনিকেরও সঙ্গত দাবী।

প্রারম্ভেই স্মরণে রাখা ভালো, দর্শনের একটা বিশিষ্টতা আছে। অন্য সকল বিদ্যার জ্ঞানান্বেষণ আর প্রয়োগবিধিতে (theory and practice) প্রভেদ অনেক—

কোথাও বা দুটিতে তেমন অনিবার্য্য কোন সম্বন্ধই নেই। সার্থক যিনি চিত্রশিল্পী শিল্পতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি হতেও পারেন অনবহিত, লরেল কিংবা হার্ডি কোন কৌতুকশিল্পী বের্গসঁর পরিহাসতত্ত্বে (theory of longhter) নাও হতে পারেন বিচক্ষণ এবং কীন্‌সের অর্থতত্ত্বের সামান্যতম বোধ ব্যতিরেকেও নিরক্ষর কোন শেঠজীর প্রচুর অর্থাগম হতে পারে। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরূপ— দর্শনের অনুধ্যান দর্শনেরই অংশ, দার্শনিক বিলাসচিন্তায় মগ্ন কি না এ প্রশ্নও দার্শনিক প্রশ্ন।

এখন, সত্য বটে, দর্শন আমাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন করে না, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম করে না। তবুও কিন্তু দর্শনের স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য থাকে। প্রথমতঃ দর্শনেরও কার্যকারিতা আছে; দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রতিককালে কার্যকারিতার মানদণ্ডে প্রতিটি বস্তুর মূল্যনির্ণয় সম্পর্কে যে লোকায়তবিধান প্রচলিত সেই মানদণ্ডটাই সর্ববাদী-সম্মত নয়

দর্শনের অনুশীলন স্বচ্ছন্দচিন্তার কর্ষণে ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে চিত্তের যে সমুন্নতি বিধান করে তাকে অস্বীকার করেও বলা যায় চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করে, লোকায়ত সংস্কারকে তিরস্কার করে, অতিপরিচিত সামান্যবস্তুকে অসামান্য অপরিচিতির স্তরে উন্নীত করে দর্শন জগৎ-সম্পর্কে ক্লান্তিকর এক গতানুগতিকতার বোধ মোচন করে এবং এক সম্ভ্রান্ত বিস্ময় উৎপাদন করে। সম্মুখস্থ সমকোণী চতুষ্পদ টেবিলটি এবং টেবিলের উপরিস্থ ছবিটির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় উদ্রিক্ত হয় না বটে, কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে টেবিলটি নানারূপে প্রতিভাত হয়। টেবিলটি বাস্তবিকই যদি সমকোণী হয়, তবে যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, বোধ হবে, টেবিলের দুটি হল সূক্ষ্মকোণ, আর দুটি যেন স্থূল (রাসেল)। রেলপথের দুটি দিক যদিও যথার্থই সমান্তরাল, তবু প্রতিভাত হয় দূর কোন বিন্দুতে যেন দুটি দিক সম্মিলিত হয়েছে। প্রাতিভাসিক এই সব রূপে আমরা বিভ্রান্ত হই না তার কারণ, আশৈশব-লব্ধ শিক্ষানুকূল্যে এগুলিকে মিথ্যা-দৃষ্টি বিবেচনা করতে আমরা অভ্যস্ত। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাহলে টেবিলের বা রেলপথের যে রূপ প্রতিভাত হলো তা তার যথার্থ প্রকৃতি নয়, বিকৃতি; স্বরূপ নয় বিরূপ (not reality but appearance)। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এতই যদি অবিশ্বাস্য টেবিলের তাহলে যথার্থ স্বরূপ কি? উত্তরে বিজ্ঞানী বলবেন, প্রান্ত গতিতে প্রবহমান বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশ হলো টেবিল; দার্শনিক হয়ত বলবেন, টেবিল-বস্তুটি বিধিচিত্তের একটি ভাব (বার্কলে), বা কোন

অস্তিত্বগোষ্ঠী (লেব্‌নিজ), কিংবা বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণ-অতিরিক্ত টেবিলের বুঝি স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই। এমনি করে, টেবিলের প্রাতিভাসিক সত্তায় সংশয় পোষণ করে, টেবিল সম্পর্কে বহুসম্ভাবনার সূত্র আবিষ্কার করে দার্শনিক প্রমাণ করলেন সামান্য বস্তু টেবিল-সম্পর্কেও অনেক আছে আমাদের অজ্ঞাত, ছবিটাও নহে শুধু ছবি! অতএব, দার্শনিকের বিচারে উপেক্ষিত ক্ষুদ্র বস্তুটাও ক্ষুদ্র রইল না আর, নানারূপে অপরূপ হলো ক্ষুদ্রের মধ্যেও আবিষ্কৃত হলো অনন্ত বিস্ময় আর তারই ফলে গতানুগতিকতার ক্লান্তিকর বোধ হতে অব্যাহতি পাওয়া গেল। তবু কি শুনতে হবে, দার্শনিক নিতান্তই নিষ্ক্রিয়?

তা ছাড়াও, দেশে দেশে কালে কালে যে-সব সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, তারও কি পশ্চাতে নেই বিশেষ বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয়? চিন্তা কি করা যায় ফরাসী বিপ্লবের অগ্নুৎপাত রুশোর দার্শনিকঅবদান ব্যতিরেকে? গান্ধী-বিনোবার সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কি বেদান্তের পরম ঐক্যবোধ ও বৌদ্ধ দর্শনের সর্বভূতহিতের আদর্শ হতেই উদ্ভূত নয়? সাম্যবাদী যে সামাজিক অন্দোলন দিকে দিগন্তে আজ বিস্তৃত তাও কি হেগেলীয় দর্শনের ডায়ালেক্‌টিক এবং ফয়ারব্যাকের জড়বাদের সংমিশ্রণ নয়? এমনি করে, যার মাধ্যমে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়, মানুষের প্রাত্যহিক আচরণে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় তাকে বলি কি করে নিতান্তই অলস এবং অলীক কল্পনা? তবে, স্বীকার করা ভালো, অন্নবস্ত্রসংস্থানের মতো কার্যকর হয় না দর্শন, দর্শনের কার্যকারিতা কিঞ্চিৎ পরোক্ষ।

কিন্তু প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্ আন্দোলনে যদিও অনেক খ্যাতিমান বিচক্ষণ পণ্ডিত আস্থাবান তবু কার্যকারিতা বা প্রয়োজন সিদ্ধির মানদণ্ডেই বা কেন বিচার করব দর্শনের মূল্য? সাধারণতঃ যে বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যসুখ, অপ্রাপ্তিতে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা। আর সুখ-দুঃখ যেহেতু অনুভূতির ব্যাপার প্রয়োজনীয় বস্তুটির মুখ্য আবেদন আমাদের অনুভূতির পর্যায়ে কিন্তু কেবল মাত্র অনুভূতিটাই তো মনুষ্যত্বের সারসত্তা নয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিটাও অনস্বীকার্য্য। ভালোলাগা, মন্দলাগা ব্যতিরেকেও মানুষের আর একটা দিক আছে—সে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। (অর্থাৎ, মানুষ শুধু sentient নয়, rationalও বটে।) আর এইখানেই প্র্যাগম্যাটিষ্ট্‌দের ত্রুটি—প্রয়োজনসিদ্ধির মানদণ্ডে যাবতীয় বস্তুর মূল্যনির্ণয় করতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধির গৌরবকে তাঁরা অস্বীকার করেন, প্রমাণ করেন যে তাঁরা একদেশদর্শী।

দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ, দর্শনে বিজ্ঞানসম্মত যথার্থ জ্ঞানের (accurate and definite knowledge) একান্ত অভাব। দর্শনে সঠিক কোন নিশ্চয়তা পাই না; অসম্ভবকে সম্ভব করেছে যে বিজ্ঞান সেই বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসৃত হয় না—বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের তাই অহিনকুল সম্পর্ক।

এ অভিযোগ স্পষ্টতঃ বিজ্ঞান বা দর্শনের অস্বচ্ছ ধারণাপ্রসূত। স্মরণীয় যে, উভয়ের আলোচ্য বিষয়েই কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। বস্তুর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা এবং তার বিচার নিয়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর দর্শন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাতেই সম্পূর্ণ নয়, আমাদের মানসরাজ্যের ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিকবোধ, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র অনুভূতি এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এমন কি বিশ্বের অতীত কোন বিশ্বেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় তারও সঙ্গে মানবজীবনের সম্ভাব্য সম্পর্ক, ইত্যাদি দর্শনের বিচার্য্য বিষয়। বিষয়বস্তুর এই অস্বাভাবিক বিশালতা দর্শনের লক্ষ্যস্থল বলেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনধারিত এবং অনিশ্চিত।

আর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও কি সর্ব্বদাই সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত? বিজ্ঞানী বলেন, বিভিন্ন বর্ণাভাস বিভিন্ন বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রকম্পনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (Different shades of colour are associated with vibration of different electro-magnetic waves) কিন্তু বিবিধ বর্ণ এবং বর্ণের বহুবিধ আভাসের যথাযথ নির্ভুল পরিমাপ বিজ্ঞানও কি অসম্ভব মনে করে না? আমাদের আরও একটা প্রচলিত ধারণা, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ আছে, বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্ত অনায়াস-বোধ্য আর দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিতান্তই রহস্যময়, দর্শনেই যত দুর্বোধ্য চিন্তার আড়ম্বর। তর্কের প্রয়োজনে যদি স্বীকারও করি যে, দর্শন নিতান্তই দুর্বোধ্য—বিজ্ঞানে বোধই বা সহজ কিসে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাভাবিক বোধে পাই বস্তুর তিনটি আয়তন (dimension) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। আইনষ্টাইন বললেন, বস্তুর চতুর্থ আয়তন আছে (fourth dimension)—তা কাল (time); কেন না, কোন বিশেষ কালের সঙ্গে সংযুক্ত না করে বস্তুর বোধই সম্ভব নয়। এও না হয় বোঝা যায়, কিন্তু শুনতে পাই, বৈজ্ঞানিকদের কঠোর গবেষণায় নাকি বস্তুর অনন্ত আয়তনের (x dimension) সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এই x dimension বা অনন্ত আয়তনের বোধ কি অনায়াসলভ্য? সহজ কল্পনায় কি পাওয়া যায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা ব্যতিরেকেও আরও সহস্র আয়তনের অস্তিত্ব!

বস্তুতঃ, গত কয়েক শতাব্দীতে অভূতপূর্ব্ব-সাফল্য লাভ করেছে বলে বিজ্ঞান দৈবীশক্তির দুর্লভ মর্য্যাদা পাচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি যথার্থজ্ঞানের অবিসংবাদী,

অভ্রান্ত মাধ্যম বলে পরিগণিত হচ্ছে। তাই সাহিত্যসমালোচনা থেকে শুরু করে আধ্যাত্মতত্ত্বালোচনাতেও সবাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৌলীন্য-লাভের অভিলাষ পোষণ করছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বত্র অনুপ্রবেশ আদৌ সম্ভব কিনা এই সরল প্রশ্নটিই অনালোচিত থেকে যাচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে যে, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক দর্শনের যতই সংজ্ঞা দিন, ইন্দ্রিয়বোধে অতীন্দ্রিয়ের বিচার (empirical study of the non-empirical) দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা বিশেষ সার্থক নয়। কেননা, বিজ্ঞান আলোচনা করে বাস্তব ঘটনা, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আর ঘটনাকেই একমাত্র সত্য না মেনে ঔচিত্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবের বিচার দর্শনের গুরুদায়িত্ব। কোন আসামী অপরাধ যা করে সেগুলো ঘটনা (fact)। সে অপরাধের প্রবর্তনা কি, পরিপার্শ্ব কি তা নিয়ে রচিত হয় অপরাধবিজ্ঞান, কিন্তু আসামীর পক্ষে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বিধেয় কিনা তা বিজ্ঞান নয় দর্শনের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান বিবৃত করে ঘটনা, দর্শনে সেই ঘটনার মূল্যায়ন। ঘটনা সম্পর্কে সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করতে বাধ্য, ঘটনার অভিমতে অনৈক্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব বাস্তববোধ নয় ঔচিত্যবোধই যেহেতু দর্শনের প্রাণকেন্দ্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দর্শনের ক্ষেত্রে তাই অপ্রযোজ্য।

দর্শনে বিজ্ঞানসুলভ যথার্থজ্ঞানের অভাব তাহলে তার অগৌরব নয়, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গৃহীত হয় নি বলেই দর্শন অকুলীন নয়। কিন্তু সেজন্য বিজ্ঞান ও দর্শনে বিষম বৈপরীত্যও নেই; দর্শন বরং বিজ্ঞানেরই পরিপূরক। বিজ্ঞানের পরিধিতে যার আলোচনা অপ্রশস্ত অথচ যার জ্ঞান বিজ্ঞানবোধে বিশেষ সহায়ক, দর্শনে তারই বিস্তৃত আলোচনা। উদাহরণস্বরূপ, জড়বিজ্ঞান জড়ের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছে—যে 'দ্রব্য' বাহ্যজগৎকে সংরচন করে (the substance of which the physical universe is composed.)। কিন্তু এই 'দ্রব্য' বস্তুটা বিজ্ঞানে অনালোচিত, আর দ্রব্যের যথার্থবোধ না হলে জড়ের সংজ্ঞাটাই দুর্বোধ্য থাকে। অতএব, দর্শন সেই দ্রব্যের আলোচনা করে। আসল কথা, দর্শন যেন সেই হতভাগ্য গৃহস্থ যার সন্তান-সন্ততি কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা পেয়েই পৃথগান্ন হয়। অধুনা যে বিদ্যাসমূহ স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের স্থায়ী মর্যাদা লাভ করেছে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্তও সবাই তো তারা দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (প্রাচীন গ্রীকদর্শনে ডেমোক্রিটাস ও ভারতবর্ষের ঋষি কণাদের পরমাণুচিন্তা দার্শনিক প্রয়াস না বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাভিলাষ?) তারপর কালক্রমে, বিষয়বস্তুকে গণ্ডীবদ্ধ করে, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে দর্শনের সন্তান

বিজ্ঞান হলো। তখন তার আত্মম্ভরিতার অন্ত নেই—সেই করেছে বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন। বৃদ্ধ দর্শন কিন্তু তখনও বলে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশাল ও নির্বিশেষের স্বরূপ উন্মোচিত হয় না। তাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে নীতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী, কবি ও শিল্পীর অনুভূতিকে সংযুক্ত করে বিশ্বব্যাপারের সামগ্রিক রূপসন্ধান দার্শনিকের ঐকান্তিক সাধনা।

দর্শনে বস্তুচিন্তা নেই ; সমাগতকে নিয়ে পরিতৃপ্ত নয় দর্শন, অনাগতে অভিলাষী—এ অভিযোগ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হব যে, আদর্শ সমাজ-সংগঠন যার লক্ষ্য বর্তমানকে নিয়ে পরিতুষ্ট থাকলে চলে না তার, প্রগতি শব্দের মধ্যেই সে পায় গতির সংকেত। সমাগত বর্তমানকে নিয়েই যদি সন্তোষবোধ করা যেত তাহলে পুরাতন-সমাজব্যবস্থার অচলায়তনটাই কণ্ঠরোধ করত, সম্ভব হতো না অগ্রগতি। বাস্তব ব্যাপার সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না মোহ-মুদ্গরের কবি-কণ্ঠে—

যাবৎ বিত্তম্ নিজকর্মোপাত্তম
তেন বিনোদয় চিত্তম্।

অথবা, অগ্নিবর্ষণ করত না বিদ্রোহী-বীর মার্ক্সের লেখনী। অতএব, মনের স্বাভাবিক ধর্মই যদি হয় বর্তমানকে উল্লঙ্ঘন তাহলে বর্তমানের চতুষ্প্রাচীরে নাই বা আবদ্ধ হলো দর্শন, ক্রান্তদর্শী বলে তবে কেনই বা উপহসিত হবেন দার্শনিক ?

তবু একথা সত্য যে, দর্শন সম্পর্কে যে লোকাপবাদ, সাম্প্রতিক সমাজের যে অনীহা ও ঔদাসীন্য তার জন্য দায়ী স্বয়ং দার্শনিকরাই দার্শনিকদের বিষয়-নির্বাচন। এযাবৎ, দার্শনিকরা তত্ত্বদর্শনেই ('Speculative philosophy'—Broad) আত্মমগ্ন ছিলেন ; বিভিন্ন বিজ্ঞান, ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের সহায়তায় বিশ্ববীক্ষণে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু উপলব্ধি করেন নি যে বিজ্ঞান এবং ধর্মেও অনেক অর্থহীন, অমূলক শব্দ এবং প্রত্যয়ের প্রচলন হয়েছে ; তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সেই অর্থহীন, অস্পষ্টতর সংক্রমণ ঘটেছে দর্শনেও। শব্দ এবং বাক্যের মাধ্যমেই যখন বিশ্বরূপদর্শন করতে হয় তখন শব্দ-বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তো একান্ত প্রয়োজন। অতএব দর্শনের সাফল্য নির্ভর করছে বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের (Critical Philosophy—Broad) উপর। বর্তমানে, তত্ত্বদর্শন অসার প্রতিপন্ন হ'য়েছে কেননা বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের পরমতসহিষ্ণুতা এযাবৎ দুর্লভ ছিল। দর্শনকে অর্থবহ হতে হলে তাত্ত্বিকতার পথে নয়, ভাষা-বিশ্লেষণের পথেই অগ্রসর হতে হবে। সর্বাগ্রে

শব্দের লৌহমল সংস্কার হোক, প্রত্যয়সমূহ শাণিত হোক, স্পষ্ট হোক তারপর তত্ত্ব দর্শনে অভিলাষী হবেন দার্শনিক।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বিশেষ বিশেষ যুগে দর্শনে বিশেষ ধরণের মানবিক সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে কিংবা মধ্য-যুগীয় ইউরোপীয় দর্শনে ধর্মচিন্তার (religion) প্রাধান্য। ন্যায়শাস্ত্র ও কান্ট, এবং তৎপরবর্তী দার্শনিক চিন্তা জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) নিপুণ বিশ্লেষণ; চাণক্য রুশো-গ্রীণে রাষ্ট্রচিন্তার (politics) উৎকর্ষ, কৌটিল্য বা মার্ক্স অর্থনীতিতে (economics) ঐকান্তিক অভিনিবেশ। বিশেষ যুগে বিশেষ সমস্যাই প্রকট হয়েছে। আজ বলিষ্ঠ সেই আশা পোষণ করতে ক্ষতি কি যে, বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের সহায়তায় অনাগতকালের তত্ত্বদর্শন মনস্তত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা ও অর্থনীতির, বিজ্ঞান ও ধর্মের শোভন সমন্বয় সাধন করে সার্থক ও সর্বাঙ্গসাধক হবে, জীবনের বহুবিধ সমস্যার এক একটি নিদর্শন নয় মানবজীবনের সামগ্রিক এক অর্থপূর্ণ ভাষ্য হবে?

অদ্বৈতাচার্য

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক, ভারতীয় দর্শনের মর্মবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি. লিট মহাশয় দেহত্যাগ করার ফলের সমগ্র দেশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পূরণ কোন দিন হবে কিনা জানি না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান অনুসারে মানুষ মাত্রেরই যে এই শেষ পরিণতি তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না সত্য কিন্তু অতি নিকট আত্মীয়ের সম্বন্ধে যখন এ কথা খাটে তখন বিধাতাকে আদালতীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বোধ হয় কেউই ছাড়ে না। তাই প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রসঙ্গটি মানুষের মনের চৌকাঠ থেকেই বিদায় নিয়ে থাকে। আমরাও তাই মহামহোপাধ্যায়ের একটি কথাকে কখনই মনে স্থান দিতে চাইতাম না। কতবার বলেছেন—দেখ, যা পার শিখে নাও, আমি কিন্তু পাকা ফলের মত টুস্ টুস্ করছি, যে-কোন মুহূর্তেই এই পাকা ফলটি পড়ে যেতে পারে। কথাটা শোনার পর তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি। কিন্তু দুঃসহ বাস্তব একদিন এসেছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষী বিজয়বাবুর কথায় ভরসা রেখেছিলাম, আশা করেছিলাম, আরও দু'টি বছর অন্ততঃ মহামহোপাধ্যায়কে পাব। কিন্তু দুর্দম যম ৭৮ বছরেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সরস্বতীর যে বরপুত্রটিকে গত বছরের মে মাসের ৫ই তারিখে সমগ্র দেশ হারিয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যের, গভীরতার পরিমাপ করতে গেলে "গামিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্. এ, পি এইচ, ডি মহোদয় তাঁর দেহাবসানের পর যে মন্তব্য করেছিলেন তাই বলছি—"মধুসূদন সরস্বতীর পর এ জাতীয় পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করেন নি। আমরা মহামহোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের পরিধি কত বিশাল ছিল তার পরিচয় বহুবার পেয়েছি। যে কোন বিষয় নিয়ে যে কেউ যখন গিয়েছে তারই উত্তর তৎক্ষণাৎ পেয়েছে। তাঁর উত্তরের মধ্যে সব সময়েই থাকত অনুভূতির প্রাণস্পর্শ। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ—কোন্ শাস্ত্রেই বা তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল না। তাই তিনি ছিলেন আমাদের জীবন্ত Encyclopaedia

বাংলা প্রদেশের এমন কোন মধ্য বয়স্ক, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পর্যন্ত, পণ্ডিত দেখি না যিনি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে যান নি। আর বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তো একথা নিরপরাদ সত্য যে আজ বেদান্তের সকল মধ্য বয়স্ক অধ্যাপকই তাঁর ছাত্র। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে সেই দিনগুলি ও দৃশ্যগুলির কথা চিন্তা করলেও রোমাঞ্চ হয় যে, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী, ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডাঃ সুধেন্দু কুমার দাশ ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ তাঁর কাছে অদ্বৈতসিদ্ধি, বিবরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করছেন।

এই অগাধ পাণ্ডিত্যের আগার মহামহোপাধ্যায়ই আবার অতি সামান্য গ্রন্থ, যেমন বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা ইত্যাদি, অধ্যাপন করছেন এম্, এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সহায়তার জন্য, তাও দেখেছি। সাগ্রহে তাদেরকে পড়াতে দেখে অনেকেই অবাক্ হতেন। অনেকেই দুঃখিত হয়েছেন তাঁর সময়ের এইরূপ অপচয় দেখে। ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেকবার বলতে শুনেছি —"আজ আমাদের দেশ তাঁর পাণ্ডিত্য বুঝল না, অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা সম্পূর্ণ হ'ল না, বেদান্তসার পড়ানতেই তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছে। দেশের দুর্ভাগ্য যে শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাট্না বাঁটা হচ্ছে!" কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকার নেই। তিনি কাউকেই বিমুখ করেন না।

বহুশাস্ত্রদর্শী ও শাস্ত্ররহস্যবেত্তা হয়েও তিনি তাঁর শিক্ষার পথ বন্ধ ক'রে রাখেন নি। অতি সাধারণ ঘটনা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এ কথা বহুবার প্রকাশ করেছেন। এখানে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার হরিদ্বার গুরুকুলে অধ্যাপনা কালে একজন মেথরানী তাঁকে বলেছিল—পণ্ডিতজী, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সকলেই বলছে আবার বিয়ে করতে। আপনার কি মত?" তাতে মহামহোপাধ্যায় ভাবলেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তো বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছেই আর তা ছাড়া এই প্রৌঢ়ার পক্ষে স্বামিব্যতিরেকে জীবনযাপন হয়ত সম্ভবপর হবে না। তাই উত্তর দিলেন—"তা, দোষ কি?" তাতে সেই মেথরানী তেজস্বিতার সঙ্গে উত্তর দিল—"পণ্ডিতজী, আপনি এ কি বলছেন? যার কাছে এই হৃদয় সমর্পন করেছিলাম আজ আবার তাকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে মিলিত হব? আমার এই হৃদয়কে একমাত্র মৃত স্বামীই পেতে পারে, সংসারে আর কেউ নয়।" মহামহোপাধ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমাকে বলেছিলেন—"তখন বুঝলাম, এই ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র! এর একজন মেথরানীও যে কি ভাবে চিন্তা করতে পারে তা আমার ধারণার অতীত। কতই শিক্ষনীয় রয়েছে!"

গুরুকুলেরই অপর একটি ঘটনা। একবার তাঁর কাজকর্ম ক'রে দেওয়ার জন্য একটি রাজপুতবংশীয় দ্বারবান্ ভৃত্যের নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে কোন একটি কাজ বল্‌লেই সে জুতা পরত এবং লাঠি হাতে নিত ও তারপর কাজটি করত। এমন কি সামান্য দরজা বন্ধ করতে চলেও তার এই জুতো পরা ও লাঠি হাতে নেওয়া বাদ যেত না। একবার তাই বিরক্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি সব সময়েই, এমন কি দরজা বন্ধ করতেও এত কর কেন? এখনই তো তোমাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না যে, জুতো পায়ে দিয়ে, লাঠি হাতে নিয়ে তৈরী হয়েই তারপর দরজা বন্ধ করতে হবে!" তাতে সেই দ্বারবান্‌টি উত্তর দিয়েছিল—"আপনি এ'কথা কেমন করে বলেন? আমি না রাজপুতবংশীয়? সর্বদা অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকাই আমার ধর্ম, তা কাজে আসুক্ অথবা নাই আসুক্। আপনি যে পৈতা পরে আছেন এটা কি আপনার সব সময়ে কাজে লাগে, পড়াবার সময়ে আপনার পৈতার তো কোন প্রয়োজন নেই, তাই বলে কি খুলে রেখে দিয়েছেন? সেই রকম আমারও ক্ষেত্রে"। মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে, সত্যই সেদিন ঐ দ্বারবানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, উদ্ভট শ্লোক, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে তিনি এতই উদ্ধৃত ক'রে কথা বল্‌তেন যে, অবাক্ হয়ে ভাবতাম—কেমন ক'রে এত মুখস্থ থাকে? কতবার করেই বা এগুলো পড়েছেন? এত পড়েনই বা কি করে? তাই একবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একটা বড় শ্লোক কতবার পড়লে আপনার মুখস্থ হয়? তাতে বলেছিলেন ২।৩ বার পড়াই যথেষ্ট!

কথা প্রসঙ্গে একবার বুঝলাম যে, গুরুভক্তি তাঁর মনে কি নিদারুণ বল এনে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের কথা মিলিয়ে নিলাম—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতাঃ কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" আমাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি পড়াতে হয় এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি জানালাম এবং বললাম যে, একখানি বই আমার ভাল করে পড়া নেই, তাই কেমন করে পড়াব চিন্তা হচ্ছে। তাতে মহামহোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহিত ক'রে বললেন—"তোমার বয়স অল্প, পড়ার উৎসাহ আছে, বুদ্ধি আছে, কোন বই পড়ানতে পশ্চাৎপদ হবে না। পড়া না থাকে পড়ে নিয়ে পড়াবে।" তাই নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে বললেন—"আমি যখন গুরুকুলে ছিলাম তখন

আমার ওপর একখানা বই পড়ানর ভার পড়ল অথচ সে বই আমি আগে কোনদিন পড়িনি। আমি পিছিয়ে যাই নি, অত্যন্ত যত্ন সহকারে বইখানি পড়তাম আর যখনই কোন সমস্যার সমাধান আমার বুদ্ধির দ্বারা হত না তখনই অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রীজীর (মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রী) কথা চিন্তা করতাম আর তার পরেই উত্তরও পেয়ে যেতাম।" কথা প্রসঙ্গে তিনি যে রহস্য উদঘাটন ক'রে দিলেন তা আমার কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

এ ছাড়া, তাঁর "ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয়" নামক গ্রন্থের ভূমিকাটি যখন তিনি আমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন তাঁর গুরু শাস্ত্রীজীর উল্লেখ কালে তাঁকে যেরূপ বিগলিত হৃদয় ও অশ্রু পরিপ্লুত দেখেছিলাম তা ভারতের প্রাচীন পন্থী শিষ্যদের মধ্যেই সম্ভব। যেখানে আধুনিক কালের ছাত্রেরা গুরুর দোষাবরণরূপ ছত্র ধারণের পরিবর্তে গুরুর দোষরূপ ছত্রকে সর্বদা উন্মীলিত করতে ব্যগ্র এবং তার দ্বারা গুরু অপেক্ষা নিজের পাণ্ডিত্য অধিক এ কথা প্রখ্যাপনের চিন্তায় মগ্ন, সেখানে এ রকম গুরুভক্তি সহজেই হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাই সে দৃশ্য আমার স্মৃতিপটকে চির উজ্জ্বল রাখবে।

ছাত্রই ছিল মহামহোপাধ্যায়ের জীবনের অর্জিত সম্পদ। এ কথা তিনি দু'একবার প্রকাশও করেছেন। তিনি বলেছেন—"দেখ, টাকা উপার্জনের দিকে লক্ষ্য করি নি, বাড়ী ঘর করিনি, চিরদিন ভাড়া বাড়ীতেই কাটালাম, আমার সম্বল এই কয়েকখানি বই আর তোমরা।" সত্যই তিনি যে বাড়ীখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেছেন তার অসুবিধাগুলি চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, তা বৃদ্ধের বাসযোগ্য গৃহ নয়। মা-ঠাকুরুন যে ভাবে সিঁড়িতে আহত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় অচেতন ভাবে দু'তিনবার প'ড়ে ছিলেন সেই কথা চিন্তা করলেও বিভীষিকা হয়। কিন্তু তাতে বৈদান্তিক মহামহোপাধ্যায়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিরতি ঘটে নি।

অর্থের লোভ থেকে ছিলেন তিনি চিরমুক্ত। কারও দান পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার এক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে কোন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পণ্ডিত সমাজকে অর্থাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। মহামহোপাধ্যায়ের উপস্থিতির জন্য সেই মাড়োয়ারীর বিশেষ আগ্রহ থাকায় তিনিও যান, কিন্তু প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন নি। তারপর সেই মাড়োয়ারী লোকচক্ষুর অন্তরালে মহামহোপাধ্যায়ের অপরিগ্রহ ব্রত ভঙ্গের উদ্দেশ্যে অধিকতর লোভনীয় দ্রব্য নিয়ে আসে তাঁর বাড়ীতে। মহামহোপাধ্যায় তার বুদ্ধির নিন্দা

করে বলে ছিলেন—আপনি কি' আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন? তাতে সে লজ্জা পায় ও ক্ষমা ভিক্ষা করে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাতে অব্যাহত ভাবে চলতে পারে তার জন্য তিনি শুধু অর্থ কেন সকল প্রকার সুখ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদের সুবিধা অনুসারে অধ্যাপনার সময় স্থির করতেন। ছাত্র-প্রীতির জন্য তিনি রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্তও মীমাংসার দুরূহ গ্রন্থ অধ্যাপন করেছেন। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেল এবং তা তাঁর আমৃত্যু সহচর হয়ে রইল।

শুধু রাত্রিতে কেন, ছাত্রদের জন্য তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতেও প্রস্তুত। আমার মনে আছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালের শীতেও তিনি ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করতেন শুধু আমি পৌঁছানর আগে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। আমি বার বার বলেছি—"আমি কি দেরী করে আসব"? তিনি উত্তর দিয়েছেন—ভোরের দিকে পড়া ভাল হয়। তখন না পড়ালে চলবে কি করে? ওতে আমার কোন কষ্ট হয় না। তিন দিনে তিনি সমগ্র চণ্ডীপাঠ করতেন। তার মধ্যে তৃতীয় দিনের পাঠ্য অংশ ছিল বেশী এবং সেদিন তাঁকে আরও আগে উঠতে হত পাছে আমাকে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়।

ছাত্রদেরকে কোন নতুন কথা শোনাবার জন্য তিনি থাকতেন সর্বদা উদ্‌গ্রীব। তাই অনেক সময়ে বইয়ের মধ্যে কাগজ দিয়ে রাখতেন যাতে অনায়াসে সেই জায়গাটা খুলে আমাদেরকে দেখাতে পারেন। নিদারুণ অসুস্থতার সময়েও তার সর্বদাই লক্ষ্য থাকত ছাত্রদের শিক্ষার দিকে। তার যেন একটা পণ ছিল যে, কোন সময়ে ছাত্র কিছু না শিখে চলে যাবে না। তাই যখন ক্যান্‌সার রোগ পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেনি, কেবলমাত্র গলায় ব্যথা অনুভব হয়েছে এবং তার জন্য আদা বাটার প্রলেপ দিচ্ছেন আর গোলমরিচ, আদা, দারুচিনি ইত্যাদির কাথ সেবন করছেন তখনও প্রতিটি ছাত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন এবং তখনও তাঁর ইচ্ছা যে, আমি অদ্বৈতসিদ্ধির অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা শেষ করি। নিয়মিত পড়িয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর অদ্বিতীয় গ্রন্থ "অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা" থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। শরীর দুর্বল, কাজে উৎসাহ পান না কিন্তু অধ্যাপনা অবিরাম ভাবে চলেছে।

মহামহোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত বৈদান্তিক। সকলেই ছিল তার অতি আদরের; ছাত্র বা জিজ্ঞাসু হলেই হল, তাকেই তিনি অকাতরে দান করেন।

লোক দিয়ে ডাকিয়ে আনেন তার ছাত্রদের। প্রয়োজন কি? না, কোন ছাত্র এখনও ডক্টরেট ডিগ্রী পায় নি; তার কিসে অসুবিধা হচ্ছে তাই তার জিজ্ঞাস্য। তিনি ছাত্রটিকে বলেন, তুমি আস না কেন? আসবে, পড়বে। এ কথাগুলো আজকের জগতে বিশ্বাসের যোগ্য নয়। যখন লিখছি তখনই মনে হচ্ছে যেন শব্দগুলো আজকের জগতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যে ভরা। কিন্তু লিখতে পারছি এই জন্য যে, আমার মনের মুকুরে মহামহোপাধ্যায় রয়েছেন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত। আমি জানি যে, যে ব্যক্তি মহামহোপাধ্যায়ের নিন্দাও করে থাকে ব'লে সকলে জানেন এবং তা তারও অপরিজ্ঞাত নয় তাকেই তিনি সকল সম্বোধের অবসান করে সন্তুষ্ট করেছেন।

বেদান্তীর কাছে দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু। তাই তিনি নির্ভয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই জন্য সংস্কৃত কলেজ তারকেশ্বরের মোহান্ত পদের ব্যাপারে যখন চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতিতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার এক সভা চলেছিল তখন তিনি অল্প বয়স্ক হলেও সোজাসুজি চিত্তরঞ্জনের কাজের ও কথার অসামঞ্জস্য ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ কথাও আমরা শুনেছি যে, মুর্শিদাবাদে আদ্যাকালী টোলে পড়ার সময়ে সরকারী অফিসে বৃত্তি আনতে গিয়ে যখন তিনি তার এক সহপাঠী বন্ধু অপমানিত হয়েছিলেন তখন তিনি সেই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রহার করতে দ্বিধা করেন নি।

উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার ভয় হয়নি। তাই যখন পুরীতে থাকা কালে একদিন অনেকক্ষন ধরে স্নান করার পর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠে আসছিলেন তখন বন্ধুদের আহ্বান এল আবার কি তিনি সমুদ্রে স্নানে যেতে প্রস্তুত? মহামহোপাধ্যায় একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন সেই পরিশ্রান্ত অবস্থায় আবার সমুদ্রে স্নান করতে। কিন্তু সঙ্গীরা যখন তাকে বললেন—আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? তখন তিনি আবার বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তার পক্ষে ফিরে আসা অসম্ভব হয়েছিল। সমুদ্র গর্ভে বিলীন হওয়াও কিছু অসম্ভব ছিল না, কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর সাহায্যের জন্য তার হস্ত প্রসারিত করলেন একটি লুনিয়ার মাধ্যমে। তাই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আমরা পেলাম।

এই সাহসী ও তেজঃপূর্ণ হৃদয়ও ছিল কোমলতায় ভরা। সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্রাবাসটি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তার নাম ছিল নিস্তারিনী ছাত্রাবাস। মহামহোপাধ্যায় একাদিক্রমে অনেক বৎসর সেই ছাত্রাবাসের

পর্যবেক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সর্ববিধ দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল বিশেষ বিশেষ কারণে দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করা। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি যে ১০।১১ টাকা পেয়ে থাকেন তার সম্পূর্ণ অর্থ সংগৃহীত করতে হবে এবং সেই ফাণ্ড থেকেই প্রয়োজন মত অর্থ ব্যয় করা হবে। ছাত্রদের জন্য নানা কারণে বহু অর্থ ব্যয় করেও তিনি অবসর গ্রহণ কালে প্রায় ৭০০৲।৮০০৲ টাকা গচ্ছিত রেখে যান। আমরা শুনেছি যে, পরবর্তী কালের পর্যবেক্ষক ও সংস্কৃত কলেজের দু'একজন অধ্যক্ষ পর্যন্ত টাকার প্রয়োজন হলে ছাত্রদেরকে ঐ ফাণ্ড থেকে টাকা নেবার জন্য বলতেন। একটি ছাত্রের মৃত্যু হওয়ায় তার সৎকারের জন্য অর্থও নাকি ঐ ফাণ্ড থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল!

দেশ ও ধর্মের প্রতি যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরাগ জন্মায় তার জন্য তিনি রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি করে দেখাতেন যে, দেশের কল্যাণের জন্য যে দেহত্যাগ করে তার যে লোক প্রাপ্তি ঘটে তা ভীষ্মেরও কাম্য। তাই ভীষ্মও বলছেন।

তেভ্যো নমশ্চ ভদ্রঞ্চ যে শরীরাণি জুহ্বতে।
ব্রহ্মবিষো নিষচ্ছন্তস্তেষাং নোহস্তু সলোকতা॥

এই দেশরক্ষা ও শাসনের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে তা দীর্ঘকাল পরাধীনতারই ফল। ভারতের স্বাধীনতার যুগে আমরা কতখানি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম তা' তিনি তাঁর "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন।

মহামহোপাধ্যায়ের ধর্মানুরাগিতার চূড়ান্ত নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাঁর মৃত্যুকালে। তখন তাঁর একটি মাত্র কামনা—গঙ্গা ধ্যান, গঙ্গা জপ, গঙ্গা নাম এবং আকণ্ঠ গঙ্গাজল পান। কি পরিমাণ ধর্মভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকলে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর মানুষ কেবল গঙ্গা জলেরই কামনা করতে পারে তা চিন্তা করলে হতবাক্ হতে হয়।

মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গ দীর্ঘকাল লাভ করেছিলাম, তার স্নেহ, কৃপা ও ভালবাসা লাভ করেছিলাম—এর জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। দিনের পর দিন কত কথা হয়েছে, তার জীবনের কত ঘটনার কথা বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কতবার ভেবেছি—এ রকম এতগুলি গুণের সমাবেশ কি করে হয়? উত্তর এই পেয়েছি যে, সমন্বয়বাদী অদ্বৈতাচার্যের জীবনে যদি এত গুণের সমন্বয় না হবে তবে কোথায় তার স্থান?

সম্পাদকীয়

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক বিভাগেই তাহার জ্ঞান ছিল অনন্য সাধারণ। যিনি স্বল্পকালের জন্যও তাহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনি তাহার অগাধ ও সুদূর প্রসারী পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেন। প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের বহু দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে মূলতঃ প্রাচীনপন্থী হইলেও আধুনিক বিদ্বান ও দার্শনিকদের নানা বিষয়ে মতামত শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন এবং ঔদার্য্যের সহিত সেগুলির বিচার করিতেন। এই অনাড়ম্বর ঋষিকল্প মনীষীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিদ্বৎ সমাজে যে স্থান শূন্য হইল তাহা অপূরণীয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ১৩৫৬ সালে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

• • • • •

সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সরকারী ডাক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। তাহাকে পরিষদের প্রত্যেকটি সভায় নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনাদিতে যোগ দিতে দেখা যাইত। তাহার কয়েকটী প্রবন্ধ 'দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে পরিষদ এক অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছে।

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১।০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্
২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

PUBLISHED BY K. C. GUPTA, M. A. FROM 20 2 HALDER BAGAN LANE,
CALCUTTA AND PRINTED BY SRI RAMRANJAN DAS.
SRI HARI ART PRESS, 1, HARITAKI BAGAN LANE,
CALCUTTA—6.

February, 1961—200.

১৩৮১ আষাঢ়

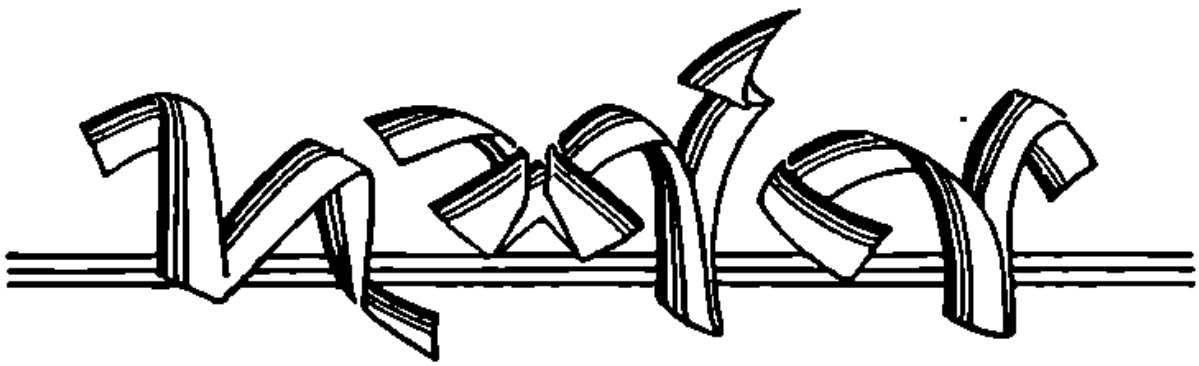

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] শ্রাবণ [১৩৬৭ সাল

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

মূল্য ১।০ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] শ্রাবণ [১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জি. ই. মূরের দার্শনিকতা	শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী	১
২।	ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা	শ্রীসত্যমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩
৩।	কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব	ডঃ শ্রীভিষুষণ চট্টোপাধ্যায়	২৪
৪।	কথার কথা	শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫

জি. ই. মূরের দার্শনিকতা

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

(১)

ডাঃ জি. ই মূর, ও, এম, জীবদ্দশাতেই একজন বিজয়কীর্তি দার্শনিকরূপে সম্মানিত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মূরের সমসাময়িক ইঙ্গ আমেরিকান দার্শনিকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব যাদৃশ ও প্রচণ্ড। এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দার্শনিক-প্রবর আখ্যা দিতে কোন বাধা থাকিবার কথা নহে। কোন বিশেষ অস্তিত্বাচক দার্শনিক মতবাদের উদ্ভাবক বা প্রচারক না হইয়াও তিনি লব্ধকীর্তি দার্শনিক। প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপক মণ্ডলী তাঁহার সুকথিত চিন্তাবলী সমন্বিত, তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী সাগ্রহাতিশয় সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতে আমরা সুনিশ্চিতরূপে আলোক প্রাপ্ত হইতে পারি; সময় সময় এই আলোকের তীব্র ছটাতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। মূরের সুতীক্ষ্ণ বিচারপ্রবণ মানসিকতার দীপ্তিতাপে দর্শন জগতের বহু আবর্জনা রাশি পুড়িয়া ঝুরিয়া নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; বিশেষতঃ ভাববাদী দর্শনের ভাবাপুতা অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়াছে। প্রাক্‌মূরীয় যুগে যাহাই হউক না কেন, দর্শন জগতে অন্ততঃ মূরের উত্তরসাধকগণ সকথ্য উপস্থিত করিতে অত্যন্ত সংযমী ও সাবধান হইয়াছেন—অনাবশ্যক বাগ্‌বিস্তার ও আলংকারিক বাচনভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনাকে, দার্শনিক বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ধারে মূরের সন্ধানী দৃষ্টির তীক্ষ্ণতারই ফল বলিয়া গণ্য করা যায়। বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ডাঃ মূর কোন বিতর্কিত সমস্যা হইতে সযত্নে যাবতীয় অপসারণ করিয়া খাঁটি সুবর্ণটুকু বাহির করিয়াছেন; মানুষের তাত্ত্বিক চিন্তা যে সকল চোরাগলিতে স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদের নির্দ্দেশ করিতে তাঁহার নিপুণতার তুলনা নাই। একই আপাতঃ সাধারণ সমস্যা বা প্রশ্নের মধ্যে কত বিভিন্ন সমস্যাবলী ও প্রশ্নরাজি লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা চিড়িয়া চিড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে মূর যত্ন করিয়া

ছেন ; আর বলিয়াছেন যে, কোন্ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিবার জন্যই দার্শনিকগণ বিভ্রান্ত হইয়াছেন ও তাহাদের সমাধান কার্যকরী হয় নাই (প্রিন্সিপিয়া এথিকা)। মানব জীবন ও তাহার অভিজ্ঞতার কিছু কিছু সমস্যা এই ভাবে বিশ্লেষণ মুখে শোধিত হইতে হইতে ডাঃ মূরের হস্তে এতই ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে বাস্তবিকই কোন সমস্যা নাই। ডাঃ মূরের এবম্প্রকার সূচীমুখ বিশ্লেষণের ফলে তিন প্রকার বিকল্প অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ স্থূলত্বের আবর্জনা অপসারিত হইতে হইতে সমস্যার বস্তুটি এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া আসে যে উহা একটি বিলীয়মান ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হয় ; আর আমরা কোন সমস্যা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হই। দ্বিতীয়তঃ শোধিত সমস্যাটি অবাস্তব মনে না হইলেও উহা এতই অদ্ভূত ও কাণ্ডজ্ঞান বিরোধী মনে হইতে পারে যে ওই সমস্যার যে কি ভাবে উদ্ভব হইয়াছিল তাহা যেন আমরা ভাবিয়া পাই না। অথবা, তৃতীয়তঃ এমনও হইতে পারে যে বিশ্লেষণ মুখে আমরা এমন এক মূলীভূত সূক্ষ্ম সমস্যার সম্মুখীন হইলাম যে সেই সমস্যার আর কোন সমাধান নাই বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু কোন সমস্যা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে অথবা কোন মূল সমস্যা অদ্ভূত বা সমাধানহীন বলিতে পারিলেই আমরা খুব বিজ্ঞ হইলাম মনে করা সমীচীন হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাই দর্শন জগতে ডাঃ মূরের এই যে বিরাট অভ্যুদয়, তাঁহার প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের এই যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তাহা আমার নিকট এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রবন্ধে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার কিছু কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বথা অযৌক্তিক বলিয়া যদি কেহ নির্দেশ করেন তবে আমিই সর্বাপেক্ষা লাভবান হইব।

(২)

আমরা জানি যে ডাঃ মূর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে আসিয়া লর্ড রাসেল ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রভাবে দর্শন আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। মূর নিজেই বলিয়াছেন যে বিশ্বসংসারে বা মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি কোন দার্শনিক সমস্যা খুঁজিয়া পান নাই। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত কোন দার্শনিক প্রশ্ন তাঁহার মনে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে উদিত হয় নাই। এমন মনে করা হয়তো অসঙ্গত নহে যে মানব জীবন বা তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যা থাকিতে পারে ; সামাজিক, অর্থ-

নৈতিক, রাজ নৈতিক, ঐতিহাসিক এমন কি নিছক নৈতিক সমস্যাও থাকা সম্ভব ; কিন্তু বিশেষ রূপে 'দার্শনিক' বলিয়া কোন সমস্যা আছে বলিয়া ডাঃ মূরের মনে হয় নাই। তবে খ্যাতকীর্ত্তি দার্শনিকগণ যে সকল সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, আর উহাদের সমাধানে যাহা বলিয়াছেন তাহাই ডাঃ মূরকে ভাবাইয়াছে। ডাঃ মূরের নিকট দার্শনিক ও তাহার বক্তব্যই সমস্যা। ডাঃ মূরের পরিণত বয়সের এই উক্তিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে উহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।" আমার মনে হয় না যে, বিশ্বসংসার বা বিজ্ঞানগুলি কখনই কোন দার্শনিক সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত করিতে পারিত। অপর দার্শনিকগণ জগৎ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমার নিকট দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে "(আত্মচরিত, ফিলসফি অব জি. ই. মূর, পৃঃ ১৪)।* এই কারণেই ডাঃ মূরকে "দার্শনিকগণের দার্শনিক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ মূর যাহাকে দার্শনিক সমস্যা বলিয়া মনে করেন তাহার উদাহরণ দেওয়া এই স্থলে প্রয়োজন। তৎকালীন দার্শনিক-অধ্যাপক ম্যাক্‌টেগার্ট মহোদয়ের একটি দার্শনিক উক্তি মূরকে ভাবাইয়াছে। উক্তিটি হইল "কাল অবাস্তব (Time is unreal)"। এই উক্তিটি লইয়া তৎকালীন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকগণের মধ্যে খুবই বিতণ্ডা চলিতেছিল। ডাঃ মূরের সুসংস্কৃত কাণ্ডজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছে যে দার্শনিক ম্যাক্‌টেগার্টও নিশ্চয় ঐ বাক্যটিকে সর্বথা মিথ্যা বলিয়া জানেন ; কারণ, দার্শনিক নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি অদ্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছেন ও পরে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও যে দার্শনিক কেন "কাল অবাস্তব" এইরূপ অদ্ভুত কাণ্ডজ্ঞানবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করেন ও বিশ্বাস করেন, ইহাই মূরের সমস্যা। "মানস নিরপেক্ষ বহির্বস্তু নাই" এমন বাক্য ভাববাদী দার্শনিকেরা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহারা অতি সুনিশ্চিতরূপে জানেন যে "ইহা আমার দক্ষিন হস্ত, ইহা আমার বাম হস্ত, কাজে কাজেই দুইটি বহির্বস্তু বিদ্যমান" এই বাক্যটি সর্বথা সত্য। এখন যে বাক্য শুধু সত্যই নহে, যে বাক্যকে দার্শনিকগণ সুনিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া জানেন বা স্বীকার করেন, সেই বাক্যেরই বিরোধী বাক্যকে কেন যে তাঁহারা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ইহাই ডাঃ মূরের সমস্যা।

---

* "I do not think that the world or sciences would ever have suggested to me any philosophical problems. What has suggested philosophical problems to me is things which other philosophers have said about the world and the sciences."

এখন এই "দার্শনিকের দার্শনিক" ঠিক কি অর্থে দার্শনিক তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইনি দার্শনিক হইলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দার্শনিক হইবেন, প্রাথমিক পর্য্যায়ের নহে। কিন্তু প্রাথমিক পর্য্যায়ের দর্শনকে দর্শন আখ্যা দিলে ইহা মানিতে হইবে যে দর্শনেতিহাসে খ্যাতকীর্ত্তি দার্শনিকগণ যে সমস্যা গুলির সম্মুখীন হইয়াছেন সেগুলি দার্শনিক সমস্যা আর সেইগুলি মানবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জাগিয়াছিল। কিন্তু মূর জীবন ও জগতের মধ্যে এই প্রকার দার্শনিক সমস্যা খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া বলিয়াছেন। মূরের এই মত যদি তাঁহার সনিষ্ঠ মত হয় তবে দুইটি বিকল্প থাকিতে পারে। প্রথমতঃ মূর হয়তো বলিতে পারেন যে দর্শনেতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিকগণ যে তথাকথিত দার্শনিক সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়াছেন, ঐগুলি দার্শনিক সমস্যাই নহে; দার্শনিক সমস্যা হইতেছে দার্শনিকগণ কি কারণে নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস বিরোধী বাক্য স্থাপন করিতে চাহেন এইরূপ মূলবর্ত্তিত সমস্যা। দ্বিতীয় বিকল্প হইতেছে যে জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উত্থিত সমস্যাগুলি বাস্তবিকই 'দার্শনিক' সমস্যা, কারণ দর্শনেতিহাসের পূর্বাচার্য্যগণকে দার্শনিক আখ্যা দিতে মূরের আপত্তি নাই; তাহা হইলে মূরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান অ-দার্শনিক সমস্যার অদার্শনিক সমাধান হইয়া পড়ে। পরন্তু ডাঃ মূর তাঁহার নিজস্ব 'দার্শনিক' সমস্যাটির সমাধান কুত্রাপি দেন নাই; তাঁহার আলোচনায় কোন স্থানেই ঐ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যার সবিস্তার আলোচনা ও সমাধান নাই। ডাঃ মূরকে এক "বিরাট প্রশ্ন উত্থাপক কিন্তু সীমিত উত্তরদাতা" বলা হয়; আর এই দিক হইতে তাঁহাকে সক্রেতিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বোধ হয় তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার নিজস্ব দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যাটির অদ্ভূতত্বই উহাকে কবরস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে বাক্য যদি নৈতিক বাক্য না হয়, তবে দার্শনিকের বাক্য সম্বন্ধে বাক্যও দার্শনিক বাক্য হইবে না। অথচ দার্শনিক বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ও মতগুলি দার্শনিক আলোচনা বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্বীকৃতি আমরা বর্ত্তমানের বিশ্লেষণমুখী দার্শনিকদের গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রিকাদিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু এই অর্থে 'দর্শন' কথাটির অর্থ এতই ব্যাপক হয় যে কি বস্তু যে দর্শন আলোচনার বাহিরে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

মূরের উপরিউক্ত সমস্যাটি যদি দার্শনিক সমস্যা হয় তবে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে দার্শনিক সমস্যা বলিয়া বুঝি তাহার সহিত উহার সম্পর্ক নাই। দর্শনেতিহাসের লব্ধ প্রতিষ্ঠ রথীগণ যে সমস্যা লইয়া জর্জ্জরিত হইয়াছেন তাহা

তত্ত্বের সমস্যা, জ্ঞান বিশ্বাসের সমস্যা, মূলীভূত প্রত্যয়রাজির সমস্যা ও মানবজীবনের অন্তিম মূল্যের সমস্যা বলিয়াই আমরা জানি। মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিমূলে যে সকল তত্ত্ব ও প্রত্যয়রাজি নিহিত থাকে, তাহার ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব, সৌন্দর্য্য বোধ, ধর্মবোধ বা নীতি জীবনে যে মৌলিক প্রত্যয় রাজি লক্ষিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে সন্ধান হইয়া বিচার বিশ্লেষণের নামই যদি দর্শন হয় তবে দর্শনালোচনা দূরকল্পনেয় (speculative) বা আধিবিদ্যক হইতে পারে। ডাঃ মূরের নিজস্ব সমস্যাটি কিন্তু এই অর্থে দার্শনিক সমস্যা হইতে পারে না। মূরকে কেহই দূরকাল্পনিক দার্শনিক বলিবেন না। মানবের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবলীর এক সুসমঞ্জস, অন্বয় প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা আমরা তাঁহার দর্শনে পাই না। অবশ্য ডাঃ মূর কোন অতিকল্পনা করিতে চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে বিচার মূলক দার্শনিক (critical philosopher) বলাও বোধ ঠিক নহে। কারণ সাধারণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের মূলীভূত প্রত্যয় রাজির বিচার মূলক আলোচনার সহিত দূরকাল্পনিক দর্শনের ভেদ অতি সঙ্কীর্ণ। "দর্শনের কতিপয় প্রধান সমস্যা" (Some Main Problems of Philosophy) নামক গ্রন্থে ডাঃ মূর এইরূপ কতকগুলি মূল প্রত্যয়ের বিচারমুখী আলোচনা করিয়াছেন বটে। বহির্জগতের অস্তিত্ব, সামান্য ধারণার স্বরূপ, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক প্রভৃতি বিচার মূলক সমস্যা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ মূর পরে এই পুস্তকের কিছুমত যুক্তিসহ মনে করিলেও, অনেক কথাই অপরিষ্কার, হতবুদ্ধি প্রণোদক বলিয়া প্রত্যাহার করিয়াছেন। উত্তরোত্তর মার্জিত ও সংস্কৃত বিশ্লেষণ মুখে তাঁহার পূর্ব পূর্ব মতবাদ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ডাঃ মূরের আলোচনাগুলি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যর্থ মনোরথ করিয়া ছাড়ে।

(৩)

ডাঃ মূরকে সাধারণ বুদ্ধির (common sense) বস্তুবাদী দার্শনিক বলা হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাহা মূরের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হয়। মূর বিশেষ করিয়া ব্রাডলির ভাববাদী দর্শনের ঘোরতর বিরোধী। ব্রাডলি দেশ, কালকে স্ববিরোধী অবভাস বলিয়াছেন ; কাজে কাজেই কোন ভৌতিক পদার্থ ই তাঁহার নিকট পরমসৎ নহে। মূরের সুস্থ ও সনাজাগ্রত জগদ্‌বুদ্ধি উক্ত ভাববাদী দর্শনকে একেবারে অলীক না বলিলেও, অসাধারণ ও অদ্‌ভূত বলিয়া থাকে। মূর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সাধারণ বুদ্ধির পক্ষ সমর্থন" (A Defence of Common Sense) প্রবন্ধে উপরিউক্ত

সমস্যার সহিত সম্পৃক্ত এক নূতন প্রকার দার্শনিক সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্যা হইতেছে "সাধারণ বুদ্ধির" মূল বা মৌলিক সত্যগুলির বিশ্লেষণের সমস্যা। মূর এই প্রবন্ধে সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির মূলে নিহিত কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে ইহারা কোন যুক্তিতেই সংশয়াচ্ছন্ন হইতে পারে না। সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির কোন পরিবর্তন বা পরিশোধন হয় না এমন হয়তো বলা যাইবে না। ভূকেন্দ্রবাদ হইতে সাধারণ বুদ্ধির সৌরকেন্দ্রবাদে উত্তরণ হইয়াছে। কিন্তু সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির ভিত্তিমূলে কতকগুলি ধ্রুব সত্য নিহিত থাকে যাহা দার্শনিক-অদার্শনিক, প্রাচীন-নবীন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সত্যগুলির উদাহরণ যথা :—"আমি কিছুকাল ধরিয়া এই পৃথিবীতে আছি", "আমার দেহ আছে", "আমা হইতে ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি আছে", "অপর ব্যক্তিরাও কিছুকাল ধরিয়া পৃথিবীতে আছে আর তাহাদেরও দেহ আছে", "ইহা আমার দক্ষিণ হস্ত", "ইহা একটি মস্তাধার" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বাক্যগুলি ধ্রুব, অক্ষয় সত্যজ্ঞান বোধক—কম বেশী দৃঢ় বিশ্বাস মাত্র নহে। আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সকল দার্শনিক ইহাদের প্রতি সংশয় উৎপন্ন করেন তাঁহাদের বক্তব্য পড়িলে বুঝা যায় যে তাঁহারা ঐ সকল সত্য স্বীকার করিয়াই নিজ বক্তব্য উপস্থিত করিতেছেন। এই কারণে ডাঃ মূরের মতে উক্ত দার্শনিকগণের সংশয় স্ববিরোধী হইয়া থাকে। তাই কেন যে দার্শনিকগণ সাধারণ বুদ্ধির এই মূলগত সত্যগুলির বিরোধী বাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহা মূর ভাবিয়া পান না। উপরিউক্ত বাক্যগুলির অর্থবোধে কোন অসুবিধা নাই। যে কেহ ভাষা ও তাহার সঙ্কেত বুঝে সেই ঐ সকল বাক্যের অর্থ পরিষ্কার, পরিপূর্ণ ভাবে, নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অর্থ গ্রহণ ও সত্য স্বীকারের সার্বজনীনতা, সর্ববেদ্যতা ও নিত্যতা বর্তমান। এগুলি শুধু সত্যই নহে এগুলি আমরা সত্য বলিয়া জানি ও মানি। ইহারা ডাঃ মূরের দুর্ভেদ্য অচলায়তন। এই সকল বাক্যের অর্থবোধ, সংশয় বা সত্য প্রতিষ্ঠা মূরের মতে দার্শনিক সমস্যা নহে। দার্শনিক সমস্যা হইতেছে এই সকল বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ। অর্থ বোঝা এক ব্যাপার আর ঐ অর্থকে বিশ্লেষিতরূপে বলা আর এক ব্যাপার। কোন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিতে আমাদের ভুল না হইলেও, ঐ ভাষা কি নিয়মে বা কি নিরিখে ব্যবহার হয় তাহা হয়তো আমরা বলিতে পারিব না। কোন ভাষা প্রতীককে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিতে পারা আর উহার ঠিক ঠিক অর্থ বোধ হওয়া একই কথা। কিন্তু ঐ ব্যবহার কি নিয়মে শাসিত তাহা বিশদ করিয়া বলাই হইতেছে অর্থ বিশ্লেষণ,

আর উহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কোন শব্দ প্রতীক ব্যবহার করা আর ঐ ব্যবহারের নিয়ম স্পষ্ট করা একত্রে সম্ভব নাও হইতে পারে।

শব্দার্থ বা বা বাক্যার্থের বিশ্লেষণ এক জিনিষ, বস্তু, বা ঘটনার বিশ্লেষণ অন্য জিনিষ। প্রথমটি দার্শনিকের সমস্যা, দ্বিতীয়টি বৈজ্ঞানিকের। বিশ্লেষণ কথাটি কোন জটিল বিষয়কে মৌলিক বা সরল উপাদানগুলিতে বিশ্লিষ্ট করা বুঝায়; এই দিক হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রভেদ নাই; প্রভেদ বিশ্লেষণের বিষয়ের মধ্যে। এখন 'ইহা একটি মন্তাধার' এই বাক্যের অর্থবোধে কোন জটিলতা নাই; ইহা সকলেরই অত্যন্ত সহজে হয়। তবে "এই মন্তাধার" রূপ ধারণাটি কি জটিল? ডাঃ মূরের মত হইল যে কোন ভৌতিক পদার্থের ধারণাটি, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণ বিশেষের ধারণার মত সরল বা মৌলিক নহে। ঐ ধারণা জটিল আর উহার মৌলিক উপাদান হইতেছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sensa)। মূরের এই মত আমাদিগকে স্কচ্ প্রত্যক্ষবাদী ডেভিড হিউমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর হিউম বর্ণিত সাক্ষাৎ সংবেদ্য (impressions) ও স্মৃত্যাত্মক ধারণার (idea) অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কথা মনে জাগরিত করে। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত গুলিই সাক্ষাৎ সংবিতের বিষয়, ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন একই ব্যক্তির নিকট ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন, নিঃসংশয়ে খানিকটা ব্যক্তিগত; কিন্তু সর্বলোকপ্রত্যক্ষ গম্য ভৌতিক পদার্থ নহে। ঘটমান সংবিতের বিষয়, আর সম্ভাব্য সংবিতের বিষয় বা সংবেদ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত ধারার ন্যায় অন্তিম উপাদান এবং মন্তাধারের ন্যায় সর্ব প্রত্যক্ষগম্য ভৌতিক বাহ্য পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা লইয়া মূর অনেক গবেষণা করিয়াছেন আর এইরূপ অর্থ বিশ্লেষণরূপ সমস্যাকেই দার্শনিক সমস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য ভৌতিক বস্তুর উপাদান কি ভাবে হইতে পারে, ঐ বস্তুর উপরিভাগের সহিত সংবেদ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধই বা কি ইত্যাদি বহুতর সমস্যা দার্শনিকের হইতে পারে। অর্থ বিশ্লেষণের এই সমস্যার কোন সর্ববাদীসম্মত সমাধান করিতে ডাঃ মূর তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; কারণ তিনি নিজে সন্তোষজনক বিশ্লেষণের যে ত্রিনিরিক্ষ মান সৃষ্টি করিয়াছেন সেই নিরিখে অর্থ বিশ্লেষণ এক দুঃসাধ্য ব্রত বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য যে হেতু ঐ দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যাইতেছে না সেই হেতু সর্বসাধারণের জগদবুদ্ধির সত্যতা অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি আছে বলিয়া ডাঃ মূর মনে করেন না। অর্থ বিশ্লেষণ সন্তোষ জনক না হওয়া আর সর্বলোকগম্য ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাহ্যবস্তু

নির্দেশী বাক্যের তাৎপর্য্যবোধ এক কথা, আর ঐ তাৎপর্য্যবিশ্লেষণ আর এক কথা। কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা সর্বসাধারণের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ সত্যগুলি অস্বীকার করা যায় না।

সংক্ষেপে ইহাই মূরের "সাধারণবুদ্ধির পক্ষ সমর্থন" (A Defence of Common Sense)। আমি ডাঃ মূরের common sense-কে 'সাধারণ বুদ্ধি' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি, 'কাণ্ডজ্ঞান' বলিয়া নহে। ইহার কারণ এই যে—কাণ্ডজ্ঞান কথাটির মধ্যে আমি ব্যবহারিক জ্ঞানের সংকেত পাই। জাগতিক বস্তুনিচয়ের যে রূপ স্বাভাবিক, সন্তোষজনক জ্ঞান থাকিলে মানুষ তাহার দৈনন্দিন ব্যবহার জীবনে পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করিতে পারে তাহাকেই কাণ্ডজ্ঞান বা সুস্থ ব্যবহারিক বোধ বলে (practical good sense) ; ইহা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান বা থিয়োরী নহে। ডাঃ মূরের common sense কিন্তু কতকগুলি বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ; তাই উহাকে সাধারণবুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞান বলাই ভাল। সমগ্র বিশ্বসংসারে কি কি বস্তু সুনিশ্চিতরূপে আছে তাহার সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি কিছু নির্দিষ্ট মত গঠন করে। ডাঃ মূর এই সকল বস্তুর এক তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন—জড়-পদার্থ, মানুষ ও প্রাণীদেহ, লক্ষ লক্ষ উদ্‌ভিদ্, পাথর, জলবিন্দু, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি, মানসিক অবস্থাসমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই তালিকাই সাধারণ বুদ্ধির দর্শন বা common sense philosophy নহে। যখন আমরা দাবী করি যে এই বস্তু-গুলিই জগতে আছে এবং এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই তখন সমগ্র বিশ্বসংসার সম্বন্ধে এক মত প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহাকেই সাধারণবুদ্ধির দর্শন বলা যায়। মূর তাঁহার "দর্শনের কতিপয় প্রধান সমস্যা" নামক পুস্তকে ব্রাড্‌লির মতই মনে করেন যে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে একটি মতবাদই দর্শন। কিন্তু তিনি সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী দর্শন স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মূর বাক্যার্থ বা শব্দার্থের বিশ্লেষণরূপ যে দার্শনিক সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সমাধানে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি ভিড় করিয়া আইসে, তাহারা কি সাধারণ বুদ্ধিজাত, সর্বলোকস্বীকৃত তথ্য? ভৌতিক পদার্থ নির্দেশী বাক্যের বিশ্লেষণে যদি আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তরূপ উপাদান মানিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে কি আমাদের বিশ্লেষণ সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী হইবে না? সাধারণ লোক কি ইন্দ্রিয়োপাত্তরূপ অদৃষ্টপূর্ব উপাদান তার জগদবুদ্ধির অন্তর্গত বলিয়া ভাবে? সাধারণ জ্ঞানের দিক হইতে আমার সম্মুখস্থ টেবিলের উপরি-ভাগে যে সকল বস্তু আছে তাহাদের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করার সময়, অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তকেও ঐ তালিকাভুক্ত করিব কি? ইন্দ্রিয়োপাত্ত তো সাধারণের

সম্পত্তি নহে, উহা দার্শনিকের সৃষ্টি। যে হেতু ডাঃ মুরের বিশ্লেষণও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী না হউক, অন্ততঃ ঐ বুদ্ধিতে অজ্ঞাত উপাদান স্বীকার করে, সেই হেতু মুরকে সাধারণ বুদ্ধির দার্শনিকও বলা যায় না। পরন্তু মুর যদি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করিতে পারেন তবে ব্রাড্‌লিই বা সাধারণ বুদ্ধির পদার্থ সমূহকে অবভাস বলিয়া, অন্য এক প্রকার আত্মিক পরমসংবস্তু স্বীকার করিয়া কি দোষ করিয়াছেন? ব্রাড্‌লি সাধারণ সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন কি? কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বর্জিত মানুষ তাহার সীমিত ব্যবহার জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। ব্যবহার ক্ষেত্রে তাই কাণ্ডজ্ঞান অবশ্যই ঠিক। কিন্তু তাহাই যে তাত্ত্বিক পরমার্থ সত্য ইহা দার্শনিক স্বীকার করিতে পারেন কি? পরন্তু মুর তাঁহার নিজস্ব বিশ্লেষণের দার্শনিক সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায়, মুরের নিকট দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যায় না। ডাঃ মুরের বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্বসাধারণের জগদ্ বুদ্ধির মূলবাক্য গুলিকে সত্য বলিয়া পুনঃপুনঃ সর্বশক্তি দিয়া কীর্তন করিয়াছেন মাত্র।

ডাঃ মুর নৈতিক বোধের মূলপ্রত্যয় 'কল্যাণ' বা 'ভালপনা' বিশ্লেষণ করিয়া যে পরানৈতিক দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। Goodness বা কল্যাণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মতে বিশ্লেষণের অযোগ্য মৌলিক প্রত্যয়; সুখ, সাফল্য, পূর্ণতা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় প্রত্যয়ের মাধ্যমে ইহার সংজ্ঞা করিলে প্রকৃতিবাদোদ্ভূত দোষ (naturalistic fallacy) হয়। 'কল্যাণের' যে কোন সংজ্ঞাই দুষ্ট। ইহা 'নীল' 'পীত' প্রভৃতি প্রত্যয়ের মত মৌলিক—ইহার লক্ষণ বাক্য হয় না। তথাপি 'নীল' 'পীত' প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত সাদৃশ্য বিধায় ডাঃ মুর ঐ 'ভালপনাকে' এক অলৌকিক ধর্ম (non-natural property) বলিয়াছেন কারণ নীলপীতাদির মত 'ভালপনা' প্রত্যক্ষ গম্য নহে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি কি কখনও 'ভালপনাকে' কোন বস্তু বা ঘটনার অলৌকিক ধর্ম বলিয়া মানিবে? মুরের এই মতও তাই সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী।

(৪)

বিশুদ্ধ ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত তবে দর্শনের স্থান থাকিত না। মানুষ কখনও কখনও এক চিত্তচমৎকারী, আশ্চর্য্য এমন কি অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিশ্ব সংসারের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করে আর কোন সার্বিক প্রত্যয়মুখে জগদ ব্যাপারকে অনুধাবন করে। সে তখন কাণ্ডজ্ঞানের ব্যবহারিক স্তর অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে উপনীত হয়।

তাহার সেই ভিন্নস্তরীয় অনুভূতির আলোকে কাণ্ডজ্ঞানের জগৎ একটা বিলীয়মান ছায়ারূপেও প্রতিভাত হইতে পারে। লাইব্‌নিজ্‌ অবিভাজ্য আত্মিক পরমাণুর (মনাদ) আলোকে জগৎকে দেখিয়াছেন; এই দৃষ্টিতে দেশ ও জড়পদার্থ সমূল অবভাস রূপে দেখা দিয়াছে। স্পিনোজার দর্শন তেমনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক আর ব্রহ্মের আলোকে জগৎ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। স্যামুয়েল আলেক্‌জাণ্ডারের সার্বিক প্রত্যয়টি "দেশ-কাল"; এমনই বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী আছে; আর ঐ দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে তাঁহারা কাণ্ড জ্ঞানের জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন সাজ পরাইয়াছেন। ডাঃ মূরও তাঁহার দার্শনিক সমস্যা সমাধানে ওইরূপ ভিন্নস্তরীয় বা নবস্তরীয় বিশ্লেষণই করিয়াছেন। ভৌতিক পদার্থকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ধারার পর্য্যবসান করা ভিন্নস্তরীয় বিশ্লেষণ, সমস্তরীয় নহে। ইহার কারণ এই যে সর্বসাধারণের জগদবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান নাই বলিয়াই আমরা দেখিয়াছি। ডাঃ মূরও তাহা হইলে এমন ভিন্নস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার ভিন্নস্তরীয় দৃষ্টির আলোকে সাধারণ বুদ্ধির জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—যদিও ঐ জগৎকে তিনি স্বীকার করিবেনই। তাই তিনি লব্ধকীর্তি দার্শনিকগণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াও, বিশেষ সংস্কার বশতঃ, দার্শনিক হইতে পারেন নাই।

প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের একটি কেন্দ্রস্থল আছে যাহা যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে অনেকে ভারতীয় দর্শনকে দ্বিধাগ্রস্ত, স্থাণু, অনগ্রসর বলিয়াছেন। কিন্তু যে কোন ভারতীয় দর্শনের শাখা প্রশাখা, যুক্তি বিচারের বিস্তার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, যদিও মূল মর্মস্থলটি অনাহত থাকে। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যাহার আলোকে সমগ্র বিশ্বসংসারকে বুঝিতে হয়। বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন বিলাসী, বৈদান্তিকের দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ বর্ণিত কূটস্থ চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ, নৈয়ায়িক বস্তুস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বহু পদার্থবাদী। ভারতীয় পরিবেশে যুগ যুগ ধরিয়া এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরের সহিত যুঝিয়াছে, কিন্তু নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে নাই। তাই মর্মস্থল অনাহত থাকিয়াও সপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির বিরাট বিস্তার হইয়াছে। দর্শন যদি এবম্প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর স্থাপন হয়, তবে ডাঃ মূরের দর্শন নাই। তাঁহার দর্শনালোচনায় কোন অব্যাহত ধ্বনি নাই; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ যাহা বলিয়াছেন কাল তাহা

হতবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে এরূপ এক অব্যাহত, নবস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সমগ্র জগত সংসারকে বুঝিয়া লাভ কি? এইরূপ দর্শনের ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু মানুষ চিন্তাশীল বলিয়াই সে উহা করিবে—ইহা রোধ করা যাইবে না। বিংশশতাব্দীর ইউরোপে ডাঃ মূরের উত্তর সাধকগণের হাতে আদিবিস্তৃক দর্শন প্রচুর মার খাইয়া আবার স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দর্শনের শত্রুগণ তাঁহাদের নখদন্ত সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতন স্তরে উন্নীত না হইলে দর্শন হয় না! ইহার ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা অর্থহীন নহে। ইহাকে একপ্রকার তাত্ত্বিক পরীক্ষা, এমনকি "জ্ঞান-জ্ঞান" খেলা বলিতেও আমার আপত্তি নাই। দৈহিক সুস্থতার জন্য যেমন ভ্রমণাদি প্রয়োজন, তেমনি চিন্তার সংবৃদ্ধির জন্য ঐরূপ তাত্ত্বিক পরীক্ষাও প্রয়োজন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে জগৎ ব্যাপারকে অনুধাবন করিতে গিয়া সময় সময় অনেক আশ্চর্য্য তথ্যাদি বুদ্ধিগোচর হয়, আর ইহার একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

অবশ্য ডাঃ মূরের তীক্ষ্ণ বিচার প্রবণতা, তাঁর স্থির বুদ্ধির অনমনীয় দার্ঢ্য, নিজ ভ্রম স্বীকার করার মত তাত্ত্বিক নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ নিঃসংশয়ে প্রশংসার্হ। এই সকল গুণাবলীর মূল্য কম করিয়া দেখান আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। একরোখা মতবাদ আশ্রয় করিবার দৃঢ়তা অনেক সময় অনর্থ সৃষ্টি করে। কিন্তু মূরের নিকট আমরা দর্শন পিপাসার শান্তিবারি পাই নাই। ভৌতিক পদার্থ কেন নাই ইহার বহুযুক্তি ভাববাদী দার্শনিক দিয়া থাকেন। কিন্তু "ইহা আমার এক হস্ত আর ইহা আমার অপর হস্ত, কাজে কাজেই দুইটি বহির্বস্তু আছে" এই বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও ইহাতে জ্ঞান নিরপেক্ষ বহির্বস্তু "প্রমাণ" হয় কিনা ভাবিতে হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ কিন্তু আমার হাতটি বহির্বস্তু কিনা এই ভাবে সংশয় উৎপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু মূর উহা যে বহির্বস্তু এইরূপ পূর্ব স্বীকার লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে হাতটি যে বহির্বস্তু তাহা প্রমাণ করার কোন যুক্তি নাই। মূরের দর্শন তাই অতি সারল্যের দর্শন। এই কারণে সমসাময়িক বিশ্লেষণমুখী দার্শনিকদের উপর মূরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য রহিয়া গিয়াছে। যদি আমরা ঐ দার্শনিকগণকে সত্যকারের দার্শনিক না বলি তবেই এই প্রভাবের ব্যাখ্যা হয়। দর্শন যে কি বস্তু তাহা আজও ঠিক হইল না। তবে আমি যে অর্থে দর্শনকে বুঝিয়াছি সেই অর্থে সমসাময়িক বিশ্লেষণ দর্শন নহে। এই বিশ্লেষকগণ অমুক দার্শনিকের এই দোষ, তমুক

দার্শনিকের ওই দোষ দেখাইয়া "দর্শন" নামক রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। রোগী যখন আরোগ্যলাভ করিবে (অথবা মরিবে) তখন চিকিৎসকের আর কিছু করিবার থাকিবে না। যখন দাবানলে বনস্থলী উজাড় হইয়া যায় তখন এখানে ওখানে জলসিঞ্চন করিয়া সর্বনাশ রোধ হয় না। তাঃ মূরের উত্তরাধিকার লইয়া বর্তমান দার্শনিকগণ এখানে ওখানে বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছেন—জীবন ও জগতের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, এমনকি অতিতুচ্ছ সমস্যা লইয়া তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন—আর সাধারণের দুর্বোধ্য ভাষাতে দর্শন আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ সাজিয়াছেন। আর কতদিন এইরূপ চেষ্টা টিকিয়া থাকিবে কে জানে!

ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসতীমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি, আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তবুও যদি কেহ বলে যা দেখেছি বা যা শুনেছি তা সত্য নাও হতে পারে তবে একটু অবাক হতে হয় বৈকি। যদি প্রশ্ন হয় কী দেখেছি? সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক উত্তর হবে কেন? অদূরবর্ত্তী টেবিলটিই দেখেছি—যার রঙ বাদামী, আকৃতি গোল। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে সত্যই কি টেবিল দেখেছি? টেবিল নামধারী জড়বস্তুটির চরিত্র প্রকৃত পক্ষে কী যা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে এখানে এখন উপস্থিত? বাদামী রঙের টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয় এই সাধারণ ও সহজ উত্তরে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের তো মধ্যে মাঝে ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম ত ঘটে থাকে; সাধারণ ভাবে বলা যায় যে ভ্রম প্রমাদের বাস্তব কারণ বর্ত্তমান। কিন্তু কারণের কথা হচ্ছে না। সব কিছুরই কারণ আছে। ভ্রম প্রত্যক্ষকালীন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপস্থিত সর্পকে একেবারে অস্বীকার করি কী করে? তাছাড়া নিরালম্বন প্রত্যক্ষেত (hallucination) কোন বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে যে প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয় উপস্থিত জড়বস্তুটী নাও হতে পারে তাহাকে ত একেবারে অযৌক্তিক বলা যায়না। ভ্রম বা নিরালম্বন প্রত্যক্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। গোলাকার তাম্রখণ্ডটীকে ত' ভিন্নদৃষ্টিকোণ থেকে ডিম্বাকৃতি দেখায়। তাহলে বস্তুটির প্রকৃত আকার কী? যিনি ডিম্বাকৃতি দেখেছেন তিনি যেমন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন; আর যিনি গোলাকৃতি দেখছেন তিনিও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন। কার প্রত্যক্ষ সত্য? উভয়ই কি সত্য? কিন্তু একই বস্তু কি একই সঙ্গে গোলাকার ও ডিম্বাকার হবে? তারপর যে বাদামী রঙের টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ করছি, আলোক ব্যবস্থা একটু ভিন্ন প্রকারের হলেই ত' আর পূর্বেকার বাদামী রঙ থাকবে না। বর্ণান্ধ ফুলটিকে লাল না দেখে ধূসর দেখছে; জলমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডটীকে ভগ্ন দেখায়। তাই এ সন্দেহ

স্বাভাবিক যে প্রত্যক্ষের বিষয় বলে যাকে মনে করি তা জড়বস্তু নাও হতে পারে। একই টেবিল কি একই সঙ্গে বৃত্তাকার ও ডিম্বাকার হয়? একই ফুল কি একই সঙ্গে লাল ও ধূসর হয়? তবে বস্তুর প্রকৃত রূপ যাই হ'ক্ না কেন প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে যে কোন কিছু বর্ত্তমান এবং সেই কোন কিছু যে বহির্বস্তুর নির্দ্দেশ করে তাতে যেন কোন সন্দেহই নেই। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে যা উপস্থিত এবং যার উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না এমন যে প্রত্যক্ষের বিষয় তাকেই বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sense-data). জড়বস্তু আমার নয়ন গোচর কিনা জানিনা; কিন্তু কিছুটা রঙের বিস্তার ও একটা বিশেষ অবয়ব যে আমার নয়ন সম্মুখে উপস্থিত তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার ইচ্ছায় এর উপস্থিতি ঘটে নি বা আমার ইচ্ছায় এ অন্তর্হিত হবে না। একমাত্র আমিই এ প্রত্যক্ষ করছি না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অন্ত পাঁচজনেরও প্রত্যক্ষের বিষয়। ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। প্রত্যক্ষের বস্তুজগৎকে তাই যেন বর্জনও করা যায় না আবার সম্পূর্ণ গ্রহণও করা যায় না। এই রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েই পাশ্চাত্যের কোন কোন বস্তুবাদী দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তারা মনে করেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত মানস সৃষ্ট কিছু নয়; বহির্বিশ্বের জড়বস্তুর নির্দ্দেশক। প্রত্যক্ষে জড়বস্তুকে পাই না, পাই এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। বহির্বস্তুর জ্ঞান যদিও বা হয় তা অনুমানলব্ধ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাহায্যে প্রত্যক্ষ গোচর জড়বস্তুর জগতকে কতটা সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই বিচার্য্য।

একই বস্তু একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট কিম্বা বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির নিকট যখন বিভিন্ন দেখায় তখন বলতেই হয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমরা জড়বস্তুকে পাইনা; পাই বস্তু হতে ভিন্ন কিছু যাকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত। এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে জড়বস্তুকে অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে পাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত আর বস্তুকে পাই (যদি নিতান্তই পাই বলা যায়) পরোক্ষভাবে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই প্রত্যক্ষের বিষয় মনে করি—ততক্ষণ ভুলের সম্ভাবনা নাই। ভুল হয় যখন নিজের অজ্ঞাতেই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ছাড়িয়ে বস্তুকেই প্রত্যক্ষের বিষয় মনে করি। প্রত্যক্ষ মূলতঃই আপেক্ষিক। দ্রষ্টার দৃষ্টিকোণ, তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, বস্তু হতে দূরত্ব ইত্যাদি নানা অবস্থার উপর দৃষ্ট বস্তুর রূপ, অবয়ব প্রভৃতি নির্ভর করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র একান্তভাবেই প্রত্যক্ষকারীর উপর নির্ভরশীল। সবুজ

পর্ব্বতমালাকে দূর হ'তে নীল দেখায়। সমান্তরাল দুটী রেখাকে দূরে মিশে যেতে দেখা যায়। লাল ফুলকে কেহবা ধূসর দেখে। বিশেষ অবস্থায় কেউ বা একটি মোমবাতিকে দুটি দেখে। তাছাড়া মনঃসংযোগের তারতম্যের উপরও বস্তুরূপ নির্ভর করে, তাই অনেকে বলে থাকেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত নিতান্তই ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়া—এবং এই ইন্দ্রিয়োপাত্তই প্রত্যক্ষের বিষয়। জড়বস্তু নহে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ছাড়া বস্তু সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা প্রত্যক্ষে পাইনা; জড়বস্তু. এরা বলে থাকেন, সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষের অতীত। আর জড়বস্তুর প্রকৃত চরিত্রই বা কী! বস্তুর সন্ধানে ব্যর্থ হ'য়ে তাই কোন কোন দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টিকেই জড়বস্তু আখ্যা দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্ত-পরিবারই জড়বস্তু (family of sense-data). তাই সাধারণ বুদ্ধির বাদামীরঙের টেবিল বা লাল ফুলটীকে আর বাইরের জগতের স্বাধীন বস্তু বলা যায় না। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ সকল ইন্দ্রিয়োপাত্তই হয়ত প্রত্যক্ষকারীর ব্যক্তিগত মানসিক প্রতিক্রিয়া। জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায় যদি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রত্যক্ষের কথা বিবেচনা করা যায়। শুধু চোখে যে রক্তকে দেখায় লাল তাকেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখায় হলুদ। সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখাবে। সুতরাং কোথায় বস্তুর প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা? তারপর পদার্থবিদ্যা জড়বস্তুর যে চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাতে ত' বাদামী রঙের কঠিন টেবিলটীর আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত টেবিলটি দ্রুত সঞ্চরণশীল অনুপরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই প্রত্যক্ষে যা পাই তাকে জড়বস্তু কী করে বলা যায়? লক্ষ যোজন দূরের যে তারকাটী প্রত্যক্ষ করি বলে মনে হয় তার হয়ত এখন কোন অস্তিত্বই নেই; বহুপূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্তি হয়েছে। বস্তু হতে আলোর রশ্মি এসে চোখের পর্দায় আঘাত করতে সময় লাগে। তাই প্রত্যক্ষের ব্যাপারে সময়ের ব্যবধানকে স্বীকার করতে হয়। নক্ষত্রের বেলায় এই ব্যবধান স্পষ্ট; কিন্তু সকল প্রত্যক্ষেই এই ব্যবধান সামান্য হলেও বর্ত্তমান। তাই যাঁরা বলে থাকেন যে প্রত্যক্ষে বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে পাই না, পাই—শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্ত তাঁদের কথা যেন একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার কতগুলি পর্যায় ও স্তর আছে। এই বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। সামান্য গোলাপ ফুলটিও যখন দেখি তখনও গোলাপ থেকে আলোর রশ্মি এসে চোখের পর্দায় বিশেষ ধরণের উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং অপটিক্ নার্ভের মাধ্যমে বহু জটিলতা অতিক্রম করে চলে যায় মস্তিষ্কে যার ফলে

হয় গোলাপের প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষকারীর দেহাভ্যন্তরস্থ কোন স্তরে যদি কোন গোল-যোগ হয় তবে আর লাল ফুলটির প্রত্যক্ষ হবে না। তাই যাঁরা বলে থাকেন যে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত জগতে বাস করছি; বস্তুজগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের কখনই হয় না; তাঁদের যুক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে আমরা সবাই স্বরচিত বিশ্বেই বাস করি, বস্তুজগতের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই আমাদের হয়না তাই বা কি করে বলা যায়? প্রত্যক্ষে যা পাই তা'ত আমার কল্পনা প্রসূত নয়। আমি ত' ইচ্ছা করলেই যা খুসী প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সাধারণ বুদ্ধির জ্ঞান ক্রমশঃই যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। ভ্রম প্রত্যক্ষ, নিরালম্বন প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের আপেক্ষিকতা, জড়বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, প্রত্যক্ষে সময়ের ব্যবধান, প্রত্যক্ষকারীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করলে সাধারণ বুদ্ধির জড়বস্তুর জগত স্বীকার করা কঠিন হয়ে পরে। তাই সম-কালীন অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তারা বলেন, জড়বস্তু অপ্রত্যক্ষ; ইন্দ্রিয়োপাত্তই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু বস্তুটী কী? এবং এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কই বা কী? এই সকল প্রশ্ন বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাহায্যে প্রত্যক্ষের জগতকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা যে খুব সফল হয়েছে এমন বলা যায় না।

ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুর প্রায় পরস্পর বিরোধী কথা বলে থাকেন। প্রত্যক্ষকারীর মন ও জড়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্ত কিভাবে সম্পর্কিত বা এই দুই পদার্থের মধ্যে ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান কোথায়? অধ্যাপক মুর বলেন, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষক্রিয়া ও প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য করতে হবে। নীল ও নীল উপলব্ধি নিশ্চয়ই আলাদা। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ত' আমরা আর ইচ্ছামত সৃষ্টি করতে পারিনা। তাই মুর বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই অংশ বিশেষ। তা না হলে একই বস্তুকে একাধিকবার দেখি বা দেখতে পারি বলে মনে হয় কেন? মুর আরও বলেন যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষক্রিয়ার উপর নির্ভর না করেই অবস্থান করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুরই অংশ (কিম্বা বহিরঙ্গ) হয়—আর প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ হয় তবে একই বস্তুকে একই সঙ্গে গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতি দেখা যায় কেন? মুর বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু আসল আর কিছু "মনে হওয়া" গোছের। যেমন থালাটি আসলে গোলাকার কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় ডিম্বাকার কিন্তু এই "মনে হওয়া" ইন্দ্রিয়োপাত্তই বা আবার কী রকম? কোনটী প্রকৃত আর

কোনটাই বা "মনে হওয়া" কী করে ঠিক করতে হবে? তাছাড়া অবস্থা বিশেষে মানুষ এক বস্তু দুই দেখে, (seeing double)—তারই বা ব্যাখ্যা কী হবে? কাজেই ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই অংশবিশেষ বা বহিরঙ্গ একথা বলা যায় না। তাই মুর আবার বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুর অবভাস্ মাত্র এবং শেষপর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের যে সম্বন্ধ তা বিশ্লেষণের অতীত। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুর অবভাসই হয় বস্তুকে বলতে হয় প্রত্যক্ষের অতীত; তাহলে কী করে বলা যাবে যে বিভিন্ন অবভাস একই জড়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত? কাজেই মুরকে অনেকটা মিলের মত বলতে হয় যে জড়বস্তু হচ্ছে সম্ভাব্য সংবেদন সমূহের স্থায়ী উৎস, (permanent possibilities of sensations) ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বলতে হয় সম্ভাব্য ঘটনা (hypothetical fact) বলতে হয় বিশেষ অবস্থায় বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ধরণের ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রত্যক্ষ হবে। আর ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই বহিরঙ্গ। কিন্তু বস্তু হয়ে যায় রহস্যময় একটা কিছু যাকে স্বীকার করা কঠিন। আবার অস্বীকার করা আরও কঠিন। কারণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত একান্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের মানসিক ব্যাপার নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সর্ব্বজনগোচর। আমি যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষ করি, যে রঙের বিস্তার দেখি তুমিও তাই দেখ বলে উভয়েরই বিশ্বাস। দুজনেই ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান নির্দ্দেশ করতে পারি। কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়? আমি যে ফুলকে লাল দেখি বর্ণান্ধ দেখে ধূসর। তাছাড়া কোন ব্যক্তিকে বর্ণান্ধ বলার যুক্তিই বা কোথায়? সেও ত' বলতে পারে ধূসরকেই আমরা লাল দেখছি। আমি যে গাছটীকে দূর থেকে ছোট দেখি তুমি দেখ বড়। আর এইটাই ত' স্বাভাবিক। সামনে থেকেও যেমন দেখবে দূর থেকেও ঠিক তেমনই দেখবে এটাই বা কি কথা? বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় রঙ্ বা শব্দ সর্ব্বগত নয়, সর্ব্বগত হচ্ছে আলোর বা বায়ুর তরঙ্গ যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে এবং ফলে আমরা রঙ বা শব্দ প্রত্যক্ষ করি। তাই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলা যায় না। বস্তুর অংশও বলা কঠিন। আর ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি সম্ভাবনার জগতেই থাকে তাহলে তার চরিত্র বোঝা আরও কঠিন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও কিছুই বোঝা যায় না। তাই অধ্যাপক মুর বলেন জড়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। রাসেল কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তকে জড়বস্তুর অংশ বা ধর্ম্ম বলতে চাননি। তিনিও বলেন যে জড়বস্তুই ইন্দ্রিয়োপাত্তের একমাত্র কারণ নয়, প্রত্যক্ষকারীর শরীর ও মন তার অবস্থান ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকও ইন্দ্রিয়োপাত্তের জন্য দায়ী। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়োপাত্তের

সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় (knowledge by acquaintance). ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে জড়বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ এবং বর্ণনা-মূলক (by description)." সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইলেও জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমরা, রাসেল বলেন, কোনমতেই অবিশ্বাস করতে পারি না ; জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস যেন তর্কাতীত। কিন্তু জড়বস্তুর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জড়বস্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব ও সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টিই বস্তু। কিন্তু এই সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত কী পদার্থ ? ইন্দ্রিয় সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্ভবই বা কী ভাবে হয় ? ইন্দ্রিয়োপাত্ত অতিরিক্ত কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি কল্পনাই বা কী প্রকারে সম্ভব বোঝা কঠিন। আমার মনে হয় প্রত্যক্ষকারীকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কল্পনাই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে তাই ব্যক্তিগত ও বলা যায় না, আবার সর্বগত বলাও কঠিন। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বহির্বস্তুকে নির্দেশ করে বটে—কিন্তু ইহাকে বহির্বস্তুর অংশ বলা যায় না ; আবার ইহা সম্পূর্ণ আন্তরপদার্থ ও নয়। এক কথায় আমরা এক অসম্ভব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ছি।

সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে Price প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে জড়বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, জড়বস্তুর দুই মৌল পদার্থের সংমিশ্রণ (১) মূল জড়সত্তা, (physical occupant) (২) ইন্দ্রিয়োপাত্তের পরিবার (family of sense-data) একই পরিবার ভুক্ত হওয়ায় জড়বস্তুর অংশহিসেবে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি ব্যক্তিগত বা অলীক হ'ল না। পরিবার ভুক্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু বাস্তব আর কিছু সম্ভাব্য। অর্থাৎ কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েছে আর কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে ওঠেনি কিন্তু অনুকূল পরিবেশে বাস্তব হয়ে উঠবে। এই ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রগত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যার সাহায্যে জড়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা হয়। এই কেন্দ্রগত ইন্দ্রিয়োপাত্ত সমূহকে ঘিরে অগণিত বিকৃত ইন্দ্রিয়োপাত্তের ধারা। (infinite series of perverted sense-data) বৃত্তাকৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্তটী থালার কেন্দ্রগত এবং সর্বগত আর ডিম্বাকৃতি ও বৃত্তাকার ভিন্ন অন্যান্য আকারের ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি বিকৃত। অর্থাৎ থালাটি আসলে গোল তবে কখনও কখনও দেখায় ডিম্বাকার। এইরূপ রঙের বেলায়; মূল রঙের ইন্দ্রিয়োপাত্তটীকে ঘিরে বিকৃত রঙের মিছিল। ইন্দ্রিয়োপাত্তের পরিবার ছাড়াও জড়বস্তুর কূটস্থ জড়সত্তা Price স্বীকার করেছেন ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে। কিন্তু তার চরিত্র যে প্রকৃত কি তা তিনি নিজেই

নির্ধারণ করে উঠতে পারেননি। এই জড়সত্তার নিজস্বরূপ যে কি তা যেন কিছুতেই বোঝা যায় না। এ যেন অশরীরী রহস্যময় একটা কিছু যা অলক্ষ্যে থেকে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ঘটায়। অনেকটা যেন Locke'র অজ্ঞাত দ্রব্যের মত ব্যাপার। জড়বস্তুর বাস্তিনিরপেক্ষ সত্তাকে Priceও অস্বীকার করতে পারেন নি। জড়সত্তাকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি বলে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একই বস্তুর যে বিভিন্ন এমনকি পরস্পর বিরোধী ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকে তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন এই বলে যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি একই পরিবার ভুক্ত; এক পরিবারে বিভিন্ন এমন কি পরস্পর বিরোধী ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকার কোনও বাধা নেই। ইন্দ্রিয়োপাত্তের কিছু কেন্দ্রগত ও প্রকৃত; অন্যান্য সব বিকৃত। Price'র এই ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক বলে মনে করি না। সমস্যার সমাধান হলো বলে মনে হয় না। একই পরিবার ভুক্ত হোক আর নাই হোক প্রত্যক্ষকারী ও অন্যান্য পরিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কল্পনা অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়েই ইন্দ্রিয়োপাত্তের পক্ষে বস্তুতে অধিষ্ঠান হওয়া কী করে সম্ভব তা বোঝা কঠিন। তাছাড়া পরিবারের মধ্যে কিছু কেন্দ্রগত ও গুরুত্বপূর্ণ আর বাকি সব বিকৃত এই শ্রেণী ভাগ করার মাপকাঠিই বা কী? ইন্দ্রিয়োপাত্তের কিছু আসল আর কিছু বিকৃত বলার যুক্তিও কিছু খুঁজে পাওয়া যায়না। একমাত্র বলা যায় কোনও বস্তুকে বিশেষ ভাবে বিশেষ পরিবেশে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত এবং ব্যবহারিক দিক থেকে সুবিধাজনক এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না; ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র বিশ্লেষণের সুরাহা হয় না।

সমস্ত অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়—ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষকারীর মানসিক ব্যাপারও বটে আবার বস্তুগত ও বটে। স্বীকার করতে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত এমন কিছু যা বস্তুকে নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে কিন্তু সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তু থেকে আলাদা কিন্তু বস্তু প্রকাশক। ইন্দ্রিয়োপাত্ত জড়বস্তুর ন্যায় সর্ব্বগত নয়, কিছুটা যেন গোপনীয়। আমার ইন্দ্রিয়োপাত্ত অপরের ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের কার্য উৎপাদনের ক্ষমতা নেই যা জড়বস্তুর আছে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত জড়বস্তুর তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বিশেষ, সামান্য নয়। আমরা বিশেষ লাল রঙই প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়োপাত্ত দ্রব্য নয় তবে দ্রব্যকে অবলম্বন করাই এর স্বভাব। ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র তাই সব দিক থেকেই দুর্বোধ্য। এরা যেন কিছুটা ভৌতিক প্রকৃতির। কোন রহস্য লোক থেকে এরা আসে আর অবস্থার সামান্য তারতম্যেই কোথায় মিলিয়ে যায়। এরা বস্তুর কোন প্রকৃত অবস্থাই যেন নয়। কোন কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত আবার নিতান্তই বন্য প্রকৃতির। (wild sense-data)

[যেমন নিরালম্বন প্রত্যক্ষের বেলায়] বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে শুধু মানসিক ব্যাপার মাত্র বলা যায় না, জড়বস্তুকে সে অনিবার্য-ভাবেই নির্দেশ করে; আবার মস্তিষ্ককে বাদ দিয়েও ইন্দ্রিয়োপাত্তকে কল্পনা করা যায় না। ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র যেন ক্রমশঃই ঘোলাটে হয়ে আসছে। কোথা থেকে এরা আসে; কিছুক্ষণের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে; আবার কোথায় মিলিয়ে যায় কিছুই যেন বোঝা যায় না। অথচ 'কিছুনা' বলে এদের উড়িয়েও দেয়া যায় না। আছে বলে স্বীকারও করা যায় না। এযেন অনির্বচনীয়; সত্তাও নয় মিথ্যাও নয়।

ভাষাবিশ্লেষণকারী সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ জড়বস্তুও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্ককে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য অনেক দার্শনিক সমস্যার ন্যায় ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমস্যাও ভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেই সমাধান করা যাবে বলে এরা মনে করেন। এরা বলে থাকেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও জড়বস্তু আলাদা কিছু নয়, ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নয়। প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত না জড়বস্তু এই প্রশ্নই এদের মতে অবান্তর। তবে প্রত্যক্ষের বিষয়কে দুই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায় এবং করা হয়ে থাকে—জড়বস্তুর ভাষা আর ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষা। জড়বস্তুর ভাষা এদের মতে সহজেই ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষায় অনুবাদ করা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষায় জড়বস্তুর ভাষাকে নিঃশেষে অনুবাদ করলেই জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ যে খুব বোধগম্য হল মনে হয় না। এরাই আবার বলে থাকেন যে বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রেখে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বোঝাই যায় না এবং বস্তুহীন শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষা সৃষ্টি কেউ এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। প্রথমতঃ একই জড়বস্তুকে কেন্দ্র করে—[বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পারিপার্শ্বিকের কথা বিবেচনা করে] অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রকাশের জন্য অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতির প্রয়োজন। এ এক অসম্ভব পরিকল্পনা। তারপর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এই বিবৃতি সমষ্টি সম্ভব তবুও স্বীকার করতে হবে যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক ও জড়বস্তু সূচক বিবৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা যায় না। এমন হতেই পারে যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতিগুলি সত্য;কিন্তু জড়বস্তু সূচক বিবৃতি গুলি মিথ্যা। কারণ নিশ্চয় করে কখনও বলা যাবে না যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ভ্রমাত্মক বা অমূলপ্রত্যক্ষ জনিত কিনা। আবার জড়বস্তু সূচক বিবৃতিগুলি সত্য হয়ে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতগুলি মিথ্যা হতে পারে। 'ঘরেতে টেবিল আছে' হয়ত সত্য কিন্তু ঘরে ঢুকে টেবিল জাতীয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে।

হয়ত ঘরে যথেষ্ট আলো ছিলনা বা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি ছিল ইত্যাদি নানা কারণে টেবিল প্রত্যক্ষই হল না। উপযুক্ত পরিবেশে দেখলে ঠিকই দেখা যাবে বলা নিরর্থক ; (circularity) তাই জড়বস্তুর ভাষা ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষার মধ্যে সঙ্গতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের সমস্যা ভাষা বিশ্লেষণেই দূর হয়ে যাবে এটা সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। ভাষা বিশ্লেষণকারী দার্শনিকগণ নিজেরাই এই সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন ও ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

সমস্ত অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে যাঁরা প্রত্যক্ষের বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তারা হয়ত কোথাও মস্ত ভুল করেছেন; সমাধানের চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন অনেক বেশী। তাই আমার মনে হয়—ইন্দ্রিয়োপাত্তকে প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। জড়বস্তুই প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয়। প্রত্যক্ষে আমরা জড়বস্তুকেই পাই। টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়। কিছুটা রঙের বিস্তার ও বিশেষ অবয়ব মাত্র নয়! বিশেষ রঙ ও আবরণ বিশিষ্ট টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়। তবে প্রত্যক্ষের বিষয়কে প্রত্যক্ষকারী থেকে আলাদা করে দেখতে চাওয়াটাই নিরর্থক। প্রত্যক্ষ ও তার বিষয় মিলেই সমগ্র অবস্থা, এই সমগ্র অবস্থাটার কথা খেয়াল না রাখলেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমরা অনেক সময় মনে করি বিশ্বপ্রকৃতি থেকে জাতা মানুষ বুঝি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে প্রত্যক্ষকারী মানুষ এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বস্তুজগতকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছে, প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষের বিষয় প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই দুইয়ের যোগাযোগেই বস্তুর রূপ ও চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে। প্রত্যকারীকে বাদ দিয়ে বস্তুর কোন স্বতন্ত্র রূপ নেই। বস্তুর যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি সেটাই তার আসল রূপ কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর। প্রত্যক্ষের জগত বা জড়বস্তু অলীকও নয় অজ্ঞেয়ও নয়। বস্তুর যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করি সেটা বস্তুরই রূপ তবে সেটাই বস্তুর একমাত্র রূপ নয়। বস্তুর আসল বা চরম রূপ সন্ধান করা অর্থহীন প্রয়াসমাত্র। বস্তুর যেরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমি পরিচিত হয়ে থাকি তাকে বাদ দিয়ে বস্তুর চরম রূপ বলে কিছু নেই। বস্তুর অনন্ত রূপ। সেই অনন্তরূপের সম্যক প্রত্যক্ষ আমার কখনও হতে পারেনা। যখনই প্রত্যক্ষ হয় তখনই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর এক বিশেষ রূপের সঙ্গেই মাত্র আমি পরিচিত হই। ফুলটাকে যখন লাল দেখছি তখন লাল ফুলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়; সেই ফুলকেই যখন কেউ ধূসর দেখছে তখন ধূসর ফুলই তার প্রত্যক্ষের বিষয়। একই

বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখা যায় বলে মনে করার কারণ নেই যে জড় বস্তুর প্রত্যক্ষ আমার হয় না। শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্তই প্রত্যক্ষ হয়। সমগ্র বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু যা প্রত্যক্ষ হয় তা বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা ভুল। জড়বস্তুর বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। জলে ডুবিয়ে রাখলে কাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এটা ভুলও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। শুধু স্নায়ুমণ্ডলে বস্তুর যা রূপ জলমগ্ন অবস্থায় তার ভিন্নরূপ। কাঠিটি সোজাও বটে আবার বাঁকাও বটে। পরিবেশের কথা মনে রাখলে এর স্ববিরোধীতার কোনও লক্ষণ নেই। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তুর কল্পনা অলীক। যখনই আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি তখনই একটা বিশেষ পরিবেশে তাকে প্রত্যক্ষ করি। তবে সাধারণতঃ যে বিশেষ পরিবেশে কোনও বস্তুকে বিশেষরূপে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করে থাকি সেটাই তার আসল রূপ বলে মনে করে থাকি, এই পর্যন্ত। ব্যবহারিক দিক থেকে সেটাই তার সত্য রূপ বলে গণ্য করি। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে সেই বিশেষ রূপকেই বস্তুর একমাত্র সত্যরূপ বলে মনে করা ভুল। অর্থাৎ এটা বলা ঠিক হবে না যে থালাটি আসলে গোল কিন্তু কখনও কখনও দেখায় অন্য রকম। কিম্বা ফুলটি আসলে লাল—বর্ণান্ধ দেখে ধূসর বা নীল। পরিবেশের তারতম্যের কথা ভুলে যাই বলেই এই রকম বলে থাকি। মনে রাখতে হবে যে বস্তু পরিবেশ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়তই পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু বহির্বিশ্বই নয়—প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিকোণ, তার দেহমনের অবস্থা; তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র তার ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট ও আভ্যন্তরীণ অসংখ্য খুটিনাটি ব্যাপার, তার মানসিক প্রবণতা, তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার আগ্রহ কৌতূহল, তার মনঃসংযোগ সব কিছু নিয়ে এই পরিবেশ। এই বিরাট ও সুগভীর পরিবেশ-সমুদ্রে আমরা সকলে ডুবে আছি। এই অনন্ত পরিবেশে বস্তুর অনন্ত রূপ প্রত্যক্ষ হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের পরিবেশই অন্য সকলের পরিবেশের চাইতে ভিন্ন। আমি যে পরিবেশে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি অন্য কেহই ঠিক সেই পরিবেশে প্রত্যক্ষ করে না। তবে পার্থক্য খুব সামান্য বলে ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সবাই বলি বাদামী রঙের গোল টেবিলটিই সবাই দেখি। একই ফুলের একই গন্ধ সবাই পাই, কিন্তু ঠিক এক নয়। বিভিন্ন পরিবেশে বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হয়। বাদামী রঙের শক্ত কাঠের গোল টেবিলটির হয়ত এমন রূপ আছে যা এ যাবৎ আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। বহু সহস্র বৎসর পরে জীবজগতে এমন প্রাণীর উদ্ভব হতে পারে যা হয়ত আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয়ের অধিকারী যার

ফলে সেই বিশেষ প্রাণীর নিকট বস্তুর এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধরা পড়বে। তাই জন্য এটা বলা ঠিক হবে না যে বস্তুর সেটাই হল আসল রূপ ; আমরা আজকে যা প্রত্যক্ষ করছি সেটা প্রকৃত রূপ নয়। আজও বস্তুর প্রকৃত রূপই জানছি সেদিনও বস্তুর প্রকৃত রূপেরই প্রত্যক্ষ হবে। তবে পরিবর্তিত পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে এর ব্যাখ্যা করব। ভ্রমপ্রত্যক্ষের বেলাতেও এই পরিবেশের কথা মনে রেখেই এর ব্যাখ্যা করতে হবে। পরিবেশের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা প্রতিনিয়ত এই পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিরাট পরিবেশের অংশ হিসেবে মানুষ বস্তুজগতকে প্রত্যক্ষ করছে।

ভুল ভ্রান্তি মাঝে মাঝে হয় বটে, তার ব্যাখ্যাও এই পরিবেশ সংক্রান্তই। প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষের বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় ; বিচ্ছিন্ন ভাবলেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষ ও তার বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হয়েছে এবং অনেক দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন দর্শনে কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না। ভ্রম প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা প্রাচীনরা নানাভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে তারা সমস্যা জটিলতর করেন নি। দর্শনের কোন সমস্যাই তর্কাতীত নয়। তবুও আমার মনে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করে সমস্যা জটিলতর না করাই শ্রেয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা যেমন আমি স্বীকার করি না আবার সাধারণ বুদ্ধির জগতকেও আমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে অসমর্থ। প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয় জড়বস্তু কিন্তু এই জড়বস্তু অনন্ত পরিবেশে অনন্তরূপে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে। সাধারণ বুদ্ধি এতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হতে পারে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের সব কিছুই সত্যিই এক পরম বিস্ময়।

কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব

ডঃ শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

(এক)

দার্শনিকপ্রবর ইমানুয়েল কাণ্টের দর্শনের মূলসূত্রগুলি দর্শনানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিকট সুপরিচিত ; কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। এই প্রবন্ধে আমরা শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাণ্টীয় মতবাদ আলোচনা করিব।

কাণ্ট ছিলেন কোয়েনিগ্‌স্‌বের্গ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা দর্শনের কোন অধ্যাপক শিক্ষাতত্ত্ব (Pedagogy) সম্বন্ধে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দান করিবেন। এই নিয়ম অনুসারে কাণ্ট ১৭৭৬-৭৭ এবং ১৭৮৬-৮৭ সালের মধ্যে চারিটী অধিবেশনে (Semester) শিক্ষাবিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের সমক্ষে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কোন একটী বিশেষ পুস্তককে পাঠ্যপুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকরণ ছিল কাণ্টের অন্যতম শিক্ষা-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি প্রথমে Basedow এবং F. S. Bock-এর শিক্ষাসম্বন্ধে পুস্তক[১] লইয়া ছাত্রদের নিকট আলোচনা করিতেন।

দুঃখের বিষয় শিক্ষাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ কাণ্ট কোন পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন নাই। বক্তৃতাদানের পূর্ব্বে কাণ্ট তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছোট ছোট কাগজে লিখিয়া খসড়া প্রস্তুত করিতেন। এইগুলি লইয়া ১৮০৩ খৃঃ অব্দে থিওডর রিঙ্ক্‌ (Theodor Rink) কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের আখ্যা হইল *Immanuel Kant, Über Pädagogik*। রিঙ্ক্‌ ১৭৮৬ হইতে ১৭৮৯ পর্য্যন্ত কোয়েনিগ্‌স্‌বের্গ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাণ্টের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কয়েক বৎসর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের (Theology) অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ডানৎসিগে (Danzig) ধর্ম্মযাজকের

---

১ Basedow: *Methodenbuch.*

F. S. Bock: *Lehrbuch der Erziehungskunst.*

কার্গো নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, বিঙ্ক-সম্পাদিত শিক্ষাতত্ত্ব কাণ্ট কতদূর সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা নাই। তবে দেখা যায় যে, ১৮০১-০২ সালেও কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্বের উপর তাঁহার বক্তৃতার খসড়ার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন।[২]

অধ্যাপকের কর্তব্যসম্পাদনের জন্যই যে কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষক ও দার্শনিক হিসাবে তিনি স্বতঃই শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দার্শনিক যখন বাস্তবজীবনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন, তখন তিনি মানবের চারিত্রিক উন্নতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। কাণ্টের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।[৩] আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা নহে—ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে ছাত্রের মনে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দিতে হইবে এবং এই ভাবে তাহাকে প্রকৃত বিদ্বান্ করিয়া তুলিতে হইবে।[৪]

(দুই)

এখন শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাণ্টের বক্তৃতা আলোচনা করা যাউক্।

কাণ্ট তাঁহার বক্তৃতামালার প্রথমে মানুষের সহিত অন্যান্য জীবের তুলনা করিয়াছেন। মানুষই একমাত্র জীব যাহার শিক্ষার প্রয়োজন হয়। পশু নিজের সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ নিজের যুক্তি শক্তি দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে। মানুষ যখন জগতে আসে তখন তাহার কোন অভিজ্ঞতা থাকে না, এইজন্য সে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

শিক্ষার দুইটী দিক্ আছে—একটি নঙর্থক আর একটী সদর্থক। নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলা (Discipline) নঙর্থক—ইহার দ্বারা মানুষকে পশুর আচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। শিক্ষার সদর্থক দিক্ হইল উপদেশদান (Training)।

---

২ এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি Über Pädagogik-এর E. F. Buchner-কৃত ইংরাজী অনুবাদ *Kant's Lecture-notes on Pedagogy* হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৩ আধুনিক কালের একজন প্রখ্যাতনামা দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) মনে করেন যে, শিক্ষাই দর্শনের চরম আদর্শ এবং ইহার মাধ্যমেই দর্শন মানবজীবনের প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারে। তাঁহার ভাষায় "Education offers a vantage ground from which to penetrate to the human, as distinct from the technical, significance of philosophical discussion" (*Democracy and Education*, p. 383)।

৪ কাণ্টের ভাষায়, ".. .. a teacher is expected to make of his hearer first an *intelligent*, then a *reasonable*, and finally a *learned man*"

মোট কথা, নিষেধ ও বিধি এই দুই-এর সমন্বয়ই হইল প্রকৃত শিক্ষা। কান্ট শৃঙ্খলা-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, কারণ ইহার অভাবে মানুষ বন্য পশুর তুল্য হইয়া পড়ে। "কৃষ্টির অভাবে মানুষ অপক্ক-বুদ্ধি হইয়া থাকে—কিন্তু চেষ্টা করিলে পরিণতবয়সেও কৃষ্টি-শিক্ষা হইতে পারে; অপরপক্ষে যদি শৈশব হইতে শৃঙ্খলা-শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে যৌবনে মানুষ নিজেকে সংযত রাখিতে পারিবে না।"[৪] স্বাধীনতা সকল মানুষই স্বভাবতঃ চায়; কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বৈরাচারেরই প্রকার ভেদ মাত্র। স্বাধীনতার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে যুক্তির প্রয়োজন।

যেহেতু শিক্ষালাভের জন্য একজনকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেইজন্য শিক্ষকের নিজের শিক্ষা অর্থাৎ তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং কৃষ্টির ঔৎকর্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এইজন্যই শিক্ষাকার্য্যগ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাকার্য্যের জন্য এক বিশেষ প্রকারের দক্ষতা বা কৌশল আবশ্যক। কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এই কার্য্যে সম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নহে। মানুষের সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ শিক্ষণকার্য্যের এবং শিক্ষার আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছে। শিক্ষণকার্য্য সহজাত ক্ষমতা-বিশেষ নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সকল মানুষই আদর্শ শিক্ষক হইতে পারিত।

শিক্ষা মানুষের পক্ষে একটী কঠিন ও দুরূহ সমস্যা। মানুষ যেমন আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, সেইরূপ সে আজও আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। মানুষের মধ্যে কতকগুলি ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল এই সমস্ত সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগরিত করা এবং ন্যায়ের আলোকে পরিচালিত করা। এই কার্য্যের জন্য এক বিশেষ প্রকারের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

কান্ট শিক্ষার পাঁচটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন - প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা, মূল্য, প্রধান সূত্র এবং দক্ষতা।

---

৪ "Discipline or training changes animal nature into human nature . . . "

"Discipline prevents man from being turned aside by his animal impulses from his destiny, which is humanity..... Training, therefore, is merely negative; it is the action by which one rids man of his wildness; instruction, on the contrary, is the positive part of education.

"..... He who is not cultivated is raw; he who is not disciplined is wild. The omission of discipline is a greater evil than the neglect of culture; for the latter can be recovered in later years but wildness cannot be removed and a blunder in discipline cannot be retrieved." (*Lecture-Notes on Pedagogy*, S. 3, 4, 7).

কাণ্ট বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা আছে—ইহা একটী সামাজিক বিলাস নহে। ইহা একটী ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রয়োজন। ইতরজীবেরা সাধারণতঃ সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ এই বিষয়ে কতকটা অসহায়। ইতরজীবেরা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে পারে, কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে পারে না; মানুষের এই অভাব তাহাকে নিজেকেই পূরণ করিতে হইবে এবং নিজেকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এই কারণেই কাণ্ট বলিয়াছেন যে সম্ভাব্যতা শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষই একমাত্র জীব যে স্বীয় সুপ্ত ক্ষমতাকে পরিস্ফুট করিতে পারে। সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করিবার এই বাসনা কল্পনা মাত্র নহে; ইহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা সম্ভাব্যতার সীমার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার মূল্য আপেক্ষিক, কারণ ইহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ। কাণ্ট শিক্ষা বলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যান্ত্রিক সম্বন্ধ বুঝিতেন না। বিশ্বজনীনতা ও মানবিকতাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য; সুতরাং শিক্ষা বলিতে কাণ্ট মনে করিতেন সমগ্র মানবসমাজের সহিত ছাত্রদের নিবিড় সম্বন্ধের ক্রমবিবর্তন। অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবের নৈতিক জীবনের উদ্ভাবন। কাণ্টের পক্ষে শিক্ষাতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব সমানার্থক।

শিক্ষাতত্ত্বের এইজন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুধাবন করিয়া চলা উচিত। প্রকৃতির আদর্শেই শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানসিক ক্ষমতা ও নৈতিক উৎকর্ষের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। শৈশব হইতেই শিশুর সম্মুখে একটা বিশ্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া কাণ্ট মনে করিতেন যে, শিক্ষণকার্য্য একটা আর্ট বা কলা-বিশেষ। বিদ্যালয়ে শিক্ষণ কার্য্যের মাধ্যমেই শিক্ষার আদর্শের সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়*।

(তিন)

শিক্ষাতত্ত্বের বক্তৃতামালার প্রথমেই কাণ্ট শিশুর পরিচর্য্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; শৈশবের শিক্ষা স্বভাবতঃই দেহ-কেন্দ্রিক। সেইজন্য কাণ্ট প্রথমেই

* কাণ্ট শিক্ষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে প্রত্যয়গুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেগুলি হইল Notwendigkeit (Necessity), Möglichkeit (possibility), Wert (value), Principien (Principles), এবং Kunst (Art).

নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা (nursing) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কাণ্ট বলেন যে, নবজাত শিশুর পক্ষে মাতার স্তন্যদুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনুষ্যদুগ্ধ নিরামিষাশী যে কোন পশুর দুগ্ধ হইতে পৃথক—শেষোক্ত প্রকার দুগ্ধ শিশুর পরিপাক যন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কারণ ইহা সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায় এবং সেইজন্য ইহা পরিপাক করা কষ্টকর। মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগ করিবার পর শিশু যখন আহার করিতে শিখিবে, তখন তাহাকে অত্যধিক কটু, অম্ল এবং লবণাক্ত কোন খাদ্য বা কোন উত্তেজক পানীয় দেওয়া উচিত নহে। শিশুর দেহের রক্তের উত্তাপ পরিণত-বয়স্কদের সাধারণ দেহ-তাপ অপেক্ষা অধিক। এইজন্য শিশুকে অত্যন্ত গরম ঘরে বা গরম জলে স্নান করান উচিত নহে। শিশুর শরীরের পক্ষে সুশীতল বায়ু, সুশীতল জল এবং সুশীতল গৃহ উপকারী।

শিশুর শরীরের পক্ষে দোলনা উপযুক্ত নহে; কারণ ইহার দ্বারা শিশুর শরীরকে অকারণ ঝাঁকুনি দেওয়া হয়। পরিণতবয়স্ক লোকেরাও যদি অতিরিক্ত দুলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও মস্তক-ঘূর্ণন, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়; সুতরাং শিশুদের পক্ষে ইহা আরও ক্ষতিকর। এই প্রসঙ্গে কাণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ শিশুর ক্রন্দন থামাইবার জন্য তাহাকে দোলা দেওয়া হয়; কিন্তু শিশুর মা ভুলিয়া যান যে শিশুর পক্ষে ক্রন্দনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে[১]। তাহা ছাড়া শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই সর্ব্বদা তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ শিশু তাহার সকল ইচ্ছা সহজেই কাঁদিয়া কাটিয়া পূরণ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু এইরূপ অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে জীবন সংগ্রামে তাহাকে অনেকক্ষেত্রেই নিরাশ হইতে হইবে।

শিশু যাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আত্ম-শিক্ষা করিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শৈশবে শিশু যদি নিজেই বিভিন্ন কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, যদি সেই জন্য কৃত্রিম যন্ত্রাদি ব্যবহার না করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্য-ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইবে।

---

১ নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেন কাঁদিতে থাকে, কাণ্ট বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন কারণ দেখাইয়াছেন :

(১) জননীর জঠরে অবস্থান কালে শিশু নিঃশ্বাস লয় না; কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য তাহার রক্ত-প্রবাহের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শিশুর দেহে বেদনার সৃষ্টি করে। (Lecture-notes on Education, S. 40).

(২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যেন বুঝিতে পারে যে, সে আর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং তখন যেন তাহার স্বাধীনতায় বাধা জানাইবার জন্যই চীৎকার করে। (Anthropology. Ed. by Hartenstein, vii. P. 389)

(৩) শিশুর ক্রন্দন ক্রোধের প্রকাশক নহে, বরং উহা বিরক্তির প্রকাশক। (Anthropology. p. 652)

শিশুর অভিভাবকরা অনেক সময় শিশুকে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন অভ্যাসের দাস করিয়া তুলেন। অভ্যাস করানর অর্থ হইল শিশুর জীবনকে যন্ত্রের ন্যায় স্বাধীনতা-বিহীন করিয়া তুলা[৮]। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এই দুইটীর কিরূপে সমন্বয় সাধন করা যাইবে সে সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন যে সকল ক্ষেত্রেই শিশুকে শাস্তির ভয় দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে—শিশুর ক্ষেত্রে "লাঠৌষধি" প্রয়োগ করিলে সুফল অপেক্ষা কুফল পাইবারই সম্ভাবনা বেশী; কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শিশু শাস্তির ভয়ে সত্যগোপন করিতে শিখিবে এবং তাহার সরলতা নষ্ট হইয়া যাইবে।[৯] তাহা ছাড়া, শিশুকে 'সভ্য-ভদ্র' করিয়া তুলিবার জন্য শিশুকে লজ্জা দেওয়া উচিত নহে। শিশু যাহাতে সরলভাবে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর সরল আত্ম-প্রকাশের পথে অযথা বাধা সৃষ্টি না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে নিয়মানুগ করিয়া তুলিতে হইবে। আবার শিশুকে সর্বদাই অতিরিক্ত আদর দেওয়া উচিত নহে। ইহার ফলে শিশু পিতামাতা বা অন্য গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে এবং সব কিছুই 'চোখের জলের' দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করিবে।[১০] এ কথা সত্য শিশুর মনে নৈতিক জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু সর্বদাই শিশুর সকল আব্দার সহ্য করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে কঠোর শাস্তির দ্বারাও তাহাকে আর সুপথে আনা যাইবে না। শিশুকে যখন ভবিষ্যতে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে, তখন সকল ক্ষেত্রেই সে সাফল্য লাভ করিবে

---

৮ কাণ্টের ভাষায়: "The more habits a man has, the less is he free and independent. It is the same with all other animals. He always retains a certain inclination for that to which he was early accustomed. The child must be prevented from habituating himself to anything, and he must not be allowed to form any habits". (*Lecture-notes on Education*, p. 44). কাণ্ট আবার নিজেই এই মতের কিছুটা বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন: "The human being should also accustom himself to sleep certain hours.... it is very salutory to man if he always eats at a certain hour." (*Ibid.*, S. 45).

৯ কাণ্ট বলেন: "It is very strange, for example, that parents should desire children to kiss their hands after having been punished with the rod. Children thus become trained to dissimulation and falsehood." (*Ibid.*, S. 48).

১০ কাণ্টের ভাষায়: "Concession to all their fancies in early youth ruins their heart and manner." (*Ibid.*, S. 51). চলতি ভাষায় আমরা যাহাকে 'আদর দিয়ে মাথা খাওয়া' বলি সে ব্যাপারে কাণ্টের মতে পিতা অপেক্ষা মাতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। তিনি বলেন: "Mothers usually spoil their children ... and pamper them generally ... The father, on the contrary, scolds and even whips them.". (*Ibid.*, S. 52).

এমন আশা করা যায় না এবং ফলে ঐরূপ শিশু কখনও বা ক্রোধোন্মত্ত, কখনও বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া পড়িবে।

শিশুর আবদার-রক্ষার ব্যাপারে যখন মধ্যে মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে, তখন দেখিতে হইবে যেন অকারণ শিশুর ইচ্ছাশক্তি ব্যাহত না হয়।

শিশুকে শাসন করিবার জন্য অনেক সময় উদ্ভট বা বীভৎস জিনিষের ভয় দেখান হয়; যেমন, মাকড়সা, জুজু, ভূত ইত্যাদি। এরূপ করিলে শিশুর মনের সুগম প্রকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায়।

সুখ ও দুঃখ, এই দুই অনুভূতির সাহায্যে শিশুর মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুকে এমন কতকগুলি খেলায় প্রযোচিত করিতে হইবে যাহাতে সে আনন্দলাভ করিতে পারে, আবার অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা দেহেরও পুষ্টি সাধিত হয়।[১১] সুতরাং খেলার নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খেলার অন্যতম উপকারিতা হইল যে, খেলার মাধ্যমে শিশু যেন নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করিতে শিক্ষালাভ করে এবং শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ক্রমশঃ তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। কান্টের সমসাময়িক লেখক লিষ্টেনবের্গ (Lichtenberg) ক্রীড়াচ্ছলে শিশুকে শিক্ষা দিবার প্রথাকে নিন্দা করেন—প্রকৃত কাজ না করিলে শিশুর শিক্ষালাভ হয় না। কান্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকে কাজ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে এবং খেলিতেও হইবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে সুষ্ঠুভাবে অবসর বিনোদনের অভ্যাস তাহাকে করিতে হইবে। মানুষ সহজেই কর্মবিমুখ ও অলস হইয়া পড়ে, সুতরাং খেলার মাধ্যমে শিশুকে প্রথম হইতেই কর্মক্ষম থাকিবার শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(*ছাত্র*)

বিদ্যালয়ে পাঠের উপকারিতার উল্লেখ করিয়া কান্ট বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে শিশু সংযম শিক্ষা করিতে পারিবে এবং তাহাদের মানসিক ক্ষমতার উন্মেষ হইবে। তাহা ছাড়া, অমনোযোগিতা ও কুঅভ্যাস গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

মানসিক শক্তির উন্মেষ প্রসঙ্গে কান্ট বলিয়াছেন যে, মানসিক ক্ষমতাগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন নহে; আবার সকল ক্ষমতা বা প্রবৃত্তিই সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে, সেজন্য সকল প্রবৃত্তির উন্মেষ বাঞ্ছনীয় নহে। স্মৃতি ও বিচারশক্তি সমপর্য্যায়ভুক্ত

১১ দেহের গঠনের সহায়তা করে এমন কতকগুলি ক্রীড়া সম্বন্ধে কান্ট বলেন: "Running is a healthier movement ... Leaping, lifting, carrying, hurling, throwing at a mark, racing and all such exercises are excellent (*Ibid.*, p. 59).

নহে ; বিচার ও বুদ্ধিশক্তির যদি উন্নয়ন না হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র স্মৃতির প্রাখর্য্য লইয়া কী হইবে ? উপন্যাস পাঠ বালকবালিকাদের মনের পক্ষে ক্ষতিকারক—কারণ উপন্যাস পাঠে তাহারা নিজেদের পরিকল্পিত মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং দিবাস্বপ্নে কাল অতিবাহিত করে।[১২]

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন যে, প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, খনিজবিদ্যা এবং সাধারণ প্রকৃতি-পরিচয় শিক্ষা করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কবিদ্যা ও গণিত শিক্ষা করা কর্তব্য। জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এই কার্য্যের জন্য গণিত সমধিক উপযুক্ত।[১৩] ইহার সঙ্গে আবার ভাষাও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে কাণ্ট বলিয়াছেন যে অমনোযোগিতাই শিক্ষার প্রধান শত্রু ; কারণ মনোযোগিতা না থাকিলে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল মনের কৃষ্টিসাধন ; এইজন্য দৈহিক (physical) এবং নৈতিক দুইটী পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ, শিক্ষণ ও অভ্যাস। যুক্তিশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য সক্রেটিসের পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

নৈতিক শিক্ষাদান নৈতিক উপদেশ ও প্রবচনের মাধ্যমে হওয়া উচিত—শাস্তির সাহায্যে নৈতিক শিক্ষা দান করা যায় না। নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন গুরুজনকে মান্য করা, সত্যবাদিতা (veracity) এবং সামাজিকতাবোধ (sociability)। তাঁহার নীতিবিদ্যায় তিনি নৈতিক আদর্শের কঠোর অনুশাসন অনুসারে চলিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং এই কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে। মিথ্যাবাদিতাকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে এবং অনেক বালক-বালিকারই কৌশলে মিথ্যা বলিয়া যাইবার যে ইচ্ছা আছে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে।[১৪] সামাজিকতাবোধ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিতে

---

১২ কাণ্টের ভাষায় : "Novel-reading is most injurious to children. ... Such reading weakens the memory ... all novels should be taken out of the hands of children" (*Ibid.*, S. 69 .

১৩ কাণ্ট বলেন : "..... we must try to effect a gradual union of knowledge and power. Among all the sciences, mathematics appears to be the one which best accomplishes this purpose." (*Ibid.*, S 70).

১৪ কাণ্ট এই প্রসঙ্গে মাতৃদের একটি দুর্বলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন : "It is the father's affair to see to it that they break off this habit (of lying). for mothers usually consider it a

হইবে, কারণ শৈশবে পরস্পরের মধ্যে সৌখ্যভাব না থাকিলে ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ইত্যাদি মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। শিশুরা যাহাতে সহজ, সরল অন্তঃকরণে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারে তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা লাভ করিলে শিশু ক্রমশঃ স্বেচ্ছায় নৈতিক কার্য্য করিবে এবং তখন এ বিষয়ে আর বাধ্যবাধকতার বোধ (sense of compulsion) থাকিবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্র গঠন। মানুষ স্বভাবতঃ ভালও নয় মন্দও নয় এবং এইজন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তাহার চারিত্রিক উন্নতিসাধন; উপযুক্ত সময়ে নৈতিক শিক্ষা না হইলে শিশুর মন্দপথে যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। নৈতিক শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন। তবে কাণ্টের মতে কেবলমাত্র ধর্মের গোঁড়ামি সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নহে; ধর্ম বলিতে বাহ্য আচারের অনুশাসন মনে করা উচিত নহে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা হয়।[১৪] যেমন, নৈতিক শিক্ষা বলিতে ধর্মের বাহ্য আচার নহে, সেইরূপ নৈতিক শিক্ষার সহিত তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় শিক্ষাকেও মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে।[১৫]

(পাঁচ)

আমরা উপরে শিক্ষা সম্বন্ধে কাণ্টের বক্তৃতামালা হইতে তাঁহার মতের ইঙ্গিত করিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন নাই; সেইজন্য তাঁহার মতের কোন সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে আমরা তাঁহার যে সমস্ত মতবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাই যে অনেক আধুনিক মতবাদের পূর্বসূচনা তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রোয়েবেল, মণ্টেসরি, ডিউই ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিশারদগণের সহিত তাঁহার মতের অনেকাংশে মিল আছে।

---

thing of no, or at least very small importance; they even look upon it as a flattering proof of the superior talents and capacities of their children." (*Ibid*, P. 87).

১৪ কাণ্টের ভাষায়: "The religion which is founded merely upon theology can never contain anything moral ... Morality must precede, theology follow, and then we have religion." (*Ibid*., P. 105).

১৫ কাণ্ট বলিয়াছেন: "All instruction in morals in lecture-halls, from the pulpit, and in popular books becomes ridiculous when it is dressed out with metaphysical odds and ends."

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিশারদগণের ন্যায় কাণ্ট মনে করেন যে, শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিবার কোন বিশেষ বয়ঃক্রম নাই। এক হিসাবে শিশুর জন্মের সহিত তাহার পরিচর্য্যার মাধ্যমেই তাহার শিক্ষা সুরু হয়, ইহা কাণ্ট বলিয়াছেন। আবার ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাদান, শিক্ষাদানকালে প্রহার ও তিরস্কার পরিবর্জন, সহজ প্রবৃত্তি-গুলির সুষ্ঠু প্রকাশের ব্যবস্থায় নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক মতবাদের ইঙ্গিত আমরা কাণ্টের আলোচনার মধ্যে পাই।

(ছয়)

কাণ্টের নিজস্ব মতবাদ গঠনে যে সমস্ত দার্শনিকের রচনা কাণ্টকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে জাঁ জাক রুশোর (Jean Jacque Rousseau) নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[১৭] সাধারণতঃ রুশোকে 'স্বভাববাদী' (naturalist) বলিয়া অভিহিত করা হয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, রুশোর দৃষ্টিভঙ্গী কাণ্টের বিপরীত। কিন্তু রুশো যে অর্থে 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' (nature)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিম সামাজিক পরিবেশের কঠোর বন্ধনের বিরুদ্ধতার ইঙ্গিত করে। রুশো যখন আদিম প্রাকৃতিক অবস্থার জয়গান করিলেন, তখন তাহার অর্থ নহে যে তিনি উচ্ছৃঙ্খল, নীতি-বিহীন কোন অবস্থাকে সমর্থন করিলেন। রুশো নৈতিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসহ যুক্তি ও বিবেকের অবদান অস্বীকার করেন নাই।[১৮] বাস্তবিক তিনি এমিল্ (Emile) এর যে শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে নৈতিক সংযম শিক্ষার উপর প্রাধান্য অর্পণ করিয়াছেন।

কাণ্ট ও রুশোর মতবাদ তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাণ্ট যেমন নৈতিক কার্য্যের সার্বিকতা বা বিশ্বজনীনতা (universality)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ

---

১৭ এইরূপ শুনা যায় যে কাণ্ট তাঁহার জীবনে মাত্র একদিন তাঁহার নৈমন্দিন ভ্রমণের জন্য বাহির হন নাই, এবং সেই দিনটি হইল যেদিন তিনি রুশোর 'Emile' শীর্ষক পুস্তকটি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন—পুস্তকটি পাইয়া কাণ্ট এমনই তন্ময় হইয়া পড়িতে সুরু করেন যে উহা শেষ না করিয়া তিনি উঠিতে পারেন নাই!

রুশোর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়া কাণ্ট বলেন : "There was a time when ..... I despised the common people who know nothing. Rousseau has set me right".

১৮ তুলনীয় : ... "Rousseau's doctrine is not in the philosophical sense naturalistic. Nature for him is not opposed to reason or spirit but to convention, typified by society as he conceived it." (Rusk, *Philosophical Bases of Education*, p. 183). আরও : "Of Rousseau, indeed, ... it might be said that he made morality the end of education" (*Ibid.*, p. 119).

করিতেন, রুশোও সেইরূপ বলিতেন যে, যিনি ধার্মিক তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছা (particular will)-এর সহিত সাধারণ ইচ্ছা (general will)-এর মিল থাকিবে। কান্ট যেমন বাসনা, কামনা, আবেগ ইত্যাদির প্রভাব হইতে 'শুদ্ধ ইচ্ছা' (pure will)-কে মুক্ত রাখিতে চাহিতেন, সেইরূপ রুশোও বাসনা-কামনার দাসত্বকে নিন্দা করিয়াছেন।[১৯] আবার কান্ট যেরূপ মনে করিতেন যে, ধর্মের 'পুরস্কার' উচ্চতর পবিত্র সুখ বা তৃপ্তি (happiness), সেইরূপ রুশোও বলিতেন যে, আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের (pleasure) অন্বেষণ করিলে প্রকৃত সুখ (happiness) পাইব না।

(সাত)

যাহা হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে কান্টের মতবাদের সুসংবদ্ধ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কান্টের মতবাদের মধ্যে এমন অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে যাহা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্জিত করিতে পারে।

---

১৯ রুশোর ভাষায় : "The mere impulse of appetite is slavery, while obedience to law which we prescribe to ourselves is liberty " (*Social Contract*, p. 19).

কথার কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল যে ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। পরবর্তী পর্বে পরা-বিজ্ঞানে অবিশ্বাস ঠিকই রহিল, বরং আরও প্রবল হল, যদিও আদর্শ ভাষায় বিশ্বাস, তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত করে এমন কোন ভাষায় বিশ্বাস, ক্ষীণ হতে হতে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। এই দ্বিতীয় পর্বের রূপান্তরের কথা বলতে হলে আদর্শ ভাষা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে লৌকিক ভাষার দুটি দোষের, অনুপযুক্ত ব্যাকরণ শাসিত হওয়া এবং সংকুচিত সংকেত বহুল হওয়া নামক দোষ, দুটির কোনটিই আদর্শ ভাষায় থাকবে না। আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গণিতিক ন্যায়, এবং এতে কোন সংকুচিত সংকেতও নাই। এই ভাষায় তেমন সংকেতই আছে যা সংকেতিত করে কল্পনাদি মুক্ত সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত পদার্থকে। সুতরাং দ্রব্য বাচক সংকেত এ ভাষায় স্থান পাবে না তেমনি জাত্যাদিবাচক সংকেতও পাবে না। জাতি অভাব প্রভৃতি পদার্থ সম্পর্কে, সকল বিশ্লেষণ পন্থী দার্শনিক অবশ্য একমত নন। লর্ড রাসেল জাতি এবং আরও অনেক প্রকার পদার্থ অস্বীকার করেন। তারা যে সাক্ষাৎকৃত হয় এ কথাও বলেন। জাতি, অভাব (negative facts) প্রভৃতির সংকেত ঘটিত বাক্যকে যে কোন অধিক মৌলিক বাক্যে বিশ্লেষিত করা যায় না এমন কথাও বলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষণপন্থী দার্শনিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। আসলে, বিশ্লেষণী দর্শনের মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষবাদ, (empirlcism)। লর্ড রাসেলে এই প্রত্যক্ষবাদ উপস্থিত থাকলেও, তাঁর মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে গাণিতিক ন্যায়। আদর্শ ভাষা নির্মাণ কল্পে তিনি প্রথমে সাহায্য নিয়েছেন গাণিতিক ন্যায়ের, ভাষার ব্যাকরণ স্থির করেছেন প্রথমে। তারপর শব্দ সম্ভারের অনুসন্ধানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যক্ষবাদের দ্বারে। কিন্তু ভিৎগেনষ্টাইন প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য দার্শনিকদের কথা একটু আলাদা। তাঁদের মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে প্রত্যক্ষবাদ। তাঁরা প্রথমে প্রত্যক্ষবাদী পরে গাণিতিক নৈয়ায়িক, বিশ্লেষণপন্থী দার্শনিক। গাণিতিক ন্যায় হতে ভাষার শুদ্ধ সম্ভার সংগ্রহের জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষবাদে আসেন নাই। প্রত্যক্ষ-বাদকেই আরও দৃঢ় করিবার জন্য যে জাতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষবাদে বহুবিধ আপত্তির,

অনুপপত্তির সৃষ্টি করে সেই সব পদার্থকে অপনীত করবার জন্য, তাদের প্রত্যক্ষবাদ অনুকূল উপপত্তি দেবার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন পাণিনিক ন্যায়ের। এঁদের কাছে ভাষার শব্দ সম্ভার এসেছে আগে, এবং এই শব্দ রাশির মধ্যে জাত্যাদির সংকেত নাই—তার পরে এসেছে ব্যাকরণ, যার সাহায্যে এই সব সংকেত ব্যবহারের একটি সহজ উপপত্তি দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আদর্শ ভাষা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে যে এই ভাষায় জাত্যাদির সংকেত থাকবে না। জাত্যাদির সংকেত বলতে কেবল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতিকে বুঝলেই হবে না। নীল, পীতাদিকেও বুঝতে হবে। নীল পীতাদি শব্দের শক্তি ব্যক্তিতে নাই, আছে জাতিতে, নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতিতে। এরাও ব্যক্তি বাচক নয়। ইংরাজী ব্যাকরণ অনুযায়ী এরা জাতিবাচক বিশেষ্য common-noun। 'নীল' কে ব্যক্তিবাচক করতে হ'লে 'এই' 'ওই' প্রভৃতি নির্দেশমূলক অঙ্গ-ভঙ্গী সহকৃত হলেই সার্থক হয় এমন সংকেত ব্যবহার করতে হবে। তারপর লেখ্য ভাষায় 'এই নীল' না লিখে নীল কালিতে 'এই' লিখলেই চলে যাবে, 'নীল' শব্দের ব্যবহারের কোন প্রয়োজন অনুভূত হবে না। কথ্য ভাষায় অবশ্যই নীল কালি ব্যবহার করা চলবে না। এবং আঙুলে নীল রং মাখিয়ে নির্দেশ করেও তেমন কিছু লাভ হবে না। অনুভূত তথ্যের রং যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে, অথবা বিভিন্ন রূপ যদি অবিচ্ছেদে অনুভবে উদ্ভাসিত হতে থাকে তাহলে কত রং আঙুলে মাখব ? রূপ ভিন্ন তথ্যের ক্ষেত্রেই বা কি কৌশল অবলম্বন করব? তাই 'নীল' শব্দটি রাখতে হয়। কিন্তু এর দ্বারা বুঝতে হবে কোন জাতিকে নয়। শব্দটি প্রথমে সংকে-তিত করবে অনুভবে উদ্ভাসিত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে, তারপর অবশ্য বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয় বলে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে সংকেতিত না করে করবে যে কোন ব্যক্তিকে। আসলে, আমরা অনেকেই একই সংকেত ব্যবহার করি, এবং মনে করি একই পদার্থকেই সংকেতিত করে বুঝি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অনুভূত পদার্থকেই সংকেতিত করতে হবে। আমার অনুভূত পদার্থ আমার অনুভবে ভাসমান পদার্থ, ঠিক অপর কারও অনুভবে ভাসমান পদার্থ নয়, হতে পারে না। অনুভবের এই অত্যাজ্য স্বকেন্দ্রিকতা সর্ববাদিসিদ্ধ। তাই আমার চেতনায় উপস্থিত নীলাদি পদার্থ অপরের চেতনাতে উপস্থিত নীলাদি পদার্থ এক নয়। আমার ব্যবহৃত 'নীল' সংকেত এবং অপরের ব্যবহৃত 'নীল' সংকেতও একই পদার্থকে সংকেতিত করে না। 'নীল' শব্দটি ব্যবহার কালে আমি যা বুঝি, বোঝাতে চাই অপরে তা বোঝে না, বোঝাতেও চায় না। "নীল পীতাদি" সংকেতও তাই আদর্শ ভাষায় স্থান লাভ করলে, বিধেয়াংশে স্থান লাভ করলে, সে কাজ করতে পারবে না, যে কাজ এরা লৌকিক ভাষায় করে থাকে।

'সক্রেটিস' প্রভৃতি লৌকিক ভাষার ব্যক্তি বাচক, উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত সংকেত সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। সূক্ষ্ম বিচারে সক্রেটিস' কোন ব্যক্তির নাম নয়। জন্ম হয়ত শুরু করে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে অসংখ্য সক্রেটিস ব্যক্তির ধারা মোটামুটি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়েছে সেই ধারাকে অথবা সেই ধারার মধ্যে কোন ঐক্য কল্পনা করে সেই ঐক্যকে অথবা সেই অসংখ্য ধারার ঘটক ব্যক্তির সমাহারকে আমরা সক্রেটিস বলে থাকি। সক্রেটিস-আদি নামও প্রকৃত ব্যক্তিবাচক নাম নয়। ন্যায়সিদ্ধ ব্যক্তিবাচক নাম (logically proper name) 'এই', 'সেই' প্রভৃতি সংকেত। এরাই অনবিচ্ছিন্ন নির্ধর্মা, বিশুদ্ধ বিশেষকে সংকেতিত করতে পারে, এবং এরূপ বিশেষই তত্ত্ব, এরাই বস্তু। জাত্যাদি অলীক। আদর্শ ভাষায় থাকবে কেবল 'এই', 'সেই', এবং এদের মতন অন্যান্য সংকেত। এবং যেহেতু সংকেতিতরা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অনুভবে ভাসমান বিশেষ ব্যক্তি, অন্ততঃ উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত সংকেত সংকেতিতরা তাই, এবং অনুভব স্বকেন্দ্রিক, সেই হেতু এই ভাষারও স্বকেন্দ্রিকতা অত্যাজ্য। দৈনন্দিন জীবনে ভাষাকে আদান প্রদানের উদ্দেশ্য, নিজেকে বিস্তৃত করবার উদ্দেশ্যে, অপরের মনে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্যে, ব্যবহার করা হয়। এই ভাষা লৌকিক ভাষা। আদর্শ ভাষায় একাজ করা যাবে না। কিন্তু সেজন্য ধমকে চলবে না। খেয়াল রাখতে হবে ' the needs of logic are so extra-ordinarily different from the needs of daily life' ন্যায়ের দাবী লোক ব্যবহারের দাবী হতে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। বস্তুতঃ এই আদর্শ ভাষার উদ্দেশ্য তত্ত্ব নির্ণয়, লৌকিক প্রয়োজন মেটানো নয়, এর ব্যবহারেও যখন তখন হয় না, হয় State-occasion এ, মনন মহোৎসব লগ্নে। এ ভাষা আটপৌরে নয়, পোষাকী।

তবু দমে যেতে হয়, আদর্শ ভাষার মহিমা সম্পর্কে, ন্যায়ের কঠোর দাবী সম্পর্কে যত কথাই বলা হ'ক না কেন, এ ভাষায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা বেশী দিন যায় না, এ ধারণা মন থেকে যায় না, যেতে চায় না, যে আদর্শ ভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টা এক প্রকার বাতিক। প্রকৃত পক্ষে এই ভাষাকে যে কেন ভাষা বলা হবে, তা বুঝতে পারা যায় না। ভাষার প্রাথমিক কর্তব্য আদান-প্রদানে, পারস্পরিক বোঝাবুঝির ব্যাপারে সাহায্য করা। ভাষা একটি সামাজিক জিনিষ। সমাজের বাইরে ভাষা আছে বলে শোনা যায় না। সমাজে যে ভাষা পুষ্টি পায় তাও দেখা যায়। পুষ্ট ভাষা যে সমাজকে আরও পুষ্ট হতে, সামাজিক হতে সাহায্য করে, তাও দেখা যায়। বস্তুতঃ একান্ত স্বকেন্দ্রিক ভাষাকে ভাষা বলাই অনুচিত। আদর্শ ভাষা সমাজের জিনিষ নয়। লৌকিক সমাজেরও নয়, পণ্ডিত সমাজেরও নয়। এ ভাষা কোলকাতারও নয়, নবদ্বীপেরও

নয়। এ একান্ত স্বকেন্দ্রিক জিনিষ, একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার, এই ব্যক্তিও আবার অতি পরিবর্তনশীল। একে ভাষা বলা ভাষা শব্দের অপব্যবহার করা। 'ভাষা' শব্দের ব্যবহার তখনই করা যায় যখন বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা সামাজিক ব্যবহারের দ্বারা, শব্দের শক্তিগ্রহ হয়। একান্ত ব্যক্তিগত ভাষার সংকেত সমূহের শক্তিগ্রহ যে কিভাবে হবে, কোন বস্তুকে কোন সংকেত সংকেতিত করে এ যে কিভাবে বোঝা যাবে, তা বুঝতে পারা যায় না। 'ভাষা' শব্দ যা সংকেতিত করে তার সঙ্গে আদর্শ ভাষার কোন সাদৃশ্যই নাই। ভাষাত্ব বলে কোন ধর্মের ধর্মী বলে একে মনে করা যায় না। এর ব্যাকরণ, গাণিতিক ন্যায় এবং সব ভাষারই ব্যাকরণ ন্যায়, এই টেবিল চাপড়ানো যুক্তি উপস্থিত করলেও না। কারণ, এই যুক্তির সাহায্যে যদি আদর্শ ভাষার ভাষাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহলে ভাষার ব্যাকরণ ন্যায়ই, এই প্রতিজ্ঞার অযাথার্থ্যও সিদ্ধ হতে পারে। আদর্শ ভাষা প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এর সপক্ষে একশো এক মোক্ষম যুক্তি থাকলেও না।

আর বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর সপক্ষে একটিও নির্দোষ যুক্তি নাই। ভাষা শব্দের অনুভব গৃহীত অর্থে আদর্শ ভাষাকে ভাষা বলা চলে না। একে ভাষা বলা হয় মাত্র একটি মনন সর্বস্ব যুক্তির সাহায্যে। এই যুক্তির মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে সাধারণ ভাষার ব্যাকরণ এরিষ্টটলের ন্যায়, এবং এই ন্যায়ের বিস্তার, পরিণতি ও প্রতিষ্ঠা গাণিতিক ন্যায়ে। কিন্তু এই বিশ্বাসটি সত্য না হতেও পারে। বিশ্লেষণী দর্শনের তৃতীয় পর্বে এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে হয় নাই। আমরা এখন দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে। তাই ঐ আলোচনা এখন স্থগিত রাখতে হয়। যে কথাটি দ্বিতীয় পর্বে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং যার জন্য দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় একথা অস্বীকার করেছিলেন সেই কথাটিই এখন বলতে হয়। এই দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা নিজেদের নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী (logical empiricist) বলতেন যেমন বলতেন প্রথম পর্বের দার্শনিকরা নিজেদের নৈয়ায়িক পরমাণুবাদী (logical atomist)। এই দুটি নামই আমরা এখন থেকে যখন ব্যবহার করলে সুবিধা হবে, তখন ব্যবহার করব। যাই হোক, নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের মতেও ভাষা ক্যালকুলাস্ বিশেষ। আসলে ভাষাকে এক প্রকার ক্যালকুলাস্ বলে মনে করা এবং সমীকরণভঙ্গিক বিশ্লেষণে বিশ্বাস করারই আর একটি দিক। প্রত্যক্ষবাদীরা বিশ্লেষণের প্রকৃতি সম্পর্কে পরমাণুবাদীদের মতই গ্রহণ করতেনই। তাঁরা বিশ্লেষণ বলতে বুঝতেন বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণকে সমীকরণ লিখন রীতিতে পরিবেশন

করা। তাই ভাষাকে ক্যালকুলাস্ বিশেষ বলেও তাঁরা মনে করতেন। সুতরাং ভাষার ব্যাকরণ যে ন্যায় এবং আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ যে গাণিতিক ন্যায়, একথাও তাঁরা মানতেন। কিন্তু গাণিতিক ন্যায় সম্পর্কে তাঁরা কিছু ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। পরমাণুবাদীরা PM গ্রন্থে যে ক্যালকুলাস ব্যবহৃত হয়েছে, যে শব্দ সম্ভার বিযুক্ত বিশুদ্ধ ব্যাকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ব্যাকরণকেই আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ বলে মনে করতেন। তাঁরা আরও মনে করতেন বিকল্প ব্যাকরণ নাই, অন্য প্রকার ক্যালকুলাস্ হয় না। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক তা দেখা গেল। দেখা গেল বিকল্প ক্যালকুলাস নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং, ইউক্লিডীয় ও অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মধ্যে কোন একটিকে যেমন অতিরিক্ত প্রমাণের অভাবে বাস্তব দেশের শাস্ত্র বলে মনে করা যায় না, ঠিক তেমনি বহুবিধ গাণিতিক ন্যায়ের মধ্যে, ক্যালকুলাসের মধ্যে কোন একটিতেই যে তত্ত্বের আকারের ইঙ্গিত বিদ্যমান, একথাও মনে করা যায় না। আদর্শ ভাষা একটি নয়, এক প্রকারও নয়—বিভিন্ন প্রকারের আদর্শ ভাষা নির্মাণ সম্ভব। এবং তাদের মধ্যে কেবল একটিই খাঁটি আদর্শ ভাষা এবং তাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, আদর্শ-ভাষা-জিজ্ঞাসা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রামাণিক অর্থে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, একথা নিষ্প্রমাণ।

প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষবাদ-অনুবিদ্ধ-বিশ্লেষণী-দর্শন এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ পরাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা অহি-নকুলের সম্বন্ধের মত। নৈয়ায়িক পরমাণুবাদীরা একথা বুঝতে চান নি। তাঁরা ভেবেছিলেন মনন সর্বস্ব পরাবিজ্ঞান, অনুমানৈকগম্য সত্তায় বিশ্বাসী পরাবিজ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা যেরূপ পরা-বিজ্ঞান করেন তা সম্ভব। এরূপ মনে করার হেতু ছিল তাঁদের আদর্শ ভাষা বিষয়ক মতটির এবং তাঁদের সকল মতের ভিত্তিরূপ প্রমাণ বিষয়ক মতটির মূলে ছিল একটি পরাবৈজ্ঞানিক মত। অর্থাৎ তাঁদের আদর্শ ভাষায় দুরকমের বাক্য, আণবিক এবং পরমাণবিক বাক্য, স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরমাণবিক বাক্য স্বীকারে যুক্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক সময় বলা হয়েছে যে পরমাণবিক বাক্য একান্ত সরল। এই উত্তর যে সদুত্তর নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি জিজ্ঞাসা মাত্র, তা সামান্য বিবেচনা করলেই দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একান্ত সরল বলতে কি বুঝব? কোনও সংকেতকে যখন সরল সংকেত বলা হয় তখন তার মানে বোঝা যায়। এই সংকেতটি অনুভূত পদার্থকেই যে সংকেতিত করে অর্থাৎ সংকেতটি যে একটি অসংকুচিত সংকেত, একথা বুঝলেই চলে। কিন্তু বাক্যকে সরল বললে তা বোঝা যাবে না। আদর্শ ভাষার কোন বাক্যই তত্ত্ব অজ্ঞাপক নয়। তাই সরল

অর্থে যদি তত্ত্ব জ্ঞাপক, তত্ত্ব প্রতিবিম্ব বোঝা হয়, তাহলে আণবিক পরমাণবিক সব বাক্যই সরল বাক্য হবে, এবং বৈবিধ্য স্বীকারের আর কোন হেতু থাকবে না। উপরন্তু একটি বাক্য মিথ্যা হতে পারে। সকল বাক্যই সত্য নয়। তাই বাক্যকে তথ্যের নাম বলা যায় না। সেইজন্য সংকেতের সারল্যের দৃষ্টান্তে বাক্যের সারল্য বোঝা যায় না। সরল বাক্য বলতে তত্ত্বের প্রতিবিম্বরূপ বাক্য বোঝা চলে না। অন্য কিছু বুঝতে হয়। বুঝতে হয় এমন বাক্য যার নৈয়ায়িক মর্যাদা অন্য কোন বাক্যের নৈয়ায়িক মর্যাদার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই বোঝাতেও কিছু গোল আছে। একটি বাক্য অন্য বাক্য সাপেক্ষ কিনা, এই প্রশ্নটি অবশ্য মানস বিজ্ঞান ঘটিত প্রশ্ন নয়, নৈয়ায়িক প্রশ্ন। তাই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে পরমাণবিক বাক্য নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠেই না। ঐতিহাসিক বিচারে মনোজীবনের ইতিহাসের প্রথম পাতার প্রথম বাক্যটিকে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য, আদিমতম বাক্য বলা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িক বিচারে যায় না। আমাদের অভিপ্রেত অর্থে ঐ বাক্যকে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য বলা যাবে না। প্রশ্নটিকে নৈয়ায়িক প্রশ্ন বলেই বিবেচনা করতে হবে। পরমাণবিক বাক্য বলতে এমন বাক্য বুঝতে হবে যা নৈয়ায়িক বিচারে একান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু এরূপ বাক্য অসম্ভব। তার এক প্রকার নয়, বহু প্রকার, অন্ততঃ বহু প্রকারের হতে পারে। সমান্তরাল রেখার প্রকৃতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বাক্য স্বীকার পূর্বক বহু প্রকার জ্যামিতি নির্মাণ সম্ভব। তেমনি, বিরোধ-বাধক নীতি, অথবা তাদাত্ম্য নীতি, অথবা এরিষ্টটলীয় ন্যায়ের যে কোন মৌলিক নীতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বাক্য অঙ্গীকার করে বহুপ্রকার ন্যায়ও নির্মাণ করা যায়। ন্যায় যদি চিন্তার শাস্ত্র হত, তাহলে বহু প্রকার ন্যায় নির্মাণ করা সম্ভব হত না। কিন্তু ন্যায় চিন্তার শাস্ত্র নয়। গণিতের মত বিশুদ্ধ, বিমূর্ত, আকারৈকধর্মী সংকেতের শাস্ত্র—বহু প্রকার ন্যায় নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং কোন একটি বিশেষ প্রকারের ন্যায়ে যে আকারের বাক্য প্রাথমিক বলে স্বীকৃতি পাবে, বিজাতীয় ন্যায়ে সেই আকারের বাক্য এই স্বীকৃতি নাও পেতে পারে।

আসলে নৈয়ায়িক নিরপেক্ষতা এক প্রকার মনন সর্বস্ব জিনিষ। এর নির্ণয়ে অনুভবের, মনোজীবনের ইতিহাস আলোচনার কোন স্থান নাই। এই মননের পথ অঋজু, কুটিল, মূলক্ষয়কারী। তাই অনেক বিচারের পর কোন বাক্যকে যখন পরমাণবিক বলে স্বীকারও করা হয় তখন এ সন্দেহ থেকে যায় যে আরও কিছু বিচার করলে, কোন ভিন্ন বিচার-কৌশল প্রয়োগ করলে, উন্নত বিচার-শৈলী

অবলম্বন করলে এই বাক্যটিকেই অ-পরমাণবিক, অন্য বাক্য সাপেক্ষ বাক্য বলে দেখান যেতে পারত। সুতরাং পরমাণবিক বাক্য বলতে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বাক্যও বোঝা যায় না।

অসন্দিগ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ বাক্যকেই যে পরমাণবিক বাক্য বলব তাও হবে না। কারণ এই অসন্দিগ্ধতাকে, স্বতঃসিদ্ধিকে নৈয়ায়িক হতে হবে, মনোবৈজ্ঞানিক হলে হবে না। অভ্যাস দশায় উৎপন্ন জ্ঞান অসন্দিগ্ধই হয়ে থাকে, কিন্তু এই জ্ঞান যে বাক্যে আকার পায় সেই বাক্যকে আমরা অসন্দিগ্ধ বলতে পারি না। এই বাক্যে সন্দেহের অভাব বাক্যটি প্রামাণিক কি না, এই জিজ্ঞাসার অভাব, অভ্যাস, সংস্কার প্রভৃতির মহিমাই প্রমাণিত করে, বাক্যের নয়। তাই অসন্দিগ্ধতাকে, স্বতঃসিদ্ধিকে নৈয়ায়িক হতে হবে। কিন্তু কিরূপ বাক্য নৈয়ায়িক অসন্দিগ্ধতাশালী, তার কোন নৈয়ায়িক নিরিখ দেওয়া সম্ভব নয়। যে বাক্যকে কোন মতেই সন্দেহ করা যায় না সেই বাক্যকেই যে এরূপ বাক্য বলব তা হবে না। কারণ 'কোন মতেই' বলতে যদি লোক ব্যবহার, লোক যাত্রাকে না বুঝি, তাহলে সকল বাক্যকেই সন্দেহ করা যায়। সন্দেহ করার ফলে যদি ব্যাঘাত হয়, অনিষ্ট হয়, তাহলে সন্দেহ বন্ধ করার কথা উঠতে পারে। কিন্তু লোক ব্যবহারাদিকে বর্জন করলে, সপক্ষ বলে কোন পক্ষ না থাকলে ব্যাঘাতাদি আশঙ্কার কথা ওঠে না। 'এটা কাক' এই বাক্যটিকে সন্দেহ করা যায়। এটি কালো রং-এর কিছু, একেও যায়। আমি কালো রং দেখছি, এখানে সন্দেহ থাকে না যদি অনুব্যবসায়ে ভ্রান্তি থাকা সম্ভব নয়, এই মত স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়ে ভ্রান্তি থাকবে না, একথা ন্যায়সম্মত স্বতঃসিদ্ধ কথা নয়। বিশেষতঃ বাক্যাকারে প্রকাশিত হওয়ার অর্থ শ্রেণীকরণ, শব্দ-স্মরণ প্রভৃতি বিবিধ বৌদ্ধিক পাকে পক্ক হওয়া, এবং তাতে ভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই বাক্যটিকে অভিজ্ঞতালব্ধ চাক্ষুষদর্শনে প্রতিষ্ঠিত বাক্য বলেই মনে করতে হয়; সুতরাং অসন্দিগ্ধ বলে মনে করা যায় না। তাছাড়া, আমি কালো রং দেখছি, এই বাক্য জ্ঞানাংশে অসন্দিগ্ধ হতে পারে, কিন্তু বর্ণাংশে নয়, বিষয়াংশে নয়। তাই এই জাতীয় বাক্যকে অসন্দিগ্ধ বলেও কোন লাভ নাই। এর সাহায্যে তেমন কোন বজ্রসম তথ্য (hard data) পাওয়া যায় না, যাদের বাহ্যজগৎ সংক্রান্ত পরমাণবিক বাক্যে প্রতিবিম্বিত তথ্য বলে মনে করতে পারি। স্বতঃসিদ্ধি সম্পর্কেও এই কথা। স্বতঃসিদ্ধি সর্বদাই আপেক্ষিক। এ ভাবেও পরমাণবিক বাক্যের উপপত্তি দেওয়া যায় না।

বিশ্লেষণের বিশ্রাম স্থান রূপ বাক্য বলেও যায় না। বিশ্লেষণ যে প্রলয়ান্ত

নয়, তার যে কোথাও নিবৃত্তি প্রয়োজন একথা মানার পক্ষে তেমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই। উপরে মনন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এও বোঝা যায় যে ব্যবহারের স্বার্থে বিশ্লেষণকে নিবৃত্ত করতে হয়; কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থে বিশ্লেষণের নিবৃত্তি আছে, এ তত্ত্ব অপ-তত্ত্ব। সুতরাং পরমাণবিক বাক্য স্বীকারের মূলে পরমাণবিক পদার্থ অ-নির্ভর কোন যুক্তি নাই। এরূপ বাক্য স্বীকার করতে হলে, পরমাণবিক পদার্থ স্বীকার করে নিতে হয়, এবং বলতে হয়, যে বাক্যে পরমাণবিক পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় সেই বাক্যই পরমাণবিক বাক্য। আবার মজার কথা এই যে পরমাণবিক পদার্থ স্বীকারের যুক্তি কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে পরমাণবিক বাক্য যেহেতু আছে, এবং যেহেতু ঐ প্রকার বাক্য সত্য, অর্থাৎ কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব, সেই হেতু পরমাণবিক পদার্থও আছে। পরিষ্কার অন্যোন্যাশ্রয়। কিন্তু নৈয়ায়িক পরমাণুবাদীরা তা দেখেন নাই, কিম্বা হয়ত একে দোষ না বলে প্রামাণিক বলে মনে করেছিলেন। তাতে অবশ্য এই দোষের স্খালন হয় না, যদিও এই দোষের উল্লেখ করে মাতামাতিরও তেমন সার্থকতা নাই—কারণ চেষ্টা করলে সম্ভবতঃ সকল দর্শনেই কোথাও না কোথাও অন্যোন্যাশ্রয় দেখান যায়। তবে একথা বলতেই হবে যে পরমাণবিক বাক্য সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং পরমাণবিক তথ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব যেন দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক। পরমাণবিক তথ্য অঙ্গীকার না করলে পরমাণবিক বাক্য অঙ্গীকারের কোন অর্থ থাকে না।

এখন পরমাণবিক বাক্য যদি পরমাণবিক তথ্য সাপেক্ষ হয়, তাহলে পরমাণুবাদীদের প্রমাণ তত্ত্বও তাঁদের পরাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাপেক্ষ হয়। এই জন্যই অর্থাৎ পরমাণুবাদীদের প্রমাণতত্ত্ব পরাবিজ্ঞান নির্ভর বলেই পরমাণুবাদীরা তাঁদের প্রমাণশাস্ত্রকে, সুতরাং বিশ্লেষণী দর্শনকে পরাবিজ্ঞান মাত্রেরই বিরোধী বলে মনে করেন নাই। কিন্তু এই দর্শন পরাবিজ্ঞান মাত্রেরই বিরোধী। এই দর্শন অনুযায়ী লৌকিক প্রত্যয় নীল পীতাদির প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এই দর্শন প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী। অনুমান এ দর্শনে প্রমাণরূপে অঙ্গীকৃত হয় বটে, কিন্তু তাতে এই সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না। কারণ অনুমানকে যে প্রত্যক্ষের গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রত্যক্ষে সীমানা ছাড়িয়ে যে অনুমানের যাবার শক্তি নাই, এই কথাই এই দর্শনে বলা হয়। এই মতে অনুমিত বিষয় যদি কদাচ কোন প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়, এমন কি খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমাহারও না হয়, তাহলে তা অবাস্তব; তাকে সংকেতিত করবে যে সংকেত তা অর্থহীন। যেমন ধূম হতে আমরা বহ্নির অনুমান করে থাকি। অনুমিতি বাক্যে 'বহ্নি' সংকেতটি

থাকে। এই সংকেত বহ্নি অর্থকে সংকেতিত করে। এখন, কোন সংকেত কি সংকেতিত করে তা শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার স্বরূপ জ্ঞানেই গৃহীত হবে। তাই বহ্নি অর্থটি যদি কোন দিনই অনুভূত না হয়, তাহলে বহ্নি সংকেতটি কি যে সংকেতিত করছে তাই টের পাওয়া যাবে না। সংকেতটি অশক্ত সংকেত হবে, সংকেত হবে না। ধূম হতে বহ্নি অনুমান সম্ভব, কারণ যে বিশেষ বহ্নিটি, অথবা বহ্নিত্ব-বিশিষ্টটি অনুমিত হচ্ছে তা প্রত্যক্ষের বিষয় না হতে পারে, কিন্তু বহ্নি মাত্রই তা নয়। 'বহ্নি' সংকেতটি অনুভবে অপ্রতিষ্ঠিত সংকেত নয়। কিন্তু এমন কোন পদার্থ যদি অনুমান করতে যাই যা কদাচ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অনুভবে ভাসমান হয় না, তাহলে অনুমিতি বাক্যের বিষয় রূপ সংকেতটি সংকেতরূপেই কাজ করতে পারবে না। প্রত্যক্ষে কদাচ গৃহীত হয় না, কেবল অনুমিতিরই বিষয় হয়, এরূপ পদার্থের অনুমান অনুমান নয়। অনুমান কেবল প্রত্যক্ষ উপজীব্যই নয়, প্রত্যক্ষ অনতিক্রমী। এই অনুমান তত্ত্বই বিশ্লেষণী দর্শনের অনুমান তত্ত্ব। আদর্শ ভাষা তত্ত্বের মূলেও রয়েছে এই অনুমান তত্ত্ব। সুতরাং আদর্শ ভাষায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বাক্য এবং যে সব বাক্য এইরূপ বাক্যের উপর গাণিতিক ন্যায় প্রয়োগ পূর্বক রচনা করা যায়, সেই সব বাক্যই স্থান পাবে। অতএব কোন পরাবিজ্ঞানই সম্ভব সম্ভব নয়। ভিৎগেনষ্টাইন-এ এই কথা স্বীকৃতি পেল। তাঁর যে বাক্য বিবক্ষা তত্ত্ব, কোন বাক্যের বিবক্ষা যে তার পরীক্ষণ পদ্ধতিই এই তত্ত্ব, পরমাণুবাদীদের আদর্শ ভাষা বিশ্বাসী দার্শনিকদের প্রমাণ তত্ত্বেরই যৌক্তিক পরিণতি। বিশ্লেষণী দর্শন কেবল সাবেকী পরাবিজ্ঞানেরই বিরোধী নয়, সকল পরাবিজ্ঞানেরই বিরোধী।

প্রকৃতপক্ষে পরমাণবিক তথ্য অস্বীকার না করে আদর্শ ভাষার গঠন কল্পনা করবার চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে পরাবিজ্ঞান, কোন প্রকার পরাবিজ্ঞানই সম্ভব নয়, অর্থাৎ পরমাণবিক তথ্য যদি অস্বীকার না করা যায় তাহলে সর্বথা পরমাণবিক বাক্য বলে কোন বাক্য থাকবে না। কিন্তু আদর্শ ভাষা নির্মাণের জন্য অন্ততঃ আপেক্ষিক পরমাণবিক বাক্য প্রয়োজন। কারণ ভাষা প্রস্থান রচনা করতে হলে প্রস্থান-ভূমি স্বরূপ কিছু বাক্য চাই। ইউক্লিডের জ্যামিতির কথাই ধরা যাক। এ একটি আকারৈকধর্মী ভাষা প্রস্থান। এই ভাষা প্রস্থানে কিছু বাক্যকে আদিমতম বাক্য, মূল-বাক্য, অপর বাক্য অনপেক্ষ বাক্য বলে মনে করা হয়। তাদের বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বাক্য (axioms)। এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্য পরিত্যাগ পূর্বক ইউক্লিডীয় ভাষা প্রস্থান রচনা করা সম্ভব হয় না। তবে কিনা, এই স্বতঃসিদ্ধি আপেক্ষিক। যে বাক্যকে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য বলে ধরা

হয়, তাকে সাপেক্ষ বাক্য বলে মনে করে অন্য ভাষা প্রস্থান রচনা করা যায়। ঠিক তেমনি যে বাক্য কোন প্রস্থানে সাপেক্ষ বাক্য বলে স্বীকৃত হয়, তাকেই আবার অন্য কোন প্রস্থানে অনপেক্ষ বাক্যের মর্যাদা দিয়ে, ভিন্ন প্রস্থানের আদিমতম বাক্যকে সাপেক্ষ বাক্য, বিকৃতি (অর্থাৎ অ-প্রকৃতি) বাক্যরূপে প্রমাণও করা যায়। স্বতঃসিদ্ধি আপেক্ষিক, একটি প্রস্থান সম্পর্কে আপেক্ষিক। কোন বাক্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলার অর্থ, কোন একটি বিশেষ প্রস্থানে ঐ বাক্যটি আদিম বাক্যরূপে, প্রাথমিক বাক্যরূপে অঙ্গীকৃত হয়। 'দিল্লী বহু দূর' এই বাক্যটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়, সংক্ষিপ্ত উক্তি মাত্র। দিল্লী দিল্লী হতে বহু দূর অবশ্যই নয়, অন্য স্থান হতে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বাক্য রচনা কালীন শিবির হতে। তেমনি 'ক বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ', এই বাক্যটিও একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়, সকল প্রস্থানেই বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের মর্যাদা পায় না, অন্ততঃ এমন প্রস্থান তর্কের খাতিরেও রচনা করা যায় যেখানে বাক্যটি প্রাথমিক নয়। তাই ইউক্লিড যে যে বাক্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেছিলেন, তাদের সর্বতোভাবে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। তাদের স্বতঃসিদ্ধিকে আপেক্ষিক বলেই মনে করতে হয়। তবে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ বাক্যও স্বীকার না করলে কোন আকারৈক ধর্মী ভাষা প্রস্থান রচনা করা যায় না। যাই হক, ইউক্লিডীয় ভাষা প্রস্থানে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য, আপেক্ষিত স্বতঃসিদ্ধ বাক্য আছে। ঐরূপ বাক্য না থাকলে ঐ-ভাষা প্রস্থান নির্মিত হতে পারে না। কোনও প্রস্থানের একটি বাক্য অপর বাক্য সাপেক্ষ, একথা সকল বাক্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রস্থানে এমন বাক্য থাকতেই হবে, যা নিরপেক্ষ, যা ঐ প্রস্থানের অন্য কোনও বাক্য সাপেক্ষ নয়। 'ক' বাক্যটি 'খ' বাক্য নির্ভর হতে পারে, 'খ' বাক্যও নির্ভর করুক 'গ' বাক্যের উপর, এই ভাবে চলতে চলতে অন্ততঃ অনুস্বার কি বিসর্গে এসে চলা থামাতেই হবে ; নচেৎ চিন্তা বিশ্রাম পাবে না। পক্ষান্তরে, শিয়ালের পিঠে শিয়াল চেপে কাঁঠাল সংগ্রহ করুক, কিন্তু সকল শিয়ালই শিয়ালের পিঠে চাপলে কোন শিয়ালই কোন শিয়ালের পিঠে চাপবে না। কোন না কোন শিয়ালকে অপর কোন শিয়ালের পিঠে চাপার সুখের আশা ত্যাগ করতে হবে ; নচেৎ কাঁঠাল খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। তেমনি ভাষা প্রস্থান রচনা করতে চাইলে, প্রাথমিক বাক্য, অপর বাক্য অনির্ভর নিরপেক্ষ বাক্য স্বীকার করতে হবে। ভাষা প্রস্থানে আপেক্ষিক প্রাথমিক বাক্য অবশ্য স্বীকার্য।

তাই পরমাণবিক বাক্যের মত এক প্রকার বাক্যও স্বীকার্য। সর্বতোভাবে প্রাথমিক না হক, আপেক্ষিক প্রাথমিক বাক্য ভাষা প্রস্থানে স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এই বাক্য যে 'নীল' 'পীতাদি' সংকেত সাধিত বাক্য হবেই এমন কোন কথা নাই। দ্রব্য-সংকেত 'ঘট' 'পটাদি' সংকেত ঘটিত বাক্যও হতে পারে। আমরা যখন স্নায়ু বিজ্ঞান গঠন করি, তখন স্নায়ু প্রভৃতি দ্রব্য-সংকেত ব্যবহার করে সুফল পাই। 'নীল' 'পীতা'দির ভাষা এবং দ্রব্য-ভাষা, দুই প্রকার ভাষাই কাজ দিতে পারে। কোন ভাষা বেশী কাজের, এ এক প্রকার পরাবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। সুতরাং বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, এরূপ কথা বলার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

উপরন্তু বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, একথা যখনই বলা হয় তখনই স্বীকার করা হয় যে বাক্য ও তত্ত্ব ভিন্ন। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে বাক্য ও তত্ত্বের প্রতিবিম্ব রূপ সম্বন্ধ কোনও বাক্যে প্রতিবিম্বিত হয় কি না। মনে করা যাক ক$_১$ এবং সেই বাক্যে খ$_১$ তত্ত্বটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখন, এই ক$_১$ ও খ$_১$ এর সম্বন্ধটি ; প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধটি বাক্যে প্রকাশ যোগ্য কি ? ভিংগেনষ্টাইন এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিয়াছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল মূলক্ষয়কারী অনবস্থা রোধ করা। এই প্রতিবিম্ব যদি ক$_১$ বাক্যে প্রতিবিম্বিত হয় বলে মনে করি, তাহলে আবার এই নূতন প্রতিবিম্ব প্রকাশের জন্য ক$_২$ বাক্যের প্রয়োজন হবে—সুতরাং ক$_৩$, ক$_৪$ প্রভৃতি বাক্যেরও প্রয়োজন হইবে, উদ্ভব হবে অনবস্থা নামক দুরবস্থার। তাই ভিয়েংগেনষ্টাইন বাক্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ যে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার ফলে সমগ্র ভাষার নৈয়ায়িক ব্যাকরণ নির্ণয় প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তত্ত্বের আকারই বাক্যের আকার। এই আকার যদি অব্যক্ত হয়, তাহলে ভাষা বিজ্ঞানে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করব (অন্ততঃ প্রাথমিক বাক্যের আকারগুলি) তা অব্যক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তত্ত্ব ও ভাষার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করাই উচিত। স্বীকার করা উচিত আমাদের কারবার ভাষা নিয়েই ; তত্ত্ব কোন আলোচনার বিষয় নয়।

অন্ততঃ ভাষা ও তত্ত্বের দ্বৈতভাব স্বীকার করলে স্বমাত্রবাদের (solipsism) হাত এড়ান সম্ভব হয় না। আমরা আগেই দেখেছি যে আদর্শ ভাষা পরমাণবিক এবং আণবিক বাক্যের একটি অশেষ সমাহার। আণবিক বাক্যের অর্থ নির্ভর করে পরমাণবিক বাক্যের উপর। আবার পরমাণবিক বাক্য ন্যায়সিদ্ধ ব্যক্তিবাচক নামে গঠিত। এই নামগুলির বাক্যের বাইরে কোন অর্থ নাই। তাদের কোন লক্ষণই দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আদর্শ ভাষা তত্ত্বের পরিণাম স্বমাত্রবাদ, যদিও স্বরূপে কোন আত্মা নাই। এই স্বমাত্রবাদের হাত এড়াতে হলে ভাষা এবং তত্ত্বের দ্বৈতভাব অস্বীকার করতে হয়। মনে রাখতে হয় যে বৈজ্ঞানিক সমাজের একটি

সমাজসিদ্ধ ভাষা আছে। এই ভাষা অবশ্যই যুগে যুগে বদলায় কিন্তু সে আলোচনা ঐতিহাসিকের, দার্শনিকের নয়। দার্শনিকের একটি সামাজিক, বৈজ্ঞানিক সমাজ-সিদ্ধ ভাষা আছে। পক্ষান্তরে, দর্শনে প্রথমেই সার্বজনীন ভাষা বলে একটি ভাষা অঙ্গীকার করে নিতে হয়। সার্বজনীন ভাষা বলতে বুঝতে হয় এমন ভাষা যাতে যা কিছু প্রকাশযোগ্য প্রকাশিত হতে পারে, অথবা সকল বক্তব্যই যাতে উক্ত হতে পারে। বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষাই এইরূপ ভাষা। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির নজীরে একথা অস্বীকার করতে চাইলে হবে না। কারণ, জড়জাগতিক নিয়ম হতে জীব বিজ্ঞানের সব নিয়ম লাভ করা যায় না, একথা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহলেও এই প্রতিজ্ঞার হানি হয় না। এই প্রতিজ্ঞা ঐ বিচারের ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় যদি কেবল এইটুকুই স্বীকার করা যায় যে জৈব-ঘটনার পদার্থবৈজ্ঞানিক ভাষায় বিবরণ দেওয়া সম্ভব, জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মূল প্রত্যয়গুলিকে অভিমৌল বিশ্লেষণের সাহায্যে পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ভাষায় অনুদিত করা যায়। মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কেও এই কথা। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষাকে সার্বজনীন ভাষা বলা যায়। একে ব্যক্তির অনুভবের, সরল অনুভবের প্রকাশ রূপ ভাষাও বলা যায়। তবে এ ভাবে এই ভাষার প্রকৃতি বর্ণনা করলে, অনুভবকে ভাষার লক্ষণ ঘটক করলে, স্বমাত্রবাদের হাত এড়ান শক্ত হয়। কারণাপ সরল অনুভব হতে আহার্য-বিশ্লেষণ (quasi-analysis) প্রভৃতির সাহায্যে সার্বজনীন জগৎ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপপত্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে খুব কৃতকার্য হতে পারেন নাই বলেও বটে, এবং অনুভবের আমদানি করলে ভাষা এবং তত্ত্বের দ্বৈতভাব স্বীকার করতে হয় বলেও বটে, এ পথ ত্যাগ করেছেন। তবে প্রোটোকল ভাষা স্বীকার করতেই হয়। এই ভাষা অন্য ভাষার উপর সাক্ষাৎ ভাবে নির্ভর করে না। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে করে। সার্বজনীন পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় একে অনুদিত করা যায়। এই ভাষাও সার্বজনীন ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্তির প্রকৃতি বর্ণনা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষা ঠিক প্রোটোকল ভাষা হতে লব্ধ নয়, তবে তার সঙ্গে এর একটি অতি কুটিল পথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় দুরকম বাক্য থাকে, সামান্য-লক্ষণ বাক্য এবং স্বলক্ষণ বাক্য। সামান্য-লক্ষণ বাক্য, নিয়ম বাক্য, সার্বিক বাক্য, এবং স্বলক্ষণ বাক্য ব্যক্তিবাচক বাক্য। সামান্য-লক্ষণ বাক্য অগণনামূলক সামান্য বাক্য, এবং স্বলক্ষণ বাক্যের সঙ্গে তুলনা করলে একে অনপেক্ষ

বাক্য না বলে প্রকল্প স্বরূপ বলতে হয়। তবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না। আমরা আশা করতে পারি না যে কোন সামান্য লক্ষণ বাক্যকে বিশ্লেষণরূপে গ্রহণ করতে সমীকরণ লিখন রীতিতে একে বাঁ দিকে স্থাপন করে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্য লিখে, এর যথার্থ অনুবাদ করতে পারব। সামান্য লক্ষণ বাক্য নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যের নৈয়ায়িক যোগফল (logical sum) অথবা নৈয়ায়িক গুণফল (logical product) নয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যে সামান্য লক্ষণ বাক্যকে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না। তবু সামান্য লক্ষণ যাচাই স্বলক্ষণ বাক্যের সাহায্যেই হয়ে থাকে। এবং কোনও বাক্যের পরীক্ষণ তত্ত্ব এবং তাৎপর্য তত্ত্ব ভিন্ন নয় বলে, সামান্য লক্ষণ বাক্যের তাৎপর্যও স্বলক্ষণ বাক্যেরই। সামান্য লক্ষণ বাক্যের সঙ্গে স্বলক্ষণ বাক্যের যেরূপ সম্বন্ধ, স্বলক্ষণ বাক্যের সঙ্গে প্রোটোকল বাক্যেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং বেশ কিছু সংখ্যক, পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বলক্ষণ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক বক্যে হতে, প্রোটোকল বাক্য লাভ করা যায়। এই পথকেই কারণাপ স্বমাত্রবাদের আক্রমণ হতে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ বলে মনে করেন। সুতরাং 'ক' বলে কোন পদার্থ-বৈজ্ঞানিক বাক্যকে আ বলে কোন ব্যক্তি যদি বাক্য পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী প্রোটোকল বাক্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তাহলেই তিনি যে বাক্যটি বোঝেন, তার তাৎপর্য টের পান, তার পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুভাবিক ফলাফল উপলব্ধি করেন, একথা বলা যায়। এবং যখন এমন নিয়মাবলী প্রণীত হয় যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অপরের প্রোটোকলে কোন বাক্যকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন, তখন পরস্পরের আদান-প্রদান লোক ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

যাই হক, বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, বাক্যকার বিশ্লেষণ পূর্বক তত্ত্বের আকার নির্ণয় করা, ইত্যাদি কথা নিষ্প্রমাণ। বাক্যজিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়। এমন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বাক্যজিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? এ কি বৃথা পরিশ্রম মাত্র নয়? বলা বাহুল্য এই প্রশ্নের পিছনে একটি মনোভাব কাজ করছে। প্রশ্নকর্তা ভাবছেন যে তত্ত্বজিজ্ঞাসাই যদি না হল, তাহলে বাক্যজিজ্ঞাসা অসার পণ্ডশ্রম মাত্র। এই মনোভাবই অশ্রদ্ধেয়। এ একেবারে সাবেকী পরা-বৈজ্ঞানিক মনোভাব। তাই বাক্যজিজ্ঞাসা সুরু করার সময়েই আমাদের অবহিত হতে হবে। আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে কোন জিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা না হলেও অসার প্রয়োজনহীন হয়ে যায় না। তারপর বাক্যজিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি তা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এইরূপ সংস্কৃত মন নিয়ে যখন প্রশ্নটি উত্থাপন করা

হয় তখন এর সদুত্তর পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কারণ প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানের শেষ নয়। এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে এক একটি ভাষা প্রস্থান। এই ভাষায় বহু বাক্য থাকে, এবং একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে থাকে। এই বাক্যগুলি সকলেই এক জাতীয় কি না, তাদের সকলের নৈয়ায়িক মর্যাদা সমান কি না, লৌকিক ভাষায় বাক্যসমূহের সহিত তাদের সম্বন্ধ কি প্রকার, বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভাষা কি বিভিন্ন, ইত্যাদি প্রশ্ন বিজ্ঞান আলোচনা কালেই উত্থাপিত হয়। এদের উত্থাপনের মূলে মননশীল সত্তাই কেবল নাই, বিজ্ঞানের স্বার্থও জড়িত হয়ে রয়েছে। এই সব প্রশ্ন আমরা তুলি, কিন্তু আমরা কেবল আমরা বলে, মননশীল ব্যক্তি বলে তুলি তা নয়। তা যদি হত, তাহলে ভাষা বশের বাইরে যাওয়ার জন্য যে সব উদ্ভট পরাবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জন্ম লাভ করে তারাও আমাদের মননশীল সত্তাকে নাড়া দেয় বলে, প্রকৃত প্রশ্নের মর্যাদা পেয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মননশীল না হলেই ঐ সব প্রশ্ন উঠত না, বিজ্ঞানও হত হত না, বিজ্ঞান বিষয়ক বিবেচনাও হত না। কিন্তু কেবল আমাদের মননশীল সত্তার উপরই ঐ সব প্রশ্ন নির্ভর করে না। ঐ সব প্রশ্নের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বার্থও জড়িত হয়ে রয়েছে। যেমন দেশ কাল প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে, গাণিতিক বাক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের অভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল; আইনষ্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানে যে নবযুগ এনেছেন, তা কেবল পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সূচনাই করে না, দার্শনিক সাফল্যেরও করে। তারপর বিভিন্ন জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন ভাষা প্রস্থান রচনা করে। এই ভাষা-প্রস্থানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ও বিজ্ঞানের স্বার্থেই প্রয়োজন। দর্শনকে অবহেলা করে প্রাচীন পদার্থ বিজ্ঞানে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান যতদিন না পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ততদিন স্বল্প জীবনই বহেছিল; কোন বৈজ্ঞানিক সাফল্য লাভ করতে পারে নাই। প্রাচীনকালের দার্শনিকরা 'নিরবধি বিরাট স্বরূপ যুগ যুগান্তের', এই প্রতিজ্ঞা করতেন; কিন্তু পালন করতে পারতেন না। কারণ দর্শন সম্পর্কে তথা বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন সুবিচারী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ছিল না। এখনও যে এই প্রতিজ্ঞা পালন করা যায় তা নয়। তবে এই প্রতিজ্ঞা পালনের পথে চলা যায় কি করলে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে তা বলা যায়। আমরা বিজ্ঞানের ঐক্য রচনা করবার জন্য এক বিজ্ঞানের নিয়মাবলী হতে, সুতরাং এক প্রকার পদার্থের নিয়ম নিয়ম হতে অন্যান্য বিজ্ঞানের স্বীকৃত নিয়মগুলিকে, সুতরাং সর্ব প্রকার পদার্থের

নিয়মকে অবরোহ প্রণালীতে লাভ করবার চেষ্টা করতে পারি। আগের দিনের জড়বাদীরা তাই করতেন। তাঁদের ব্যর্থতাই এই জাতীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত করে। মনের নিয়মকে প্রাণের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার, এবং প্রাণের নিয়মকে জড়ের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা অর্থহীন। এ পথে বিজ্ঞানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই কাজ করতে হলে সার্বজনীন ভাষা নির্মাণ করতে হবে। এই সার্বজনীন ভাষায় অভিমৌল বিশ্লেষণের সাহায্যে সকল বিজ্ঞানের বাক্যকেই অনূদিত করা যাবে। তেমনি, লৌকিক অনুভব এবং বিজ্ঞানের মধ্যেও কোন বিরোধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই লৌকিক ভাষাকেও অনূদিত করতে হবে সার্বজনীন ভাষায়। বাক্য বিশ্লেষণ অসার পণ্ডশ্রম মাত্র নয়। উপরন্তু যদি একবার ভেবে দেখা যায় যে বাক্য বিশ্লেষণের অভাবেই আমরা কথার জালে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ি এবং বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে নির্মাণ করি দর্শনের অচলায়তন, তখন এই বাক্য বিশ্লেষণের উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। সংক্ষেপে বাক্য জিজ্ঞাসা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নয়, কিন্তু সেই জন্য নিষ্ফল নয়। এর প্রথমতঃ একটি প্রতিষেধাত্মক মূল্য আছে—পরাবিজ্ঞান নামক মহামারী প্রতিষেধাত্মক মূল্য এর আছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিজ্ঞানের সঙ্গে সহজ অনুভবের এক বিজ্ঞানের সঙ্গে অপর বিজ্ঞানের, ব্যক্তি ভাষার সঙ্গে সার্বজনীন ভাষার সম্বন্ধ প্রদর্শক রূপেও এর অসাধারণ মূল্য রয়েছে।

এই হল বিশ্লেষণী দর্শনের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের দার্শনিকরা যে অনেক বিষয়ে প্রথম পর্বের দার্শনিকদের হতে ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তা আমরা দেখলাম। এখন, এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও, এই দুই পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য ছিল। উভয় পর্বের দার্শনিকরাই আটপৌরে ভাষাকে কোন আমল দিতে চাইতেন না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকদের আটপৌরে ভাষার বিরাগ আরও তীব্র ছিল। পরমাণুবাদীরা আটপৌরে ভাষা সম্পর্কে কেবল এই বলতেন যে এই ভাষা সংকুচিত সংকেত বহুল এবং এর ব্যাকরণ বিপথগামী। দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা একথা বলতেনই, তাঁরা এর আরও তীব্র সমালোচনা করতেন। প্রকৃত পক্ষে আরও তীব্র সমালোচনা না করে পরমাণুবাদীদের 'ওঁ স্বস্তি' বলে সম্মতি দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁরা পরমাণুবাদীদের মত ভাষার তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত করবার যোগ্যতায় বিশ্বাস করতেন না। এই পরমাণুবাদীরা যে বিবক্ষা নিয়ে উপরোক্ত অভিযোগ আনতেন, সেই বিবক্ষা তাঁদের হতে পারে না। তাঁরা ঐ অভিযোগের দ্বারা কেবল এই বুঝতে পারেন যে পরাবিজ্ঞান নামক অপ-বিজ্ঞান আটপৌরে ভাষার দোষে জন্ম গ্রহণ করেছে। আটপৌরে

ভাষাই পরাবিজ্ঞান নামক মনুষ্য জাতির অবৈধ সন্তানের জননী। কিন্তু আটপৌরে ভাষা যে ভুষ্ট, পরাবিজ্ঞান যে অবৈধ বিজ্ঞান, অন্ত্যজবিশেষ, এ কথার প্রমাণ কি? অবশ্য, পরাবিজ্ঞানের বিফলতা, অচলায়তন তুল্য অবস্থা, একটি প্রমাণ বটে। কিন্তু এই প্রমাণই যথেষ্ট নয়। কারণ যাকে আমরা অচলায়তন বলছি তা সত্যিই অচলায়তন কি না, এবং অচলায়তন হওয়াই দোষের কি না এই প্রশ্নের উত্তর কি? পরমাণুবাদীরা সাবেকী পরাবিজ্ঞান হেয়, এই কথা বলে ক্ষান্ত হন নাই। আটপৌরে ভাষা এর জননী, একথা বলেও হন নাই। তাঁরা আদর্শ ভাষা নির্মাণ করেছিলেন, দেখাতে চেয়েছিলেন যে এই ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, এবং আটপৌরে ভাষা এই ভাষা হতে যেখানে ভিন্ন সেখানে অনির্ভরযোগ্য। তাই পরমাণুবাদীরা যখন বলেছিলেন যে আটপৌরে ভাষা পরাবিজ্ঞানের জননী, তখন তাঁদের কথার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। প্রত্যক্ষবাদীরা পরমাণুবাদীদের মত তত্ত্বের কাঠামোর যুক্ত আদর্শ ভাষায় বিশ্বাস করতেন না। তাই পরমাণুবাদীদের মত আটপৌরে ভাষাকে তাঁরা নিন্দাও করতে পারেন না। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরাবিজ্ঞানের অনুপাদেয়ত্ব অনির্ভর অন্তর হেতুর সাহায্যে, আটপৌরে ভাষার অনুপাদেয়ত্ব তাঁরা সাধন করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁদের আটপৌরে ভাষা সমালোচনায় কিছু ফাঁক থেকে যাবেই।

প্রত্যক্ষবাদীরা এ বিষয়ে সচেতন। তাই আটপৌরে ভাষার তাঁরা আরও তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা দেখাতে চান যে আটপৌরে ভাষা একটি অক্ষর বিশেষ। এই ভাষায় বৈষয়িক ভাষা (object language) এবং বৈয়াকরণ ভাষার (syntax language) এর মধ্যে কোন ভেদ লক্ষ্য করা হয় না। বিষয়-ভঙ্গী রচনা শৈলী (material mode of expression) এবং আকারভঙ্গী রচনা শৈলী (formal mode of expression) মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা হয় না। সুতরাং ভাষার নৈয়ায়িক পারিপাট্যের আলোচনায়, এই ভাষা কোন সাহায্যই করতে পারে না। একটি বাক্যকে অপর বাক্যে পুনর্লিখনের ন্যায় নির্মাণে, সার্বজনীন ভাষা হতে একের প্রোটোকল বাক্যের অনুদনে, অথবা পরস্পরের প্রোটোকল বাক্যের অনুদনে, এই ভাষার উপর নির্ভর করা যায় না। তেমনি পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় জীববিজ্ঞানাদির পুনর্লিখনের স্থলেও এই ভাষা প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করে, অবশ্য সাহায্য করে না। বস্তুতঃ একটি বাক্য সত্য এই বাক্যের তাৎপর্য্য, সত্যতার লক্ষণ, আটপৌরে ভাষায় বলা যায় না। এমন কি আটপৌরে ভাষার ব্যাকরণ, নৈয়ায়িক ব্যাকরণ যদি আটপৌরে ভাষাতেই লেখার চেষ্টা করা

হয়, তাহলে বহুবিধ অনুপপত্তির উদ্ভব হয়। আটপৌরে ভাষার বাণীর মন্দিরে কোন স্থানই নাই, এ ভাষা অনুশীলনই নয়, অস্পৃশ্য, অশুচি।

দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও যে আটপৌরে ভাষাকে হেয় জ্ঞান করতেন তা দেখা গেল। তাই প্রথম পর্বের দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁদের যে কিছু মিলও আছে তা বোঝা গেল। এই মিল হতে আর একটি মিল চোখে পড়ে। স্বাভাবিক ভাষায় বিশ্বাসের ঐক্যও সূচিত করে। সুতরাং গাণিতিক ন্যায়, গণিতমূলক ব্যাকরণ শাসিত ভাষায় যে দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মত বিশ্বাস করতেন, তাও বোঝা যায়। বস্তুতঃ দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মত ভাষা যে ক্যালকুলাস বিশেষ এই মত স্বীকার করতেন। এইজন্য ভাষা যে বহু আণবিক এবং পরমাণবিক বাক্যের অশেষ সমাহার, এই মতও তাঁরা মানতেন, যদিও পরমাণবিক বাক্য বলতে পরমাণুবাদীরা যা বুঝতেন, তা তাঁরা বুঝতেন না। এমন কি 'পরমাণবিক বাক্য' শব্দটির ব্যবহারও তাঁরা সব সময় করতেন না, অনেক সময় এই শব্দটির ব্যবহারের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলতেন। তাঁদের প্রিয় শব্দ ছিল আদিম বাক্য (primitive statement), প্রোটোকল বাক্য, প্রভৃতি শব্দ। তবু একথা বলা যায় যে পরমাণবিক বাক্যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যদিও পরমাণবিক বাক্য বলতে পরমাণুবাদীরা যা বুঝতেন তাঁরা ঠিক তা বুঝতেন না। তারপর যে জাতীয় বাক্য* প্রথম পর্বে পরমাণবিক বাক্যের মর্যাদা লাভ করত, ঠিক সেই জাতীয় বাক্যই দ্বিতীয় পর্বেও প্রোটোকল বাক্যের মর্যাদা পেত। অবশ্য প্রথম পর্বে যেমন সাক্ষাৎকৃত হয় কিরূপ পদার্থ, এ নিয়ে, সুতরাং পরমাণবিক বাক্যের বৈচিত্র্য ও আকার নিয়ে মতভেদ ছিল, দ্বিতীয় পর্বেও ঠিক তেমনই প্রাথমিক বাক্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরাজ দার্শনিক মহলে হিউমের প্রত্যক্ষবাদ সম্মত কথাই অধিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, এবং সেইজন্য 'এই রক্ত' 'ওই পীত' আকারের বাক্যই অস্বীকৃত হয়েছিল প্রাথমিক বাক্যরূপে। কারণাপ ও এক সময় প্রোটোকল বাক্য বলতে এই জাতীয় বাক্যই বুঝতেন, এবং প্রোটোকল বাক্যের লক্ষণ নির্ণয় করতেন প্রাথমিক অনুভবের প্রকাশরূপ বাক্যরূপে। পরে, অনুভব, তত্ত্ব ও বাক্য, এই ভেদতত্ত্ব অস্বীকার করার পরে, তিনি প্রোটোকল বাক্যের লক্ষণকে আর অনুভব ঘটিত করেন নাই এবং প্রোটোকল বাক্য বলতে বুঝেছিলেন ব্যক্তির মৌহূর্তিক ভাষা। তবে, এই ভাষায় ঠিক আকারটি কেমন, এই আলোচনায় তেমন উৎসাহ দেখান নাই। বলেছিলেন যে ম্যাকের মতন যদি মানস পরমাণুবাদ (doctrine of elements) স্বীকার করি, তাহলে 'এই রক্ত',

'ওই পীত' ইত্যাদি আকারের বাক্যকেই প্রোটোকল বাক্য বলে মনে করতে হবে। কিন্তু যদি গেস্টাল্ট সম্প্রদায়ের কথা অস্বীকার করি, তাহলে, 'এমন একটি রক্তাকার বৃত্ত', 'ওই একটি ত্রিভুজাকার পীত' ইত্যাদি আকারের বাক্যকেই অঙ্গীকার করতে হবে প্রোটোকল বাক্যরূপে। এবং এই আলোচনা যে ভাষার ন্যায় রচনা নিপুণ দার্শনিকের আলোচনা নয়, মনোবিজ্ঞানীর আলোচনা, একথাও বলেছিলেন। যাই হোক, পরমাণবিক বাক্যে বিশ্বাস দ্বিতীয় পর্বে লুপ্ত হয় নাই। নূতন নামে থেকে গিয়েছিল।

প্রকৃত পক্ষে ভাষা ক্যালকুলাস বিশেষ সত্যতা-অপেক্ষক ন্যায় শাসিত, প্রভৃতি কথায় বিশ্বাস করলে প্রাথমিক বাক্য অঙ্গীকার করতেই হবে, যদিও প্রাথমিক বাক্যের প্রাথমিকত্বকে আপেক্ষিক মাত্র বলা যেতে পারে। ভাষা সত্যতা-অপেক্ষক ন্যায় শাসিত একথার অর্থ, একটি বাক্যের অপর বাক্য নির্ভরতা কেবল মাত্র তার আকার নির্ভর (বিষয় নির্ভর নয়)। যাই হক, প্রত্যক্ষবাদীরাও পোষাকী কৃত্রিম ভাষায়, সত্যতা-অপেক্ষক নীতিতে, প্রাথমিক এবং বিকৃত বাক্য দ্বৈবিধ্য, এবং অভিমৌল বিশ্লেষণে বিশ্বাস করতেন। তাই প্রত্যক্ষবাদ ও পরমাণুবাদের মধ্যে, দ্বিতীয় এবং প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে, তেমন কোন সুগভীর পার্থক্য ছিল না।

বিশ্লেষণী দর্শনে আরও কিছুদিন পরে এই পার্থক্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। গাণিতিক ন্যায় শাসিত ভাষায় অবিশ্বাস, অভিমৌল বিশ্লেষণে অবিশ্বাস, সুতরাং সত্যতা-অপেক্ষক নীতিতে, তথা সমীকরণ ভঙ্গিক বিশ্লেষণে অবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল। গাণিতিক ন্যায়ে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে দুটি দিক হতে এবং একটি সাধারণ ভাষার ন্যায়ের দিক হতে। প্রথম দিক হতে গোডেল কিছু অনুপত্তি দিয়েছেন, ব্রাউবের এক প্রকার অনুভববাদ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, এবং হিলবার্ট কাণ্টের মতবাদকে নূতন করে পরিবেশন করেছেন। এই আলোচনা গণিত শাস্ত্রের স্বার্থেই করা হয়েছে, এবং তার স্থানও গণিত দর্শনের আলোচনায়। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বের বিশ্লেষণী দর্শনের উদ্ভবে এই সব আলোচনার কোন সাক্ষাৎ প্রভাব ছিল না। তাই আমরা এদের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হই ; এবং সাধারণ ভাষার ন্যায়ের দিক হতে যে আপত্তি দেওয়া হয়েছে তারই কথা বলবার চেষ্টা করি।

আটপৌরে ভাষাকে পোষাকী ভাষায় অনূদন প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে আটপৌরে ভাষায় যে নৈয়ায়িক কারণগুলি আছে, তারা পোষাকী

ভাষার করণগুলির অনুরূপ পোষাকী ভাষার করণগুলি যে কাজ করে, তারাও সেই কাজই করে, অন্ততঃ পক্ষে করতে চায়। সুতরাং এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে পোষাকী ভাষা যে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে সেই কাজই স্থূল ভাবে, আংশিক ভাবে সম্পন্ন করে আটপৌরে ভাষা। এই দুইটি ভাষার পার্থক্য বিজাতীয় নয়, অঙ্কুর ও মহীরুহের, অপরিণত ও পরিণতের। কিন্তু বর্তমানে আটপৌরে ভাষা ন্যায়ের বহু আলোচনা হয়েছে, এবং দেখতে পাওয়া গেছে যে এই বিশ্বাস মূলহীন। সংক্ষেপে এই আলোচনার দু একটি কথা এখানে বলছি। আটপৌরে ভাষার 'এবং' এবং গাণিতিক ন্যায়ের '.', একই বলা যায় না। 'এবং' এমনও কাজ করে যা '.' করতে পারে না। যেমন 'এবং' এর সাহায্যে দুটি বিশেষ্যকে, অথবা দুটি বিশেষণকেও সংযুক্ত করা যায়; কিন্তু '.' এর দ্বারা কেবল মাত্র বাক্যকেই, অন্ততঃ পক্ষে বাক্যের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা খণ্ডকে সংযুক্ত করা যায়। 'যদু এবং মধু এসেছে',—বাক্যটি 'এবং' এর প্রথম প্রকার কার্যের দৃষ্টান্ত। 'যদু ধীরে ধীরে এবং ক্লান্ত ভাবে চলে গেল'—বাক্যটি দ্বিতীয় প্রকার কার্যের দৃষ্টান্ত। এই বাক্য দুটিকে যদি আমরা '.' এর সাহায্যে অনুবাদ করতে চাই তাহলে কি ভাবে অগ্রসর হব? অবশ্যই প্রথম বাক্যটিকে দুটি বাক্যের যোগফল বলে মনে করব, বলব, এই বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য হল, '"যদু এসেছে", "মধু এসেছে".' তেমনি দ্বিতীয় বাক্যটির সম্পর্কে বলব, '"যদু ধীরে ধীরে চলে গেল", "যদু ক্লান্তভাবে চলে গেল"'। এই অনুবাদে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না তা নয়, যদিও যৌগিক বিধেয় দেওয়াকে, এবং একই বিশেষ্যকে যৌগিক বিধেয় দেওয়াকে ভেঙে দুটি দুটি বাক্য করায় মন খুঁত খুঁত করে। এই খুঁত খুঁত ভাব আরও বেড়ে যায় যখন 'যদু এবং মধু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল' জাতীয় বাক্য নেওয়া হয়। এই বাক্যটিকে 'যদু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল', 'মধু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল', এই দুটি বাক্যে অনুবাদ করে '.' এর সাহায্যে সংযুক্ত করলে মন খুবই খুঁত খুঁত করতে থাকে। এই খুঁত খুঁতানি আপত্তিতে পরিণত হয়, যখন 'তাদের বিয়ে হল এবং একটি ছেলে হল' জাতীয় বাক্য নেওয়া হয়। '.' পৌর্বাপর্য সম্পর্কে উদাসীন, অনেক দার্শনিকের যেমন উত্তর পূর্ব জ্ঞান থাকে না, তেমনই। 'ক.খ' বাক্য এবং 'খ.ক' বাক্য, একই বাক্য, একটিকে অপরে অনূদিত করা যায়। কিন্তু 'তাদের বিয়ে হল এবং একটি ছেলে হল' জাতীয় বাক্যের 'এবং'কে এরূপ মনে করলে চলে না, হুঁকা বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। 'এবং'কে '.'এ অনূদিত করা যায় না।

'যদি—তাহলে', 'অথবা' সম্পর্কে একথা আরও বেশী করে খাটে। ষ্ট্রসন

প্রভৃতি লেখক এ নিয়ে এত বেশী আলোচনা করেছেন বিশেষ করে সাংকেতিক ন্যায়ের 'যদি-তাহলে'র অসম্ভব উদ্ভট সিদ্ধান্ত-জনকত্ব এমনই প্রসিদ্ধ, যে এই আলোচনা থেকে বিরত হচ্ছি। কেবল 'না' সম্পর্কে আটপৌরে ভাষার সাম্প্রতিক নৈয়ায়িকরা কোন আলোচনা করেন না বলে, অথবা 'না'কে যে '—' এ প্রায় সাফল্যের সঙ্গে অনুবাদ করা যায়, এমন মন্তব্য করেন বলে, দু এক কথা 'না' সম্পর্কে বলছি। আটপৌরে ভাষার 'না'-র তাৎপর্য পাশ্চাত্য ন্যায়ে—কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন ন্যায়েই ধরা পড়ে নাই ; অন্ততঃ 'না'-র যে অন্য প্রকার তাৎপর্য থাকতে পারে তা পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকরা লক্ষ্য করেন নাই। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবসর নাই। সংক্ষেপেই দু একটি কথা বলতে হবে। পাশ্চাত্য ন্যায়ে 'না'র আলোচনা দুটি প্রকরণে পাই, একটি নঞর্থক পদ (negative term) প্রকরণে, এবং আর একটি নঞর্থক বাক্য প্রকরণে। সাংকেতিক ন্যায়েও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এখানেও শ্রেণী ক্যালকুলাসে এবং বাক্য ক্যালকুলাসেই না-র আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা 'না'-র প্রকৃতি কতদূর ঠিক মত বুঝতে পারে, তা নিয়ে কোন বিচার করব না। কেবল এইটুকুই বলব যে 'না'-র অন্যরূপ আলোচনারও প্রয়োজন। অর্থাৎ বাক্যকে বাক্যরূপে না নিয়ে, কোনও বুদ্ধির প্রকাশ রূপেও নেওয়া যায়। এই দিক হতে বিবেচনা করলে, 'না', 'নাই' প্রভৃতি ঘটিত বাক্যকে এক প্রকার বুদ্ধির প্রকাশক বলেই বুঝতে হয়। ভারতীয় দর্শনে এই বুদ্ধিকে অভাব বুদ্ধি, নাস্তি বুদ্ধি বলে। এই বুদ্ধি অধিকরণ বুদ্ধি সাপেক্ষ। তাই পদ প্রকরণে আলোচিত 'না' এই বুদ্ধির বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি শব্দের একটি সাদৃশ্য না-ঘট, না-পট, সংক্ষেপে পাশ্চাত্য ন্যায়ের not-Aর সঙ্গে আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য কৃত্রিম, একান্ত বাহ্য। ভারতীয় দর্শনে ঘটাভাব বলতে নিরালম্ব কোন কিছুকে বোঝা হয় না। বোঝা হয় ভূতলে ঘটাভাব, অথবা, ঘটাভাববান্ ভূতলকে। তারপর not-A সহজ বাক্যে উদ্দেশ্য হয় না, বিধেয়ই হয়ে থাকে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে,—ইংরাজী বাক্য, There is not pot in the ground, এই বাক্যটিকেই যদি সহজবাক্য বলা হয়, এবং The ground possesses absence of pot, এই বাক্যটিকেই যদি একটু অসহজ বলে মনে করা হয়, এবং তারপর তাদের অনুবাদ করা হয়, ভূতলে ঘটনাস্তি, ঘটাভাব বিশিষ্টে বা, এবং ঘটাভাববদ্ ভূতল, এই বাক্য দুটিতে,—ঘটাভাবই সহজ বাক্যস্থলে জ্ঞানীয় বিশেষ্য রূপে কাজ করে, এবং অসহজ বাক্যস্থলে কাজ করে প্রকাররূপে। যাই হোক ভারতীয় দর্শনে যে অভাবের কথা বলা হয়, এবং আটপৌরে ভাষার 'না',

'নাই' যে অভাববুদ্ধি অন্ততঃ অনেক সময় প্রকাশ করে, সেই অভাববুদ্ধি অধিকরণ বুদ্ধি সাপেক্ষ। পদ প্রকরণে আলোচিত 'না', শ্রেণী ক্যাল্কুলাসের 'না', আর ভারতীয় দর্শনের সুতরাং আটপৌরে ভাষায় সময় সময় ব্যবহৃত 'না', এক 'না' নয়। বাক্য প্রকরণের 'না' সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। 'S is not P', 'ক খ নহে' বাক্যটি ভারতীয় নৈয়ায়িকের চোখে এক প্রকার অভাব বুদ্ধি প্রকাশক বাক্য। এই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। এই বাক্যের বিশ্লেষণ যে হেতু ক খ ভেদবান অথবা খ ক ভেদবান, অথবা ক ভেদ খয়ে আছে অথবা খ ভেদ করে আছে, সেই হেতু অধিকরণ বুদ্ধিও এখানে কাজ করছে। উপরন্তু ধর্মীয় অন্যোন্যাভাব এবং ধর্মের অত্যন্তাভাব সমনিয়ত হয়, সুতরাং এদের এক বলে মনে করা যায়। তাই অন্যোন্যাভাব বুদ্ধি প্রসঙ্গেও অধিকরণ বুদ্ধি অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ 'ক খ নহে' বাক্যের বিশ্লেষণে এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। তারপর অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাবও অভাব। ভূতলে ঘট নাই, প্রভৃতি বাক্যকে অনুরূপ অভাববুদ্ধি প্রকাশক বাক্যরূপে নিতে হয়। উপরে যে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাবের সমনিয়তত্বের কথা বলা হয়েছে, তার সাহায্যে এই অভাবকে অন্যোন্যাভাবে পর্যবসিত করা যাবে না। কারণ বাক্যের বিবক্ষা এই নয় যে ভূতল ও ঘটত্ব ধর্মের ধর্মী ভিন্ন। এই বাক্যের বিবক্ষা, ঘটত্ব ধর্মের ধর্মী ভূতলে নাই। যাই হক 'ভূতলে ঘট নাই', জাতীয় বাক্যের 'নাই' পাশ্চাত্য ন্যায়ে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণের মতো যাঁরা proposition অথবা statement-এর ন্যায় নির্মাণ করেছেন, এবং যাদের ন্যায়ে হওয়ার কথা ছিল, তাদের ন্যায়েও হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পাশ্চাত্য বীজগণিতের বিয়োগ চিহ্ন সংক্রান্ত পূর্ব স্বীকৃতিই, অর্থাৎ একটি বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত সংখ্যার সঙ্গে আর একটি বিয়োগ চিহ্ন সংখ্যার গুণ করলে, একটি যোগ চিহ্ন সংখ্যা গুণফল হিসাবে লাভ করা যায়, এই পূর্ব স্বীকৃতিই, পাশ্চাত্য ন্যায়ে বিনা বিশ্লেষণে গৃহীত হয়েছে। তাই অভাবের অভাব যে সর্বদাই ভাব পদার্থ, 'না' ঘটিত বাক্যের নিষেধ করলে সবই ঠিক থাকে, কেবল 'না'-টি খসে যায়—প্রভৃতি তত্ত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে। এতে বিচারসহ কোন কাজ করা হয়েছে কি না, এ আলোচনা এখানে করা যেতে পারে না। এখানে কেবল এইটুকুই বলা হয় যে ভারতীয় দর্শনে এই তত্ত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ তত্ত্ব নয়। ভারতীয় দর্শনের অনেকে অভাবের অভাব যে প্রতিযোগী স্বরূপ, (যদি অভাবের অভাব, অভাবের অভাবের অভাব না হয়) একথা অস্বীকার করেছেন। অনেকে অভাবের অভাবকে প্রতিযোগী স্বরূপ বলে

মনে করলেও অব্যাপ্যবৃত্তি প্রতিযোগিক অভাবের অভাব, যেমন কপি সংযোগাভাবের অভাব যে প্রতিযোগী স্বরূপ, একথা স্বীকার করেন নাই। তারপর অনেকে কোন কোন অভাব যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয় একথা স্বীকার করেছেন। বাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবও অনেকে মেনেছেন। তারপর, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাবও তাঁরা অনেকেই অঙ্গীকার করেছেন, এবং অভাবীয় প্রতিযোগিতা যে ধর্মবিধায় এবং সম্বন্ধ বিধায় অবচ্ছেদকের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয় এই মন্তব্য করেছেন। এখন, এই সব কথাই যে গ্রাহ্য তা নয়—কিন্তু তারা কেউই অনুভব সম্বন্ধ রহিত কথা নয়। সব কথার পশ্চাতেই যে অনুভব রয়েছে, একথা যারা এই কথাগুলি মানেন তাঁরা মনে করে থাকেন। আবার এই অনুভব যেহেতু কোন অলৌকিক অনুভব নয়, এই অনুভবের প্রকাশ যে আটপৌরে ভাষার 'না', 'নাই' প্রকৃতিতে হয়ে থাকে, একথাও তাঁরা ভাবতে পারেন। পক্ষান্তরে, আটপৌরে ভাষার 'না' এর এমনও বিশ্লেষণ সম্ভব, যার সাহায্যে এই সব কথায় পৌছানো যায়। পাশ্চাত্য ন্যায়, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেউই এই বিশ্লেষণ করে নাই। তাই, পাশ্চাত্যের সাধারণ ন্যায়ের 'না' এবং সাংকেতিক ন্যায়ের '—', এর কেউই আটপৌরে ভাষার 'না' নয়, অন্ততঃ পক্ষে তার যোগ্য পূর্ণ প্রতিনিধি নয়। অতএব, এই মন্তব্য এখানে করা যায় যে গাণিতিক ন্যায়ের '—' আটপৌরে ভাষার 'না' অনুবাদনে অসমর্থ।

(ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about the newspaper **Darsan** *to be published in the first Issue every year after the last day of February.*

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly.
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
5.	Editor's Name	Sri Kali Krishna Bannerjee
	Nationality	Indian
	Address	Flat No. 16, Block K, C. I. T. Buildings, Cristopher Road, Cal-14
6.	Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total Capital.	Bangiya Darsan Parisad 20/2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particular given above are true to the best of my knowledge and behalf.

Dated 14th September, 1961

K. C. Gupta
Signature of Publisher

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—টা.১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্ম প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে (ফ্ল্যাট নং ১৬, ব্লক 'কে', সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪)। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্ম নিম্নঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্
২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

PUBLISHED BY K. C. GUPTA, M. A. FROM 20-2, HALDER BAGAN LANE,
CALCUTTA AND PRINTED BY SRI RAMRANJAN DAS,
SRIHARI ART PRESS, 1, HARITAKI BAGAN LANE,
CALCUTTA—6.
15th September, 1961—200.

৩৸ 1SC

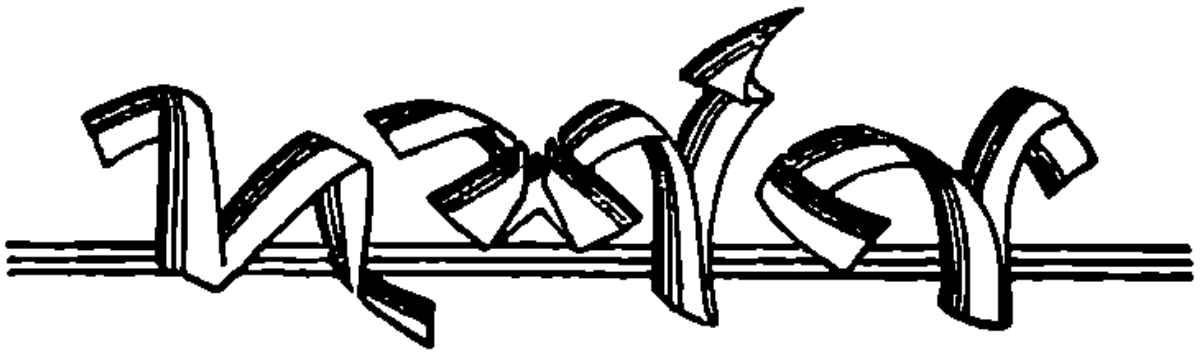

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্তিক [১৩৬৭ সন

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

মূল্য ১'২৫ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্তিক [১৩৮৭ সাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	দর্শন ও বিজ্ঞান	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
২।	চেতন মনের চিত্র	শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়	১১
৩।	মঙ্গলময় ও অমঙ্গল	শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
৪।	দার্শনিক যুগের মূল্য ধারণা	শ্রীসুধীর কুমার নন্দী	২৫
৫।	সমার্থতা ও লক্ষণবাক্য	শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী	১

দর্শন ও বিজ্ঞান

শ্রীঅতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপকতাভেদে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে, যথা প্রাকৃত বা সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান (Common sense), বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের জ্ঞান (Science) এবং দার্শনিক পর্যায়ের জ্ঞান (Philosophy)। ইহাদের মধ্যে প্রাকৃত জ্ঞান (commonsense knowledge) সর্বনিম্ন স্তরের। ইহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জাত, অসম্বদ্ধ ও অব্যাপক জ্ঞান। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে জীবজগৎ যেরূপ প্রতিভাত হয় আমরা কোনো বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া তাহা সেইরূপ বুঝি এবং তাহাই তাহার তাত্ত্বিক বা যথার্থ রূপ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সাধারণতঃ বলি 'সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়'। এই ধারণাটি প্রাকৃত জ্ঞানের উদাহরণ। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিকট সূর্য গতিশীল, এবং উহার গতি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি সত্য হইলে বিভিন্ন দেশে দিবা রাত্রের ক্রম ও স্থিতিকাল অনুরূপ হইত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃত জ্ঞানগুলি সুসম্বদ্ধ নহে, একটির সহিত অন্যগুলির মিল নাই, সম্বন্ধও ঠিকভাবে অবধারিত নহে। এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং কখন কখন পরস্পর বিরুদ্ধও দেখা যায়। এজন্য এগুলির ব্যাপকতাও খুব কম। ইহারা সর্ব দেশে, সর্ব কালে ও সর্ব লোকের নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কাজেই ইহাদিগকে লোক বিশেষের, দেশ বা কাল বিশেষের জন্য সত্য বলিতে হয়, ইহাদিগকে সর্বব্যাপী বা সার্বত্রিক বলা যায় না। প্রাকৃত-জ্ঞান-মূলক দর্শনে (Philosophy of commonsense) ঐরূপ সত্যকে

অসংখ্য স্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টিমাত্র বলিয়া গ্রহণ ও বিশ্বাস করা হয়। জীবজগৎ বহুধা বিভক্ত, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যাপক মিলনসূত্র নাই। এজন্য জীব জগতের সমুদয় পদার্থ এক কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া প্রাকৃত দার্শনিক বিশ্বাস করেন না, অথবা কোন একটি দ্রব্য বা ঘটনা হইতে অন্যান্য সব দ্রব্য বা ঘটনা যে বুঝা বা অনুমান করা যাইতে পারে তাহা স্বীকার করেন না। প্রাকৃত বা সাধারণ জ্ঞান এবং দর্শন কোন ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কৃত জ্ঞান ও দর্শন নহে। উহা যুগ যুগ ধরিয়া ব্যক্তি বিশেষের অজ্ঞাতসারে কোন এক সমাজে বা দেশে গড়িয়া উঠে এবং বংশপরম্পরাগত সম্পত্তিরূপে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা প্রাপ্ত হয়েন।

অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (scientific knowledge) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে প্রাপ্ত, সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপকতর জ্ঞান। প্রাকৃত জ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূলেই আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করি এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানের বিশেষ পরীক্ষা বা বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান (observation or experience) নিপুণ ও নিখুঁতভাবে পাইবার চেষ্টা করেন এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার (experiment) সাহায্যে তাহাদের এবং নিজ অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এ জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমরা জগতের বা প্রকৃতির (nature) বস্তু নিচয় ও ঘটনাবলী সঠিকভাবে দেখিবার এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। তারপর প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের আলোকে এ সব বস্তুর ও ঘটনার একটি যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি এবং এ ব্যাখ্যা (explanation) সঠিক কিনা তাহাও নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি। প্রাকৃতিক পদার্থের (natural things and events) ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক তাহাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ ও অন্যান্য সাধারণ নিয়মগুলি (causal laws etc) আবিষ্কার করেন এবং এ সব নিয়মানুসারে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উৎপত্তি-স্থিতি লয় হয় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এজন্য আমরা ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তি প্রয়োগ অনুমানের (induction and deduction) সাহায্য গ্রহণ করি। মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে যে কারণ বা নিয়ম মানিলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা হয় তাহার কল্পনাও করিতে হয়। কারণ কোন বস্তুর সম্ভাব্য হেতু বা কারণ অন্য অমুক দ্রব্য বা ঘটনা হইবে এরূপ একটি আন্দাজ বা কল্পনা না করিলে আমরা কোন্ দিকে তার কারণ অনুসন্ধান করিব তার হদিস অর্থাৎ নির্দেশ নাই। এরূপ কল্পনাকে উপপাদক কল্পনা (hypothesis) বলা যায়। তারপর সেই কল্পিত উপপাদক যে যথার্থ কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; ইহাকে উপপাদক

কল্পনা পরীক্ষা (Proof of an hypothesis) বলা যায়। যদি এইরূপ সতর্কতার সহিত আমরা প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন রকম বা শ্রেণীর পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি তবে তাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আর একটি লক্ষণ হইতেছে যে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞানকে সম্বন্ধযুক্ত বা সুসম্বদ্ধ করিতে হইবে, যেন তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ না হয় এবং একটি জ্ঞান বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে অন্য জ্ঞান বা নিয়মগুলি পাওয়া যায়। এরূপ করিতে পারিলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগুলিকে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বলিব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই অর্থে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান এবং এই কারণে প্রাকৃত জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপকতর জ্ঞান। অর্থাৎ উহা প্রায় সব দেশ কাল ও লোকে সত্য হইবে। দৃষ্টান্তরূপ টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদ ও কাপোর্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের কথা বলিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আদিত্যাদি গ্রহ ঘুরিতেছে, দ্বিতীয় মত হইতেছে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহ ঘুরিতেছে। প্রথম মত গ্রহণ করিলে আমরা পৃথিবীর সব দেশের ও সব অবস্থার ও সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে পারি না, এক বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিষয়ের জ্ঞানের বিরোধ হয় এবং অন্যান্য ব্যাঘাতও ঘটে। কোপোর্নিকাসের মতে এরূপ ব্যাঘাত ঘটে না, পক্ষান্তরে পার্থিব ব্যাপারের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা করা যায়। এ জন্য তাঁহার মতই এখন লোকে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবর্তনশীল, সব সময়েই উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি (scientific truths) শাশ্বত, অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় নহে। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে একপ্রকার দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকে বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific Philosophy) বলা হয়। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির (Scientific Method) প্রয়োগ করা হয়। অধুনা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির (Scientific method in philosophy) বহুল প্রচার ও সমাদর দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন যে ইহার দ্বারা দর্শন শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করা যাইতে পারিবে।

পার্থিব বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সব বিজ্ঞানকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়, যথা বিষয়বস্তু হিসাবে আর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হিসাবে। বিষয়বস্তু হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যায়: (১) জড় বিজ্ঞান (Physical science)। ইহার মধ্যে পদার্থ বিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), ভূবিদ্যা (Geology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি

বিজ্ঞান পড়িবে। (২) প্রাণ-বিজ্ঞান (Biological sciences), যথা উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Zoology) ইত্যাদি। (৩) সমাজ বিজ্ঞান,—যথা মনোবিজ্ঞান, (Psychology), নীতি বিজ্ঞান (Ethics), অর্থশাস্ত্র (Economics) রাজনীতি (Politics) সৌন্দর্য বিজ্ঞান (Aesthetics) ইত্যাদি। (৪) চিন্তার-আকার-বিষয়ক বিজ্ঞান (Formal sciences), যথা—ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। এগুলিতে আমরা বাহ্য বা আন্তর দ্রব্য বা বিষয়ের কথা ভাবি না, কিন্তু ঐ বিষয়গুলি জানিবার বা অনুমান করিবার সময় আমাদের চিন্তার কি রূপ বা আকার হওয়া উচিত, অর্থাৎ কি প্রকার হইলে তাহা সত্য ও যথার্থ হইবে তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি।

প্রয়োজন হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা বর্ণনা-মূলক ও আদর্শ মূলক (Descriptive and Normative sciences)। উপরি লিখিত প্রায় সকল বিজ্ঞানই বর্ণনামূলক ; কারণ উহারা জ্ঞানের বিষয়গুলির বিবরণ মাত্র দেয়। পক্ষান্তরে ন্যায়শাস্ত্র (Logic), নীতিশাস্ত্র (Ethics), সৌন্দর্য বিজ্ঞান (Aesthetics), ইত্যাদি আদর্শমূলক, কারণ উহারা একটি না একটি আদর্শ (Ideal) স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা নিজ নিজ বিষয়ের মূল্য (values) নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে।

এই সব বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে উহারা বস্তু সত্তার বাহ্য রূপ (Phenomena) লইয়া আলোচনা করে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক বিভাগের বা এক এক জাতীয় বস্তুর আলোচনায় বা জ্ঞানার্জনে নিবদ্ধ এবং কেহ অন্য কাহারও বিষয় লইয়া বিচার করে না। তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে এবং কোন কোন বিষয়ে মতেরও মিল আছে।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে দর্শন। বিজ্ঞানগুলির কয়েকটি লক্ষণ আছে যাহা হইতে স্বভাবতঃই দার্শনিক চিন্তা ও গবেষণার উন্মেষ হইবে। প্রথমে দেখা যায় বিজ্ঞানগুলি কয়েকটি তথ্য অবিচারিতভাবে মানিয়া বা স্বীকার করিয়া লয়। আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যে জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ ইহা বৈজ্ঞানিক মানিয়া লন। কোনও প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত করেন না। বৈজ্ঞানিক আরও মানিয়া লন যে প্রাকৃতিক বস্তু নিচয় কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারণ বিনা কোন কার্য্য হয় না, সব বস্তুরই কারণ আছে এবং সব বস্তুই পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ ও তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এ সব তথ্য না মানিলে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান চর্চা চলে না, এগুলি অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু অপ্রমাণিত বিশ্বাসমাত্র (unproved assumptious)। দর্শনশাস্ত্রে এগুলির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হয়, কারণ মানুষের প্রজ্ঞা প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কোন মত বা প্রত্যয় গ্রহণ করিতে রাজী নয় এবং তাহা করিতে হইলে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়।

তারপর দেখা যায় বিজ্ঞানগুলির সব সময়েই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটিতেছে। কোন বিজ্ঞানই চিরকাল একভাবে থাকে না। উহারা নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছে এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রকৃতির যে সব সাধারণ নিয়মানুসারে সেগুলি হইতেছে তাহা নির্ণয় করে। এইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞান ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে। এস্থলে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির একটা সমন্বয় সাধন করিবার জন্য কোন সর্ব্বব্যাপক বা ব্যাপকতম সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। এসব সর্ব্বব্যাপক সিদ্ধান্তকেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা দার্শনিক সত্য বলা হয়।

আর একটা কথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খণ্ড জ্ঞান (selective)। এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক ভাগ বা অংশ লইয়া আলোচনা করে। আবার যে বিজ্ঞান যে ভাগের আলোচনা করে তাহারও সব বিষয়ের ও ব্যাপারের অনুসন্ধান করে না। যেমন জড় বিজ্ঞান (physical science) জড় পদার্থ এবং উহার গঠন ও শক্তির পরিণামাদি লইয়া বিচার করে। জড় জগতের অন্যান্য বিষয় যথা রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি আলোচনা করে না। তারপর প্রাণ বিজ্ঞান প্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির আলোচনা করে, জড় বা মন সম্বন্ধে কোন গবেষণা করে না। অবশ্য প্রকৃতিকে ভাগ করিয়া তাহার কোন বিশেষ ভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবজগৎ কোনরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর-দ্বারা বিভক্ত নহে। ইহার একাংশ অন্য সব অংশের সহিত জড়িত এবং একটিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে অন্যগুলিকেও জানিতে হয়। কাজেই বলিতে হয় বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান জীবজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ণ বা খণ্ড জ্ঞান। মানব মন এরূপ খণ্ড জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আমাদের বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বিশ্বের সব কিছু জানিতে চায়, সব কিছু বুঝিতে চায়। আমরা বিশ্বের পূর্ণ জ্ঞান লাভের প্রয়াসী। অতএব বিশ্বের পূর্ণ জ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলির সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, আর সেই সামগ্রিক জ্ঞানের নামই দর্শন।

দর্শনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি বা রূপান্তর বলিলে উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এই মত অনুসারে কোন কোন দার্শনিক দর্শনকে

বিজ্ঞান সমূহের সমন্বয় শাস্ত্র (synthesis of the sciences) বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তরূপ আমরা এখানে ভুণ্ট (Wundt) প্রদত্ত দর্শনের লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন 'দর্শন সেই সর্বব্যাপী বিজ্ঞান (universal science) যাহাতে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞান সমূহের মিলনে একটি সুসংগত মতবাদ স্থাপন করা হয় (Philosophy is the universal science which has to uuite the cognitious attainted by the particular sciences iuto a consistent system)। হার্বার্ট স্পেনসারের মতেও 'দর্শন সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান (completely unified knowledge), দর্শনের ব্যাপক সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান সমূহের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগুলি অন্তর্ভুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় (the geueralisation of philosophy comprehend and consolidate the widest generalisations of science)। কিন্তু এ মত গ্রহণীয় নহে। এরূপ হইলে দর্শন বিজ্ঞান সমূহের সত্য বা সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি বা যোগফলমাত্র হইয়া পড়িবে। এবং তাহার কোনো বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না। তারপর সর্ব বিজ্ঞানের সব সিদ্ধান্ত জানা যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কেন না অতীত ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি জানা সম্ভব হইলেও ভবিষ্যত কালে যে সব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইবে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা এমন কিছু জানিতে পারি না। শেষ কথা দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টিমাত্র হয়, তবে বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক সত্য ও তত্ত্বগুলিরও পরিবর্তন ও বর্জন হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিত্য ও শাশ্বত বলিয়াই আমরা স্বীকার করি।

আধুনিক কালে নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (neo-realist) কোন কোন দার্শনিক বলেন দর্শন বিজ্ঞান সমূহের সমষ্টি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলির বিচার মূলক জ্ঞান (critical study of the fundameutal categories of science)। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রত্যেক বিজ্ঞান কতকগুলি তত্ত্ব বিচার না করিয়া মানিয়া লয়, কারণ এগুলি স্বীকার না করিলে বৈজ্ঞানিক আলোচনাই চলে না। এই তত্ত্বগুলি সর্বগত এবং জাগতিক সকল বস্তুরই সাধারণ ও সর্ব্বব্যাপী ধর্ম (pervasive characters)। এরূপ তত্ত্ব হইল দ্রব্যত্ব, একত্ব, দেশ, কাল, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে কোন বস্তুর কথা বলা যাক না কেন তাহা দেশ ও কালে অবস্থিত এবং তাহা একটি দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম এবং তাহার সহিত অন্য বস্তুর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞান এইগুলির তত্ত্ব বা স্বরূপ নির্ধারণ করে না। দর্শনে এগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশ, কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি

স্বরূপতঃ কি তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির বাহ্যরূপ বা বৃত্তি বিশেষের (specific functions) আলোচনা করিলেও সাধারণতঃ তাহাদের স্বরূপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। দর্শন শাস্ত্রেই আমরা বিচার করিয়া দেখি দেশ, কাল প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিষয়গত সত্তা (independent objective reality) আছে, না উহারা কেবল জ্ঞানগত ভাব বা আকার মাত্র subjective ideas or forms)। ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক ও বিচার দ্বারা (Logical analysis and criticism) এসব তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণটিও দোষমুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আর তাহার মূলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। দর্শন বলিতে যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য থাকে না এবং দর্শনকে একটি পৃথক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা থাকে না। বিজ্ঞান মাত্রই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করে। ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রণালীর সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্ব-গুলি সমর্থিত হয়। বিজ্ঞানের দুইটি দিক আছে। একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দ্রব্য নিচয়ের জ্ঞান লাভ করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (natural laws) আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। এটাকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক (practical) দিক বলা যাইতে পারে এবং সে সব বিজ্ঞানে শুধু এই দিকটিই আছে তাহাদিগকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান (applied science) বলে। অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তত্ত্বগুলি সমর্থন যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য এই বিচার ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতেই করিতে হয়। এটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের (theoretical or logical) দিক বলা যাইতে পারে। এখন, বিজ্ঞান যদি প্রামাণ্যের দিক দিয়া তাহার অপর তত্ত্বগুলির ন্যায় মূল-তত্ত্বগুলিও বিচার দ্বারা সমর্থন করে তবে আর দর্শনের প্রয়োজন কি? বস্তুতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানে জড়তত্ত্ব (matter), দেশ, কাল (space, time) প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা কতকটা ফলবতীও হইতেছে। এরূপ স্থলে দর্শনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না। এইজন্যই বোধহয় কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বর্তমান কালে দর্শন নাম পরিত্যাগ করিয়া ন্যায় সম্মত দৃষ্টবাদের (logical positivism) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকিবে না এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও (predication) করিয়াছেন। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির সত্যাসত্য বা স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞানের অপর তত্ত্বগুলিও দর্শনশাস্ত্র দ্বারা নিপাত হইতে পারে

এবং বিজ্ঞানের পৃথক সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু থাকে না। ফলকথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা বৈজ্ঞানেরই কাজ, সে জন্য দর্শন নামে পৃথক শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান সে প্রণালীতে তাহার অপ্রধান বা বিশেষ তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রণালী দ্বারা তাহার প্রধান বা মূল ও সাধারণ তত্ত্বগুলি কেন নির্ণয় করিতে পারিবে না তাহা বুঝা যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত না হইলে দর্শন তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে তাহাও সহজবোধ্য নহে। অন্যক্ষেত্রে দার্শনিক মত গ্রহণযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দেশ কাল ও জড়তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে যে মত পোষণ করা হয় তাহা আধুনিক বিজ্ঞান হইতেই লওয়া হইয়াছে মনে হয়। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের বিচার শাস্ত্র (critical study of the foundations of science) বলিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বলা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া যে সব দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞানের রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়াছেন তাঁহাদের মত যে গ্রহণীয় নহে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কারণ এরূপ বলিলে দর্শন বিজ্ঞানেই পর্যবসিত হয় এবং উহাদের কোন পার্থক্যও থাকে না, আর যাহাদের পার্থক্য নাই তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা ঠিক ভাবে বলা চলে না। বরং বিজ্ঞানকেই দর্শনের আসনে বসাইয়া দর্শনকে নির্বাসিত করা বা চিরতরে বিদায় দেওয়া দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন হইবে। কিন্তু আমরা এর কোনটাই করিতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানকে দর্শনের স্থান দেওয়া যায় না, আর দর্শনকে পরিত্যাগ করাও যায় না। অতএব আমাদিগকে অন্যভাবে উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

দর্শনের লক্ষণ নির্দেশ করিতে আমরা বলিতে পারি যে দর্শন সকল বিষয়ের বা জীব-জগতের তত্ত্ব ও অবভাস, স্বরূপ ও আপেক্ষিক রূপ, বাহ্য ও আন্তর সত্তা (phenomena and noumena) এতদুভয়ের আলোচনা করে এবং বিচারপূর্বক তাহাদের জ্ঞান লাভ করিবার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে। এরূপ হইলে দর্শন ও বিজ্ঞানকে পরস্পর নির্ভরশীল (interdependent), সহযোগী ও পরস্পরের পরিপূরক (complimentary) শাস্ত্র বলিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞান আমাদের যে জ্ঞান দেয় তাহা বস্তুনিচয়ের বাহ্যরূপ (phenomana) বিষয়ক, অর্থাৎ উহা প্রাকৃতিক জগতের এবং আমাদের মন বা আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ ধর্ম ক্রিয়া

ও অবস্থার (perceptible experiencible or empirical states and processes) পরিচয় দেয়। এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শন ও দর্শনকে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কারণ দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ (sensible word) সম্বন্ধে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই দার্শনিকের জ্ঞান অপেক্ষা ঠিক, সুসম্বদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য। এদিক দিয়া বলিতে হয় দর্শনকে বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে।

কিন্তু বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহাতেই সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদেরও প্রাকৃতিক জীব-জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের (reality or noumena) এবং উহাদের তাৎপর্য (rsignificance), উদ্দেশ্য (purpose), স্বাভাবিক কর্ম ও চরম লক্ষ্য (function and destiny) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোক বা জ্ঞান দিতে পারে না। তারপর বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, ইহাদ্বারা আমরা বিশেষ বিভিন্ন বিভাগের (different departments of the world) পৃথকভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক জ্ঞান বা ধারণায় (conception of the world as a whole) উপনীত হইতে পারি না। এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। দর্শনেই এসব বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার করা হয় এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায়। এদিক দিয়া বলা যায় বিজ্ঞানকে দর্শনের সহায়তা লইতে হইবে এবং উহা দর্শনের উপর নির্ভর করে।

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। কোন লোকের আভ্যন্তরিক বা মানসিক অবস্থা জানিতে হইলে আমরা তাহার দৈহিক অবস্থা কথাবার্তা, আচরণ ইত্যাদি (অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশগুলি) দেখি এবং তাহা হইতেই বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (intellect or reason) সাহায্যে তাহার মানসিক অবস্থা জানি। তেমনি জীব-জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্ব প্রকাশক পরিদৃশ্যমান বস্তু নিচয়ের (pheuomena) যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তাহা হইলে প্রজ্ঞার সাহায্যে তত্ত্ব ও তত্ত্বার্থ জানিতে হইবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে (sense experience) প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হইতেই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যাইবে।

আবার পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য এবং সে সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা পাইতে হইলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যগুলির দার্শনিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা আবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে আমরা তত্ত্বার্থ এবং জীব-জগতের সামগ্রিক রূপের জ্ঞান লাভ করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক, দর্শনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান (পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের জ্ঞান) বিজ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার বিজ্ঞানে যে জ্ঞানের (অর্থাৎ তত্ত্বার্থ জ্ঞানের) অভাব আছে তাহা দর্শনেই পাওয়া যায়।

একটি অন্যটির অভাব পূরণ করিলে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিব। এজন্য কখন কখন দর্শনকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের এবং তন্মূলক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা ও তাৎপর্য—ব্যাখ্যা বলা হয় (Philosophy is the criticism of experience, or rational interpretation of scientific knowledge)।

সাধারণ দৃষ্টিতে চেতন মনের চিত্র

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধটি ওয়াশিংটনে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দর্শন মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে A commonsense view of consciousness নামক পঠিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।]

মানুষ চেতনশীল প্রাণী। তাহার মন হইতেছে তাহার চেতনার আধার বা উৎস। চেতনযুক্ত মনের সাহায্যে মানুষ তাহার জ্ঞানকে অর্জন ও ধারণ করে। মানুষের চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট হইতেছে এই যে সে ইহার সাহায্যে শুধু যে বহুবিধ বিষয় ও বস্তুকে জানে তাহা নয়, উপরন্তু সে জানে যে সে জানে। অর্থাৎ মানুষের শুধু জ্ঞান হয় তাহা নয়, তাহার জ্ঞানের জ্ঞানও হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের জ্ঞান যদি সম্ভব না হইত তবে আমরা এরকম কথা বলিতেই পারিতাম না যে "রামকে সংবাদ আমিই দিয়াছি" বা "বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শ্যামের সঙ্গে আমি দেখা করিতে পারি নাই।" এই রকম দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা সহজেই বুঝান যায় যে অনেক সময় আমরা আমাদের নিজের নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্রষ্টা হই এবং আমরা যে জানিতেছি তাহা জানিতে পারি। আমাদের এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে অনেক সময় সাক্ষ্য দিতে পারি। ভিন্ন ভাষায়, নিজের মনের দর্শক হইবার মত ক্ষমতা কম বেশি সকল মানুষেরই আছে এবং এই ক্ষমতার সাহায্যে আমরা আমাদের "মনের দিকে" তাকাই এবং সেখানে যে ভাবের স্রোত বা মনশ্চিত্রের আনাগোনা চলিতেছে তাহা জানিতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের মনে যাহা ঘটে বা ঘটিতেছে তাহাকে অপরের জ্ঞানের গোচরে আনিতে হইলে আমরা ভাষার সাহায্য লই। ভাষাই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ভাব বা জ্ঞানের আদানপ্রদানের অন্যতম যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যেকে কেবল মাত্র নিজের মনের খবর প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে। আমরা যেভাবে নিজের "মনের দিকে" তাকাই সেভাবে অপরের মনের দিকে তাকাইতে পারি না। ভিন্ন ভাষায় আমরা অন্যের মনে "প্রবেশ" করিতে পারি না। ইহার অর্থ এই নয় যে আমাদের ভাব বা জ্ঞান অপর কেহ জানিতে পারে না, বা অপরকে তার অংশ দেওয়া

যায় না। বহুবিধ উপায়ে আমরা আমাদের ভাব বা জ্ঞানকে প্রকাশ করি এবং অপরকে সে জ্ঞানের অংশীদার করি। যদিও জ্ঞান মনজাত, ইহা আমাদের মস্তিষ্ক, শিরা, স্নায়ু ও অন্যান্য দেহাংশের ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। ফলে জ্ঞানের সূচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং অপর কেহ তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেহ বাহিরের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত নয়। দেহের সঙ্গে তাহার নিকট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ও সেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বৃহত্তর জগতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, এবং দেহাশ্রিত মনজাত জ্ঞান, বহুবিধ উপায়ে অতি সহজেই বহির্জগতে প্রকাশ লাভ করে। সূচনায় যাহা আমার নিজস্ব, পরিশেষে তাহা অনেক সময় অন্যের হয়। কিন্তু সকল সময় তাহা হয় না।

কেন হয় না? যেহেতু আমার জ্ঞানকে প্রকাশ করা বা না করা কিছু পরিমাণে অন্ততঃ আমার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা থাকিলে আমার জ্ঞানকে আমি নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি। এরকম ক্ষমতা কম বেশি আমাদের প্রত্যেকের আছে। অবশ্য কেহই অন্তহীনভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। যে শিশু বা পাগল বা অন্যভাবে অপারগ তার এই ক্ষমতা অতি কম—প্রায় নাই বলিলেই চলে। অপরে অনায়াসে তার মনে "প্রবেশ" করিতে পারে, যদি না অন্য কোন বাধা থাকে। এখানে বাধা বলিতে আমরা এই জাতীয় বিষয় বুঝি যেমন ভাষা-ব্যবহারে শিশুর স্বাভাবিক অপারগতা, অশিক্ষিতের শব্দের পুঁজির অভাব, ইত্যাদি। অপরদিকে, যারা লেখক, বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাবীর, তাহাদের এই ক্ষমতা সাধারণ লোকের ক্ষমতা হইতে অনেক অধিক। রাজনীতিজ্ঞ বা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শেষের দলে পড়েন। ইহাদের অনেক সময় এই ক্ষমতায় এত বেশি দখল জন্মে যে একই কথাকে একই সময় ইহারা বলেন অথচ বলেন না। সাধারণ লোকেরা একদিকে শিশু প্রভৃতি ও অপরদিকে লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই দুই দলের মধ্যে পড়ে। তাহাদের জ্ঞানকে প্রকাশ বা গোপন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুদক্ষ উকিলের জেরায় পড়িলে ইহারা কদাচিৎ মনের কথা গোপন রাখিতে পারে। কিন্তু এই রকম লোকেরাও ইচ্ছা করিলে উকিল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হইতে না পারে এবং মনের কথা গোপন করিয়া রাখিলেও রাখিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায় যে মনের ভাবকে প্রকাশ করা বা না করা, অথবা সে ভাবকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষের আছে।

কিন্তু একটু আগেই বলিয়াছি যে কোন মানুষই অন্তহীনভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। এমন কি সুদক্ষ রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ব্যক্তিদেরও নিজেদের ভাবের উপর সম্পূর্ণ অধিকার নাই। অতি দক্ষ লেখকেরা বা চিন্তাবীরেরাও জানেন যে কিভাবে তাহাদের ভাবগুলি তাহাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। অতিজ্ঞ চিন্তাবীরও অতিকষ্টে এবং ধীরে ধীরে তাহার ভাবগুলিকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। কয়েকটি ভাবকে আয়ত্বে আনিয়া তাহাদের যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে না করিতে আরও অনেক ভাব তাহার মনের "কোণে ও মোড়ে" উঁকি মারিতে থাকে এবং তাহাদের ধরিতে না ধরিতে আরও আরও অনেক ভাব মনের মধ্যে আসিয়া ভীড় করে। ইহাদের সবগুলিকে সকল সময় ধরা যায় না। কতকগুলি ভাবের ভীড়ে হারাইয়া যায়, আবার কতকগুলিকে ধরিতে পারিলেও প্রকাশের উপযোগী করিয়া তুলা যায় না। গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এখন যে কথা বলিতে চাই তাহা হইতেছে এই যে, আমাদের মনে যে ভাবের আনাগোনা হয় তাহাদের সকল সময় ধরা বা প্রকাশ করা যায় না, এবং ফলে তাহাদের মারফৎ যদি আমরা আমাদের চেতন মনের কোন মানচিত্র পাইবার চেষ্টা করি, তবে সে চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষা হইতেছে আমাদের মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বা অবলম্বন। কিন্তু ভাব ও ভাষা জাতিগতভাবে পৃথক। সেজন্য ভাষা সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা সকল সময় ভাষাশ্রিত ভাবের সম্বন্ধে সত্য নাও হইতে পারে। এই সহজ কথাটার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার জন্য অনেক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিও মনে করেন যে ভাষা ও ভাষাশ্রিত ভাবের মধ্যে আবয়বিক সাদৃশ্য আছে। যেমন, আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগ "দেই" এবং ভিখারীকে ভিক্ষা "দেই"। এখানে এই দুই "দেই"তে ভাষাগত সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থগত সাদৃশ্য আদৌ নাই। এজন্য ভাষা বিশ্লেষণের দ্বারা মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র পাইবার চেষ্টা করিলে বহু অসুবিধা আছে। কয়েকটি অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ভাষা এক নয়, বহু। ইহার ফলে, একই ভাব ভিন্ন ভাষার মারফতে প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন বিষয়কে বুঝাইতে পারে; অপরদিকে বিভিন্নভাব বিভিন্ন ভাষার মারফৎ প্রকাশের জন্য একই ভাবকে বুঝাইতে পারে। যেমন "গম্ভীর" কথাটি; ইহা বাংলার যে অর্থে ব্যবহৃত হয় হিন্দীতে সকল সময় সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমরা যাহাকে বলি "গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা" হিন্দীতে তাহাকে অনেক সময় বলা হয়

"গম্ভীর আলোচনা"। এখানে "গুরুত্বপূর্ণ" ও "গম্ভীর"এর ভাবগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু ভাষাগত সাদৃশ্য নাই। অপরদিকে "গম্ভীর প্রকৃতি"র গম্ভীর ও "গম্ভীর আলোচনা"র গম্ভীরে এ ভাষাগত ঐক্য আছে কিন্তু ভাবগত ঐক্য নাই। ইহা ছাড়া, অনুবাদক ও দোভাষীগণ জানেন যে অনেক সময় একভাষার ভাব ঠিক যথাযথভাবে অপর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায়, এক ভাষার মারফৎ আমরা মনের যে চিত্র পাইব, অপর ভাষায় সেই মনের ঠিক সেই রকম চিত্র পাইব না।

ভাষা সম্বন্ধে আর একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে এমন অনেক বিষয় আছে যে যাহারা ভাবের বিষয়বস্তু হিসাবে এক ও অখণ্ড, কিন্তু ভাষা মারফৎ প্রকাশিত হইবার খণ্ডিত হইয়া যায়। যেমন একটি লাল বল দেখিয়া আমি বলিলাম 'বলটি লাল'। এখানে ভাবের বিষয়বস্তু হিসাবে বল ও তাহার বর্ণের মধ্যে কোন পৃথকত্ব নাই। আমার মনে বলের যে চিত্র পড়িয়াছে তাহাতে বল ও তাহার বর্ণ এক ও অখণ্ড ভাবে বর্তমান আছে। কিন্তু ভাষাতে বল ও বর্ণ পৃথক; কথ্য ভাষায় একটির পরে একটি আসিতেছে; লিখিয়া প্রকাশ করিতে গেলে দুইটি পৃথক স্থানে অবস্থান করিবে। অথচ মনোজগতে বল ও তাহার বর্ণের মধ্যে এইরূপ স্থান-কালের ব্যবধান নাই। সুতরাং ভাষা-বিশ্লেষণের মারফৎ মনের যে মানচিত্র আমরা পাইতে পারি, তাহা স্বভাবতই হইবে আংশিক, অপূর্ণ ও খণ্ডিত।

অবশ্য ভাষা ও ভাবের জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য আমরা ইহাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সংযোগ আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। বস্তুতঃ পূর্বেই বলিয়াছি যে ভাষাই ভাব প্রকাশের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। এজন্য আমাদের ভাষাকে ভাবোপযোগী করিবার জন্য আমরা ভাষার সংশোধন ও সংস্কার করি, নূতন শব্দ ও বাক্যাংশ গঠন করি, বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ ধার করি এবং অন্যান্য বহু প্রকারের চিহ্ন ও সংকেত সংগ্রহ করি। এইভাবে আমরা আমাদের ভাষাকে যতদূর সম্ভব ভাবের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করি। অপরদিকে, ভাবকেও আমরা ভাষানুরূপ করিবার চেষ্টা করি। এইভাবে ভাব ও ভাষা পরস্পরকে শোধন ও সংশোধন করিয়া নিজেদের অগ্রগতি অব্যহত রাখিয়াছে এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধশালী করিতেছে।

ভাষা সম্বন্ধে যাহা সত্য ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় সম্বন্ধেও তাহা সত্য। চিত্র, আলেখ্য, দৈহিক ভাবভঙ্গি ও নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক নিদর্শন ও আমাদের ভাব প্রকাশের উপায়। ইহা সকল সময় ভাষাগত বা ভাষাজাত নয় এবং সর্বদা ভাষার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অনেক সময় ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহা ইহাদের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। আবার অনেক সময় কোন বিষয় ভাষার

সাহায্যে যতটুকু ও যেভাবে প্রকাশ করা যায়, ইহাদের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অধিক ও অনেক সুষ্ঠুভাবে তাহা প্রকাশ করা যায়। এইভাবে এই সকল নির্ভাষিক ভাব প্রকাশের উপায়গুলি ভাষার কার্যকেও সম্পূরণ করে। যে কোন ছবির কথা ধরা যাউক। কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখিয়া আমরা সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারি তাহা বহু বিস্তারিত ভাষাবিবরণীর সাহায্যে কখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। অতএব ভাষাই আমাদের চিন্তার একমাত্র বাহন নয় এবং আমাদের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশও করিতে পারে না। মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র সেজন্য আমরা ভাষা-বিশ্লেষণের দ্বারা পাইতে পারি না। বরং ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন উপায় মারফৎ আমরা মনের সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিতে পারি তাহাদের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য আবিষ্কারের দ্বারা আমরা মনের আরও ব্যাপক ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাইতে পারি। কিন্তু সে চিত্রও মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র হইবে না, কারণ মনজাত বিষয়গুলিও তাহাদের প্রকাশের উপায়গুলি পরস্পর হইতে পৃথক এবং তাহাদের এই পার্থক্য বিজাতীয় পার্থক্য।

মঙ্গলময় এবং অমঙ্গল

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী—
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

বিংশশতাব্দীর বিশ্বকবির কণ্ঠেই শুধু নহে, যুগে যুগে বিশ্বপ্রেমিক, পরমধার্মিক, আস্তিক, নাস্তিক সকলের কণ্ঠেই এ ক্ষোভ, এ আর্তিধ্বনিত হইয়া উঠে। অনাচারীর অত্যাচার লাঞ্ছিত প্রেমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রু আমাদের কাতর করিয়া তুলে; মৃত্যুমুখী জোয়ানের মর্মন্তুদ ক্রন্দনে আমরা উচ্চকিত হই—'হে ঈশ্বর কতদিনে তোমার সন্তানেরা তোমার প্রতিনিধিকে স্বীকার করিয়া লইবে।···ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের চরম পরিণতিকে আমরা ব্যথিত বিস্ময়ে হতবাক হই। মানবের জরা ব্যাধি মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হইয়া রাজার দুলাল সংসার ত্যাগ করেন। এই অত্যাচার, এই অনাচার, এই অন্যায়, এই অজ্ঞান, মৃত্যুজরা ইহাই অমঙ্গল। ইহা মঙ্গলের অভাবমাত্র নহে—আরও কিছু—ইহা দুঃখের, ব্যথার, অনুতাপের পুঞ্জীভূত প্রকাশ। মঙ্গল যদি সত্য হয়—তবে অমঙ্গলও সত্য—একের স্বীকৃতিতেই অন্যের স্বীকৃতি। আর এই অমঙ্গলকে অস্বীকার করা বাস্তব বহুজনগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বিরোধী। বস্তুতঃ আমরা সকলেই জীবনে অমঙ্গল বা অকল্যাণকে স্বীকার করিয়া লই—আমরা জানি সুখ থাকিলে দুঃখও আছে, হাসি থাকিলে অশ্রুও আছে, পুষ্প থাকিলে কীটও আছে। সাধারণ জ্ঞানে ইহা কোনও সমস্যাও সৃষ্টি করে না। স্বভাববাদীর পক্ষে (Naturalist) ইহা ঘটনা বা বস্তু নিচয়ের মধ্যে একটা—ইহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—স্বীকার করায় কোনও দ্বন্দ্বও নাই। জড়বাদীর প্রকৃতি মঙ্গল-অমঙ্গল স্বীকার করে না—কারণ জড়ের প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ অবান্তর, মার্কসীয় দার্শনিকের জগতে মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত ঈশ্বরও শ্রেণী বিশেষের কপোলপ্রসূত উদ্দেশ্য শোষকের শোষণে ইহা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা। সকলপ্রকার ধর্মমতেও ইহা সমস্যা সৃষ্টি করে না।

আমরা সাধারণভাবে বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করি—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করি যে বিশেষ বিশেষ কল্যাণ বা অকল্যাণের সহিত বিশেষ দেবদেবী জড়িত। তাই আমরা বসন্তের প্রাদুর্ভাবে শীতলাদেবীর আরাধনা করি, কলেরা মহামারীতে মাতা রক্ষাকালীর শরণাপন্ন হই, দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া গ্রহরাজের স্তব করি। বহু ঈশ্বরবাদে অমঙ্গল সমস্যা নাই। এইরূপ মতবাদের দোষগুণ অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। দ্বিদেববাদেও অকল্যাণ সমস্যা আকারে দেখা দেয় না। প্রাচীন পারসিক মতে কল্যাণ এবং অকল্যাণের জন্য দুইটী পৃথক্ দেবের কল্পনা করা হয়—তাঁহারা সর্বদা যুধ্যমান—একের সাময়িক জয় বা পরাজয় কল্যাণের প্রাচুর্য বা অকল্যাণের প্রাদুর্ভাবের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এইরূপ ধর্ম মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ থাকিলেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাহার সহিত জড়িত নাই।

অমঙ্গল সমস্যা বিশেষ গুরুতরভাবে দেখা দেয় একপ্রকার একেশ্বরবাদে—যেখানে ধর্মের আরাধ্য ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্, মঙ্গলময়, প্রেমময় সৃষ্টিত্রাণ-সংহারকর্তা পরমপুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় স্রষ্টা হইলে তাঁহার রাজত্বে অমঙ্গল কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা এক সমস্যা। তখন এক প্রায় দুরতিক্রম্য উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি হয়—ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্, স্রষ্টা হন এবং তাঁহার সৃষ্টিতে অমঙ্গল থাকে, তবে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যায় না; আবার যদি তিনি মঙ্গলময় স্রষ্টা হ'ন এবং তাঁহার সৃষ্টিতে অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টা বলা যায় না। এই বিশেষ দৃষ্টিতেই আমরা এই সমস্যার আলোচনা করিব এবং বিচার করিয়া দেখিব কোনও সমাধান আছে কিনা।

এই সমস্যার উদ্ভব বা তাহার সমাধানের বিষয়ে আমাদের দুইটী বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যে ধর্মমতে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বা একাতীত ঈশ্বর স্বীকার করা হয় বা এক ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাহার এক বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেখানে এ সমস্যা নাই। দ্বিতীয়তঃ অমঙ্গলকে অস্বীকার করিয়া কোনও সমাধান দেওয়া চলে না—কারণ সেখানে সমস্যার উদ্ভব হয় না। আমাদের মতে ইহাকে সমস্যা বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ইহাকে সমস্যা হিসাবে স্বীকার করিলে ইহার অস্তিত্ব নস্যাৎ করা চলিবে না। কারণ অমঙ্গল কে অস্বীকার করিলে মঙ্গল কথার কোনও অর্থ থাকে না—আর ঈশ্বরকেও মঙ্গলময় বলা নিরর্থক হইয়া পড়ে। বুঝা যাইতেছে এখানে আমি ধর্ম কথাটী একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ধর্ম কথাটীর প্রত্যয়গত অর্থ যাহা ধারণ করে (ধৃ+মন্)। ইহা অত্যন্ত

ব্যাপক এবং হিন্দুধর্মে এই অর্থে ধর্মকথাটীর ব্যবহারও করা হইয়াছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ধর্ম কথাটীর সম্যক্ সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। (এ বিষয়ে দর্শন—১৩৬৬ সাল—৩য় সংখ্যায় সুধীজন কিছু আলোচনা করিয়াছেন—এপ্রসঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিতে প্রয়োজন বোধ করি না। তবে একথাও অবশ্য গ্রাহ্য যে ধর্মের মধ্যে মানবমন এক (বা একাধিক) অতীন্দ্রিয় শক্তির সন্ধান করে—এই শক্তিকে সে তাহার সকল আদর্শ-দ্বারা ভূষিত করে—তাহার মধ্যে নিজের অসহায়তা ঘুচাইয়া পরম নির্ভরতার আশ্বাস চায়। এই শক্তির উদ্দেশ্যেই তাহার যাগ, যজ্ঞ, পূজা, সেবা ইত্যাদি। মানবমন এই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে তাহার প্রতি উদাসীন বলিয়া ভাবিতে পারে না—এই শক্তি চিৎশক্তি এবং এই শক্তির অধিকারী পুরুষোত্তম ভগবান্ বা ঈশ্বর যিনি মানুষের প্রেম, ভক্তি, প্রার্থনা ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখেন। একেশ্বরবাদ ধর্মে এই ঈশ্বরই আমাদের আরাধ্য—তাঁহাকে মঙ্গলময়, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টা, ত্রাতা সংহারকর্তা বলিয়া না কল্পনা করিলে ধর্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সর্বগুণসম্পন্ন মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসই একেশ্বরবাদী ধর্মের মূল ভিত্তি। আর অমঙ্গলের সমস্যাও এখানে।

এইভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি স্থির করিলে দেখা যায় যে অনেক বিশেষ ধরণের একেশ্বরবাদের সমাধান এ সমস্যার যথাযথ সমাধান নহে। উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রবর স্পিনোজার দর্শনের কথা বলা যায়। স্পিনোজার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হইয়া থাকে (Pantheism) যদিও আমার মনে হয় স্পিনোজার দর্শনের এইরূপ পরিচয় সঙ্গত নহে। যাহা হউক, স্পিনোজার দর্শনে বলা হয় যে মূল সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাই ঈশ্বর—ইহাই স্রষ্টা—ইহাই সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির (সৃষ্ট বিশ্বাদি) মধ্যে পার্থক্য অযৌক্তিক। কারণ সৃষ্টির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলে স্রষ্টা সীমিত হ'ন—তাহাকে আর অদ্বিতীয়, অসীম মূল সত্তা বলা যায় না। কাজেই ঈশ্বরই বিশ্ব—বিশ্ব ঈশ্বরময়। বিচিত্র বস্তুসজ্জিত এ বিশ্বের পৃথক্ স্বীকৃতি যুক্তি বিরুদ্ধ। একই বহু—বহু একমাত্র। ইহা যেন জ্যামিতির একটী স্বতঃসিদ্ধ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্ত। সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ ভিন্ন ভাবিতে পারা যায় না—তাহারা স্বতঃসিদ্ধেরই বিকাশ মাত্র—তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না—অথচ শুধু স্বতঃসিদ্ধে যে বিস্তৃতি সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে যেন তদপেক্ষা অধিক বিস্তৃতির ঘোষণা হয়। বহুত্ব সম্বন্ধে স্পিনোজার এই মত দার্শনিকগণের বিশেষ মতভেদের আকর। একদিকে স্পিনোজা অদ্বৈত বেদান্তের মত সরাসরি বহুত্বকে ভ্রম

মাত্র বলেন না আবার রামানুজ দর্শনের মত বা হেগেলীয় দর্শনের মত এককে বহুর সমন্বয়ে গঠিত এক পরম সত্তাও বলেন না। সে যাহাই হউক, স্পিনোজার এই অদ্বিতীয় নির্গুন সত্তাকে (Reality) ধর্ম্মের আরাধ্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন করা যায় না। স্পিনোজার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ না বলিয়া পরব্রহ্মবাদ বলাটা অধিক সঙ্গত। কারণ ধর্ম্মের জন্য স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, ভক্ত এবং ভগবানের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য্য। কাজেই স্পিনোজার দর্শনে অমঙ্গল ভাব পদার্থ নহে—ইহা জ্ঞানের অভাবের দ্যোতক মাত্র—কারণ এক সত্তার মধ্যে মঙ্গল—অমঙ্গল বিভাগ অর্থহীন; এইরূপ সমাধান আমাদের মতে গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ ধর্ম্মের আরাধ্য মঙ্গলময় পুরুষোত্তম ঈশ্বরের অস্বীকৃতির সহিত অমঙ্গল সমস্যা ও উপেক্ষা করা হইয়াছে। আরও বলা যায় যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে যদিও এরূপ মতবাদ হয়তো দার্শনিক যুক্তির বিরোধী নহে। তবে এখানেও প্রশ্ন তোলা যায় যে জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞানের কারণ কি? ইহার সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা যথাযথ আলোচনা করিব।

দার্শনিক লাএব্‌নিৎস অমঙ্গল বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁহার এবং স্পিনোজার দর্শনের মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে লাএবনিৎসের মত বিচার করিলে দেখা যায় যে একদিক দিয়া তিনিও একবাদী বা একেশ্বরবাদী। এ দিক দিয়া বিচার করিলে ঈশ্বর মোনাড্‌ সমূহের স্রষ্টা। আবার অন্যদিক হইতে ঈশ্বর মোনাড্‌ সমূহের মধ্যে একটী মাত্র—এবং ইহা শ্রেষ্ঠ মোনাড্‌। ইহা কোনও রকমেই অন্যান্য মোনাডের স্রষ্টা নহে। এই মত পার্থক্যই লাএব্‌নিৎসের দর্শনের প্রধান দুর্বলতা। "God's relation to the system of Monads is not entirely clear. He is both the creator of the whole system of Monads and the chief Monad....." L. Shaw—Leibniz—P. 90). যাহা হউক, লাএব্‌নিৎসকে একেশ্বরবাদী হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল সমস্যা একটী বিশেষ সমস্যা। তিনিও ঈশ্বরকে বিশ্বনিদান এবং মঙ্গলময় বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে এই বিশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এখানে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের সর্ব্বাধিক প্রাচুর্য্য। কিন্তু অমঙ্গল আছেই এবং তাহার প্রয়োজনও আছে। যেমন একটি নাটকে নায়কের চরিত্র সম্যকরূপে বর্ণনা করার জন্য দুর্ব্বল বা দুবৃত্তের চরিত্রের সৃষ্টি প্রয়োজন হয়—তেমনই উৎকৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে অমঙ্গল প্রয়োজন। পাপ বা

নৈতিক অকল্যাণ মানবের ঐহিক স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ফল। লাএব্‌নিৎস বস্তু বা জীবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও স্বীকার করেন না আবার পূর্ণ নির্ভরতাও সমর্থন করেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মত বিশেষ অস্পষ্ট। যাহা হউক, পূর্ণ ঐহিক স্বাধীনতা স্বীকার করিলে নৈতিক অমঙ্গলের কারণ ব্যাখ্যা সহজ হয়, কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরকে আর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান বলা যায় না।

হেগেলীয় দর্শনে অমঙ্গলকে বিশ্বের বিবর্ত্তনের এক প্রয়োজনীয় অধ্যায়রূপে ধরা হয়। নৈতিক অকল্যাণ বা পাপের মাধ্যমে মানব ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শের দিকে নীত হয়। পরব্রহ্মে অবশ্য এই সব অসামঞ্জস্য নাই—ইহা সুসমন্বিত পরমসত্তা—ইহাতে ব্যক্তিসত্তা ও এক বিশেষরূপে অবস্থান করে। এখানে প্রথমতঃ বলা যায় যে পাপ যে সর্ব সময়ে মানবকে উচ্চতর মানবতার আদর্শে চালিত করে ইহা সত্য নহে। বাস্তব ঘটনার দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপ অকল্যাণ মাত্র—তাহাতে কল্যাণের শুভ ইঙ্গিত নাই। দ্বিতীয়তঃ হেগেলের পরব্রহ্মকে আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী ধর্মীয় ঈশ্বর বলা যায় না। কারণ ইহাতে ব্যক্তিসত্তার পরব্রহ্মের সহিত মিলনের যে আদর্শের কথাই ঘোষণা করা হউক না কেন, এরূপ মিলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না। সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াই এই মিলন লাভ করে। ধর্মের ভাষায় বলিতে গেলে এখানে ভক্ত নিঃশেষিত হইয়া যায় কাজেই ভগবানের পূজা আর সম্ভব হয় না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিনাশে কোনও ঈশ্বরবাদী ধর্ম গড়িয়া উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ এখানে অমঙ্গলকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয় নাই। ইহাকে বৃহত্তর কল্যাণের সোপানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু অকল্যাণকে অস্বীকার করিয়া কল্যাণের সত্যতা স্থাপন করা চলে না। বোসাঙ্কে এবং ব্র্যাড্‌লিও অকল্যাণ সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করেন। বোসাঙ্কে ত অকল্যাণকে স্বীকারই করিতে চান না। ইহা মঙ্গলেরই নামান্তর—স্থানচ্যুত মঙ্গল, (Evil is good in the wrong place)—The value and Destiny of the Individal. পরমসত্তায়—পরমকল্যাণে অমঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্র্যাড্‌লি এ বিষয়ে আলোচনায় তিন প্রকার অকল্যাণের কথা বলেন: (ক) দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি, (খ) হতাশা, ব্যর্থতা, (গ) অনাচার, ব্যাভিচার—পাপ। (ক) প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য এই যে দুঃখ কষ্ট আছে বটে তবে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা আর দুঃখ কষ্ট থাকে না। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও নাকি ইহার সাক্ষ্য দেয়। এখানে ব্র্যাড্‌লে যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। ("I should still believe that in the universe there is preponderence of pleasure."

It depends on general nature of reality). "Appearance and peatity. P. 175-176. আর তিনি যে সর্বায় অকল্যাণের অনস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা ধর্মীয় ঈশ্বর কিনা আমরা শীঘ্রই বিচার করিব। (খ) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে হতাশা অবিদ্যাসম্ভূত। যথার্থ নির্দ্ধারণের অভাবেই ব্যর্থতা আসে—কাজেই ইহা ভাব পদার্থ নহে। (গ) সম্পর্কে তিনি কিছু অসুবিধা স্বীকার করিলেও বলেন যে পাপ নৈতিক চেতনা উদ্ভূত এবং নৈতিকবোধই স্ববিরোধী। (Moral evil exists only in moral experience and that experience in its essence full of inconsistency Ibid. P. 178) পরমসত্তার সকল বিরোধের অবসান হয়—কাজেই সেখানে নৈতিক বিচ্যুতির প্রশ্ন নাই। এইভাবে অমঙ্গলকে অস্বীকার করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। আর বস্তুতঃ ব্র্যাড্‌লির পরব্রহ্ম ঈশ্বর নহেন—কারণ তাঁহাকে নৈতিক প্রেমময় পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিতে তিনি স্বীকৃত নন—কারণ তাহাতে বিরোধ দেখা দেয়। (The trouble [problem of evil] has come from the idea that the Absolute is a moral person. And if you start from that basis, then the relation of evil to the Absolute presents at once an irreducible dilemma. The problem then becomes insoluble....." P. 174). অতএব দেখা যাইতেছে ব্র্যাড্‌লি অমঙ্গলকেও স্বীকার করেন না আর ঈশ্বরকেও স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁহার কোনও সমস্যাই নাই।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বর অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরকে জাগতিক অকল্যাণের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য এখানে বলা হয় বিশ্ব সৃষ্টির ঈশ্বর ইহাকে গৌণ কারণ সমূহের নির্ভরশীল করাইয়াছেন, ঈশ্বর ঠিক যন্ত্রীর মত—অতি বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন যন্ত্রের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এ বিষয়ে প্রথমতঃ বলা যায় যে বিশেষ মুহূর্ত্তে সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক জটিলতা আছে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ মতবাদে মানবের পূর্ণ ঐচ্ছিক স্বাধীনতা স্বীকার করায় মানবই অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে ঈশ্বর মুক্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্ত প্রাণের পরম ভক্তির আসনও দাবী করিতে পারেন না। বিশ্বনিরপেক্ষ ঈশ্বর ধর্মের প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন না। অতএব অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের এ সমাধান গ্রহণযোগ্য নহে।

এই সকল আলোচনা হইতে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে ঈশ্বরকে এবং ধর্মকে স্বীকার করিলে, অমঙ্গল সমস্যা সহজে সমাধান করা যায় না—

একান্তই যায় কিনা তাহাই বিচার্য। আর ঈশ্বরকে দর্শনের পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিলে এ সমস্যাই থাকে না। আমরা একদিকে ঈশ্বরকে স্বীকার, অন্যদিকে অমঙ্গলকে অস্বীকার করিতে পারি না। অমঙ্গল সমূহকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) প্রাকৃতিক— যথা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি। (২) অতি-প্রাকৃত— মানবের সীমমতা, খর্বশক্তি ইত্যাদি। (৩) নৈতিক— অনাচার, পাপ ইত্যাদি। (১) প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ হয়ত প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত এবং ইহা হয়ত সর্বদা অকল্যাণ জাতকও নহে। অকল্যাণের পশ্চাতে কল্যাণ থাকে যেমন থাকে শীতের অবসানে বসন্তের আশ্বাস, বন্যার তাণ্ডবের অন্তে পলিমাটি সঞ্চিত উর্বর ভূমিতে সজীব শস্য প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল মঙ্গল হইয়া যায় না। এবং প্রাকৃতিক অকল্যাণের শেষ কারণ ঈশ্বর ইচ্ছা অস্বীকার করিলে প্রকৃতিকে স্বভাববাদীর মত স্বয়ংক্রিয় একটা সত্তা বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহাতে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না। আস্তিক ধর্মে সাধারণতঃই প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর জন্য মানবের অদৃষ্ট বা কর্মফলকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদে সাধারণভাবে বলা হয়—অদৃষ্ট অনুযায়ী ফল লাভ করার উপযোগী বিশেষ সৃষ্টি সর্বদাই করা থাকে— কাজেই হয় এই সকল অকল্যাণ প্রকৃত অকল্যাণ নহে— অজ্ঞান সঞ্জাত মাত্র অথবা তাহারা কৃতকর্মেরই ফল স্বরূপ। এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে আমাদের আরও একটি বাস্তব সাধারণ জ্ঞান বিরোধী কথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই যে তথাকথিত জড় এবং অজড় প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা নাই। জড় প্রকৃতির জড় মাত্র নহে—ইহা মানবের নৈতিক জগতের পটভূমিকা— নীতিবোধ ইহাকে সর্বথা পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। এভাবে দেখিলে (১) নং অকল্যাণ আর (৩) নং অকল্যাণ পৃথক্ থাকে না। (২) নং সম্বন্ধেও বলা চলে যে আমাদের ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা আমাদেরই অজ্ঞান জন্য। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আমাদের খণ্ডতাও দূরীভূত হয়। এরূপ সমাধানে শেষ পর্য্যন্ত নৈতিক অকল্যাণকে সর্ব অকল্যাণের কারণস্থল বলিয়া ধরা হয়। তাহাতে প্রশ্নের অবকাশ আছে। কিন্তু এরূপ মতবাদের আরও ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত এই যে অজ্ঞান—বিহীন আমরা অসীম, অখণ্ড—ইহাতে ঈশ্বরের সত্তা ব্যাহত হয়। কাজেই লাএবনিৎসের মত বলিতেই হইবে যে আমরা খণ্ড— এবং ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরকে অনন্ত, অসীম পূর্ণ হইতে হইলে আমাদিগকে শান্ত, সসীম, খণ্ড হইতেই হইবে। ধর্মের দিক্ হইতে এ বিভেদ স্বীকার একান্ত

প্রয়োজন। অতএব এই অকল্যাণকে অকল্যাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখন প্রশ্ন নৈতিক অকল্যাণের। তাহার জন্য ভারতীয় দর্শনে সাধারণভাবে অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে দায়ী করা হয়। এই অবিদ্যা আবার স্বকর্মফলজাত। ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টি তত্ত্বকে অনাদি বলা হয়— সেজন্য প্রথম অবিদ্যার জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে ফল-ভোগ করিতেই হয়—তাহাতে নিস্তার নাই। এইভাবে সকল অকল্যাণকে মানবের কর্মফল সঞ্জাত বলার সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—(ক) মানবের সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক স্বাধীনতা আছে এবং (খ) ঈশ্বরের কর্মফলকে বিনষ্ট করার শক্তি নাই। বলা যায় যে ইহা তাঁহার ঈপ্সিত অপূর্ণতা—কিন্তু তাহাতে তাঁহার অপূর্ণতা দূর হয় না। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরকে স্রষ্টা, নিয়ন্তা, মঙ্গলময়, সর্বশক্তি ও গুণের আকর অদৃষ্টের চালক বলা হইলেও অদৃষ্টের বা কর্মের একান্ত স্রষ্টা বলা হয় না। অদৃষ্টের বিধান অমোঘ—তাহাতে ঈশ্বরেরও হস্তক্ষেপ সম্ভব নহে। ঈশ্বরে এই অপূর্ণতা ভক্তপ্রাণে বিক্ষোভ জাগায়। "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ"—যুক্তির দৃষ্টিতে ইহা বৃথা স্তোক-বাক্য বলিয়া মনে হয়। যুক্তিতে ঈশ্বরকে পূর্ণ শক্তির আকর বলিলে অমঙ্গলের দায়িত্ব ও তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে হয়—তখন ঈশ্বর আর মঙ্গলময় থাকেন না—মঙ্গল—অমঙ্গল নিরপেক্ষ হইয়া যান। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক র‍্যাসডল্ ও এইরূপ অসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বলিয়াছেন যে শেষ পর্যন্ত ভগবানকে অকল্যাণের কারণ (অন্ততঃ আংশিক) না বলিয়া পারা যায় না—যদিও এইরূপ না বলিতে পারিলেই ভাল হয়। শঙ্কর বেদান্তেও একথা স্বীকার করা হয়—যে ঈশ্বর ও অমঙ্গল সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান নাই—এই জন্যই ঈশ্বরকেও শুধু ব্যবহারিক সত্তা মাত্র বলিতে হয়—ইহাকে পরম সত্তা বলা যায় না। পরমার্থিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্মই এক অদ্বিতীয়, সর্বগুণাতীত সত্তা—সেখানে মঙ্গল অমঙ্গল নাই, স্রষ্টা, সৃষ্টি নাই, ভক্ত-ভগবান নাই—কাজেই ধর্মও নাই, নীতিও নাই। ইহা যুক্তির শেষ কথা হইতে পারে কিন্তু ধর্মবোধের, হৃদয়ানুভূতির শেষ কথা নহে—এখানে ধর্মবোধ অপরিতৃপ্ত থাকে। কাজেই দেখা যায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্মকে স্বীকার করিলে—মঙ্গলময়ের সহিত অমঙ্গলের সম্পর্কের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একদিকে ন্যায়-বর্ণিত ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয় নতুবা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া ধর্মকে অস্বীকার করিতে হয়। রামানুজের মত মধ্য পন্থা অবলম্বন কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ তখন ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কের সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়

না। দুই যদি অভিন্ন হয়—অকল্যাণ থাকে না—কিন্তু ধর্ম্মও থাকে না—দুই যদি ভিন্ন হয়—ঈশ্বর সীমিত হন। একই সঙ্গে কিরূপে ভিন্ন এবং অভিন্ন হয়—তাহার প্রণিধান করা যায় না।

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মমত দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সে বিশ্বাস যে দার্শনিক যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত এমন ভাবিয়া লওয়ার কারণ নাই। ধর্মমতে আমরা ঈশ্বরকে আদর্শরূপে মানি। গুপ্ত পর্বত সঙ্কুল ভয়ঙ্কর জলরাশির মধ্যে তিনি আলোক স্তম্ভ স্বরূপ—তিনি আমাদের বিপদের সঙ্কেত করেন—গন্তব্যের নির্দেশ দান করেন, দুর্গম যাত্রাকে তাঁহার আদর্শের দ্বারা মধুর করিয়া তুলার প্রয়াস পান। তিনি এই পথ সুগম করিয়া তুলিতে পারেন না—যুক্তিবিদের এ বাক্য সত্য হইলেও ধর্মবিশ্বাসে বাধা পড়ে না। ধর্মে এক বিরাট আশাবাদের ভিত্তি আছে—যাহার হয়ত দার্শনিক, যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। সোপেনহাওয়ারের ক্ষোদক্তি হয়ত সত্য—কিন্তু ধার্মিকের ধর্মবুদ্ধি তাহাতে নষ্ট হয় না। কাজেই মনে হয় এ বিষয় দার্শনিক প্রবর কাণ্টের মতই গ্রাহ্য—ধর্ম যুক্তির বাহিরে—ইহা বিশ্বাসের বস্তু। যাহা হউক উপসংহারে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে ধর্মের জন্য ভক্ত এবং ভগবানের বিভেদ স্বীকার করিতে হয়—এবং এরূপ স্বীকৃতিতে ঈশ্বরের পূর্ণতা ব্যাহত হয়। কাজেই ঈশ্বর মঙ্গলময় হইলেও সর্বশক্তিমান্ নহেন। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কে বিষয়ে ধর্মমত গ্রাহ্য কোনও সন্তোষজনক দার্শনিক সমাধান সম্ভব হইলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব, নতুবা নহে।

দার্শনিক মূরের মূল্য ধারণা *

[ডক্টর সুধীর কুমার নন্দী]

বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ভাববাদী ভাব ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করলেন ব্রিটিশ বাস্তববাদীদের অগ্রগণ্য দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মূর। তিনি তার একখানি গ্রন্থের উপসংহারে বললেন, যে কাজকে আমরা ভালো কাজ বলি তার মধ্যে এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে যা কেবল মাত্র মানুষের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং মন্দ কাজ কখনই তা উপস্থিত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজটা করা হয়েছে সেই অবস্থায় অনুরূপ অন্যকোন কাজ করে কৃত কর্মের চেয়ে অধিকতর শুভ ফললাভ করা যেত না। তৃতীয়তঃ কৃত কর্মের ফলকে যদি ভাল বলি তাহলে তার অনুরূপ সমস্ত কার্যকেই ভালো বলব এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্মটীকে পৃথক ক'রে দেখব এবং ঐ মন্দ কর্মকে এবং তার অনুরূপ বা স্বধর্মবিশিষ্ট সমস্ত কর্মকেই নিকৃষ্ট বলে মনে করব।

মূর বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্যটী নিয়ে আলোচনা করা যাক। যাকে আমরা ভালো কাজ বলছি সেই কাজের বা যে কোন কাজের তিনটী অঙ্গকে আমরা নির্দেশ করতে পারি: উদ্দেশ্যাঙ্গ (Intention বা motive) প্রক্রিয়া এবং ফল। এখন মনে করা যায় যে আলোচ্য কর্মটীর উদ্দেশ্যাঙ্গ শুভ বলে তাকে ভালো কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় যে দূর প্রসারী দুরূহ বিতর্কের সৃষ্টি হবে তা হ'লো কাজটীকে ভালো বলছি উদ্দেশ্যই শুভ বলে না কর্মফল কল্যাণকর ব'লে। সেটীকে এড়িয়ে গেলেও আমরা মূর প্রদর্শিত আলোচনার সরনি বেয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। কেননা ঐ উদ্দেশ্যটী শুভ হলেও এবং ভালো কাজের লক্ষণ হিসেবে এই শুভ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করলেও মূর নির্দ্দিষ্ট প্রথম তত্ত্বটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় না। কেননা এমন কথা বলা চলে না যে শুভ উদ্দেশ্যটীর আশ্রয় কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই। অশুভ কর্মের পিছনে শুভ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এমন কথা কেবল মাত্র তখনই বলা চলে যখন আমরা বলব যে কাজের

১। Ethics পৃঃ ১৪০

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন পঠিত।

আত্যন্তিক মূল্য বিচার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য দিয়েই সাধিত করতে হবে। শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নির্ভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা দুরূহ হ'য়ে পড়ে, কেননা উদ্দেশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি নির্ভর ; তাই মূর কর্মের মূল্যবিচারে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার এই না গ্রহণ করার ফলে উপরি বর্ণিত শুভকর্মের প্রথম লক্ষণটি কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেণ। অভিজ্ঞতা বলে যে এখন বহু কর্ম নিত্য সংসারে সঙ্ঘটিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ হলেও তার ফল অকল্যাণকর হয়েছে। সুতরাং যদি একথা বলা হয় ভালো কর্মের মধ্যে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে যা কেবল মাত্র ভালো কর্মের মধ্যেই থাকবে এবং যা মন্দ কর্মের মধ্যে থাকবে না তা'হলে একথা অসংসয়ে বলা চলে যে সেই গুণটি কর্মের উদ্দেশ্য আশ্রয়ী নয়। তবে সেই গুণটি কী প্রক্রিয়া আশ্রয়টি ? কর্মের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে যাকে এমন কথাও বলা চলে না। প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য এক থাকা সত্ত্বেও দুটী বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ফল লাভ করি এবং একটা কর্মকে শুভ এবং অন্য আর একটি কর্মকে অশুভ বলি। বহুশ্রুত গ্রাম্য গোপিকাসকের গল্প স্মরণ করুন ; প্রথম দিনে আনীত গরুটির ফোলা গলাতে হাতুড়ির আঘাত দেওয়ায় ব্যাধিমুক্ত হইল আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আঘাত করায় গরুটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিয়া উভয় কর্মের অঙ্গ। প্রথম কাজটাকে ভালো এবং দ্বিতীয় কাজটাকে মন্দ বললে আমরা সেক্ষেত্রে ফল দ্বারাই কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া একান্তভাবে সমধর্মী। পরিবেশ ভেদে অবস্থা ভেদে একই প্রক্রিয়া দুই বিভিন্ন ধরণের ফল প্রসব করেছে। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি প্রক্রিয়ার উপরেও প্রযোজ্য হয় না। এবার ফলাফলের কথায় আসা যাক। শুভ ফলপ্রসূ হ'লে কি কর্মকে আমরা 'শুভ' আখ্যা দিই। তা আমরা সাধারণতঃ দিই না। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে। অর্থাৎ যে কাজ ভালো ফল দিল সেই কাজই 'ভালো' এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল সেই কাজই 'মন্দ'। তবে এখানেও আর একটা বড় প্রশ্ন উঠবে। সে প্রশ্নটা হ'ল কাকে ফল দিল ? যদি কর্মকর্তার ভালো মন্দটুকুই কর্মের লক্ষ্য হয় তা হ'লে আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদী হ'য়ে পড়ছি। ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি এই মত বাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। আবার যদি মনে করা যায় যে এই ফল বিস্তার হবে কর্মকর্তার কল্যানের দিকে লক্ষ্য না রেখে, কেবল মাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এর বিচার হবে তা হলে আমরা কর্মকর্তানিরপেক্ষ সুখবাদী (Altruistic hedonist) হ'য়ে

পড়ছি। তার বিরুদ্ধে ও অনেক আপত্তি আছে। এতদুভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের কার্য বা মঙ্গলকে যুক্তিসিদ্ধ (rational) করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাগ্রারবিদ কথিত Philosoplical anarchism বা দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের ধারণা এই মানুষের শুভশুভের Rationalism এর ওপর নির্ভরশীল। এই আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের মধ্যে সীমারেখা টেনে কাজের ফলদ্বারা তার ভাল মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচার পুঁথিগত হয়ে পড়বে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই বলিলেই চলে। কেননা একই কাজের ফল আমার কাছে নন্দ হ'তে পারে আবার তা অনেক জনের কাছেই ভালো হতে পারে। এইক্ষেত্রে মূর কথিত প্রয়োজন সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে না। আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের সমন্বয় প্রসঙ্গে

মূর বলেছেন: "I think therefore, we must conclude that a maximum of true good, for ourselves, is by no means always secured by those actions which are necessary to secure a maximum of true good for the world as a whole; আত্মকর্মের সঙ্গে পর কর্মের সমন্বয় ঘটানো সহজসাধ্য নয়; যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের কল্যাণের সঙ্গে আত্মকর্মের সমন্বয় ঘটবে কী না এ সম্বন্ধে মূর সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মস্বার্থ অথবা সামগ্রিক স্বার্থসাধনের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে রায় দান সম্ভব নয়। তবে কখন কী অবস্থায় আমি আত্মস্বার্থ অথবা পরস্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে কাজ করব সেটা হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বা প্রয়োজন সাধনের প্রশ্ন (practical importance)। মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা এই আত্মস্বার্থ পরস্বার্থের দ্বন্দ্ববিরোধের নিরসন করতে পারব না। মনে করা যাক সমানভাবে ধর্মপরায়ণ দুটি ব্যক্তির কথা, ক এবং খ; জগতের কল্যাণের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন; খ তাঁর পুত্রকলত্রের কথা চিন্তা ক'রে, নিজের কথা চিন্তা ক'রে দেশের কল্যাণে দশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলেন না। কর্তব্যকর্মের আহবানে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ করা উচিত ছিল। প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ক যে অত্যান্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে অর্জন করলেন খ কী আরো ত্রিশ বৎসর বেঁচে থেকে নানান সৎকর্ম ক'রেও তা অর্জন করতে পারবেন? যাঁরা আত্মস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব মনে করেন তাঁরা বলবেন যে খ যতই ভালো কাজ করুন না কেন কোন দিনই তিনি অত্যান্তিক মূল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন না। এমন কথা সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত।

সুখবাদীরা সুখের পরিমাপে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী। মূর বলছেন যে বোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার সুখবাদীদের দেওয়া সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ সুখের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না: "If may therfore possibly be the case that quantity of pleasure is, as a matter of fact, a correct criteniou of right and wrong, even if iutriusic value is not always in proportion to quantity of pleasure contained." যদি আমরা এই সত্যটীকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই যে আত্যন্তিক মূল্য হল সুখের পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে যে সুখের পরিমাণের দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। মূর বলছেন যে সুখ-আত্যন্তিক মূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রবর্তনার এই Postulate টীকে জ্ঞাতসরে অথবা অজ্ঞাতসরে গ্রহণ করে তবেই না সুখের দ্বারা আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ করতে অগ্রসর হন। এই মূল্যায়ন চক্রকদোষদুষ্ট।

সুখ যেমন কোন কর্মের আত্যন্তিক মূল্যের যথাযথ নির্দ্ধারণে অপারগ তেমনি ভাবে কোন একটি উপাদান (Factor) এই আত্যন্তিক মূল্য নিরূপণে অক্ষম। মূরের নিজের কথাতেই বলি :

"We may, I think say, first of all, that for the same reason for which we have rejected the view that intrnsic value is always in proportion to quantity of pleasure, we must also reject the view that it is always in proportion to the quantity of any other single factor whatever". জ্ঞান, পুণ্য, পরজ্ঞান, প্রেম এরা কেউই এককভাবে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের উপযোগী নয়। কেননা একক ভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটী গুণের সংযুক্তি বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্যভেদ ঘটায়। আমরা অভ্রান্তভাবে বলতে পারিনা যে, যে বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্য বেশী, তার মূল্য কেন বেশী হল আর যার আত্যন্তিক মূল্য কম তার মূল্যই বা কেন কম হল? আত্যন্তিক মূল্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এ কথাও সত্য যে যার আত্যন্তিক মূল্য বেশী বলে আমরা বুঝি সেই কর্মটুকুই আমাদের করা উচিত। আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্ম বা বস্তুনিচয়ের অবচ্ছেদক ধর্ম বা পরাজাতি ধর্ম নিরূপণ ও সহজসাধ্য নয়। মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের প্রমাণ শাস্ত্রসম্মত পন্থা পরিহার করে আমরা যদি আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহীন কর্মের দুটী তালিকা প্রস্তুত করি এবং

কর্মগুলিকে মূল্যবান অথবা মূল্যহীন কেন মনে করছি তার কারণ নির্দেশ করি তা হলে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হতে পারব। সমাধানের এই পথের ইঙ্গিত দিয়ে মূর এই পথে অগ্রসর হননি। স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এমন কথা 'ও' আমরা স্বভাবতঃই বলতে পারি যে আত্যন্তিক মূল্যের লক্ষণ নিরূপণ না করে কেমন করে আমরা আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান এবং আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যহীন কার্যাবলীর ক্রমান্বিত শ্রেণীবিভাগ করব? আর যদিও করি তবে তা আমাদের প্রয়োজন এবং খেয়ালখুসির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হবে। এই শ্রেণী বিভজন কর্মটুকু বৈজ্ঞানিক বিভাজন হবে না।

আত্যন্তিক মূল্য ধারণার আলোচনার উপসংহারে মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের অনুভূতি (Feeling) এবং চেতনমনের অন্য কোন প্রক্রিয়া। এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই সুখানুভূতি বিধৃত। এবং আত্যন্তিক মূল্য ধারণাটুকু যৌগিক এবং মিশ্র (compound); অবশ্য মূর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দুটী লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা 'ভালোও না মন্দও না' এমন কর্মেরও অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করতে পারে। সুতরাং দেখা গেল মূরের আত্যন্তিক মূল্য ধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে অনির্বাচনীয় বস্তুবাদী।

[E thics গ্রন্থে স্থানভাবের দোহাই দিলেও

মূর তাঁর Principia Ethica গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং আত্যন্তিক অশুভকর্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রায় সমস্ত শুভ-কর্মই জটিল এবং যৌগিক। এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কর্মের বিষয় সম্বন্ধে কর্তার অনুভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মূর করেছেন। মূর আরো বলেছেন যে, যে কাজগুলিকে আত্যন্তিক মূল্য-সম্পন্ন বলছি তাদের মধ্যে মিল যে খুব বেশী তা নয়; যে যে বিষয়ে তাদের অমিল রয়েছে সেই সেই বিষয়এ মূল্যবান কর্মাবলীর আত্যন্তিক মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে। তাদের পরজাতিধর্ম এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিরঙ্কুশ ভাব ভালো নয় অথবা মন্দ নয়; কর্মের গুণাগুণ এতদুভয়ের সমন্বয়ের ফল মাত্র। মূর ত্রিবিধ কর্মের কথা বলছেন: (১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশুভ এবং (৩) মিশ্র শুভ। সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা হ'ল এই অবিমিশ্র শুভের উদাহরণ। সুন্দর এবং ভালো বস্তুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মূর নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কুৎসিতকে ঘৃণা করার কথা। মূরের এই

ব্যাখ্যা যে সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি তিনি আপন গ্রন্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন :

"Many of the judgments, which I have made in this chapter, will no doubt, seem unduly arbitrary : it must be confessed that some of the attributions of intrinic value, which have seemed to me to be true, do not display that symmetry and system which is wont to be required of philosophers'.

প্রথমত দার্শনিক আলোচনার সুমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকলেও মূরের আলোচনা সার্থক আলোচনা। বহু বিদগ্ধ মনের আলোকসম্মত ঘটেছে উত্তরকালে এই মনস্ব মানুষটির আলোচনায় এবং তার ফলে নীতিশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা আমরা করতে পেরেছি।

১। Ethics। পৃঃ ১৪২

২। ঐ পৃঃ ১০৩ দ্রষ্টব্য।

Principia Ethica p 2 22

সমার্থতা ও লক্ষণবাক্য

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

যে বাক্যে কোন পদের অর্থ সুনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যক্ত হয় তাহাকেই লক্ষণবাক্য বা সংজ্ঞার্থ বলে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের মতে কোন সাধারণ পদের (General Term) বাচ্যার্থ নির্দেশিত বস্তু বা ঘটনা সমূহের মধ্যে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব, এই ত্রিদোষরহিত যে সমানধর্ম থাকে, সেই অসাধারণ ধর্মকেই "লক্ষণ" বলা হইয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত ধর্মটিকে কেবল ত্রিদোষরহিত হইলেই হয় না, উহাকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মও হইতে হইবে। অর্থাৎ যে গুণ না থাকিলে কোন বস্তু কোন বিশেষ নামে অভিহিত হইতে পারে না, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু না কিছু পোষাক পরিহিত হওয়া মনুষ্যের হয়তো ত্রিদোষরহিত ধর্ম, কিন্তু উহা গুরুত্বপূর্ণ নহে বলিয়া মনুষ্যপদের লক্ষণ নহে। লক্ষিত পদকে উদ্দেশ্য করিয়া ও লক্ষণের উল্লেখকে বিধেয় করিয়া যে নির্ণয়বাক্য রচিত হয় তাহাকেই সংজ্ঞার্থ বলা যায়। পদ বা শব্দেরই সংজ্ঞার্থ হয়, বস্তু বা ঘটনাবলীর সংজ্ঞার্থ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে জাগতিক বস্তু বা ঘটনাবলীর কোন 'অর্থ' নাই যেহেতু উহারা মনুষ্যসৃষ্ট কোন প্রতীক বা সিম্বল্ নহে। যে অর্থে "মেঘের অর্থ বৃষ্টি" সেই ভূয়োদর্শনমূলক, বস্তু হইতে বস্তুান্তরের অনুমিতিরূপ 'অর্থের' কথা এইখানে উঠিতেছে না। বস্তুর এই স্বাভাবিক অর্থ, প্রতীকধর্মী অর্থ হইতে ভিন্ন। "মেঘ" শব্দের অর্থ কখনও বৃষ্টি হইতে পারে না, জলধর হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা শব্দ, নাম বা প্রতীকের অর্থকেই 'অর্থ' বলিয়া বুঝিব আর ইহা যে 'অর্থ' শব্দের এক মুখ্য এবং সার্থক প্রয়োগ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্থাৎ আমরা ধরিয়া লইব যে আমার সম্মুখস্থ নদীটির কোন লক্ষণবাক্য হয় না; 'নদী' শব্দের সংজ্ঞার্থ হইতে পারে। অবশ্য সর্ব-সাধারণে প্রচলিত অর্থবলে 'নদী' শব্দটির সামাজিক রীত্যানুযায়ী লক্ষণবাক্য দিতে হইলে ঐ শব্দের দ্বারা লক্ষিত বস্তুগুলির অসাধারণ ধর্ম অবশ্যই আবিষ্কার করিতে হয়। তাই কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রচলিত শব্দসম্ভারের সংজ্ঞার্থরচনা, জাগতিক বস্তুনিচয়ের পর্যবেক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিবে। কেবলমাত্র কোন লেখকের নিজসৃষ্ট

কোন শব্দের এক প্রস্তাবমূলক লক্ষণবাক্যই (stipulative definition) লেখকের মনগড়া হইতে পারে। "এই শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করা হউক"—এই প্রকার প্রস্তাব সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না, গৃহীত বর্জিত হইতে পারে মাত্র। বর্ণনামূলক লক্ষণবাক্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় বলিয়া সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। শব্দের বাচ্যার্থ নির্দেশিত বস্তু বা ঘটনাবলীর অসাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করিতে পারিলে ঐ বর্ণনামূলক লক্ষণবাক্য সত্য হয়, অন্যথায় উহা মিথ্যা হয়। ভাষার সহিত জাগতিক বস্তুনিচয়ের কোন সম্পর্ক নাই, এইরূপ একদেশদর্শী মতবাদ আশ্রয় না করিয়া, এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক লক্ষণ-বাক্যের স্বরূপ আলোচিত হইবে। অর্থাৎ কোন ভাষাপ্রতীক বা শব্দেরই লক্ষণবাক্য হয় ইহা স্বীকার করিয়াও মানিতে চাহি যে, লক্ষণবাক্য নিছক ভাষাগত (verbal) নহে। প্রকৃত লক্ষণবাক্য বস্তু ও শব্দের সম্পর্কে গড়িয়া উঠে। প্রতিশব্দমূলক, সমার্থক লক্ষণবাক্যকে (Syonymous Definition) এক বিশেষ অর্থে ভাষাগত বলা যায়। এই সমার্থক লক্ষণবাক্য যদি বিশুদ্ধ ভাষাগত হয় তবে উহা প্রকৃত লক্ষণবাক্যের মর্যাদা পাইতে পারে না।

কোন পদের অর্থ বুঝা এক জিনিষ আর ঐ অর্থকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা অন্য জিনিষ। কোন শব্দকে যখন আমরা মোটামুটি নির্ভুল-ভাবে ব্যবহার করিতে পারি তখন উহার অর্থ বুঝিয়াছি বলিয়া মানিতে হয়। কথা বলিবার সময় যদি "মনুষ্য" পদটিকে উহার বাচ্যার্থের অন্তর্গত ব্যক্তিগুলিতেই আরোপ করি, এবং ঐ বাচ্যার্থ বহির্ভূত বস্তুতে অর্থাৎ বৃক্ষলতাদিতে প্রয়োগ না করি, তবে ঐ নির্ভুল শব্দ প্রয়োগই নির্দেশ করিবে যে ঐ পদের অর্থ আমরা জানি। শিশু তাহার মুখে ভাষা লইয়া জন্মায় না। নিজের মাতৃভাষা সে সর্বপ্রথম গুরুজনদের শব্দব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করিয়া ও বড়দের অনুকরণ করিয়া শিখিয়া থাকে। সজ্ঞানে এই শিক্ষা হয় না। বালিকা যেমন মায়ের রান্না বা ঘরকন্না দেখিয়া উহাকে খেলাচ্ছলে অনুকরণ করে এবং পরে ঐ অনুকরণের দ্বারাই পাকাগিন্নী ও রাঁধুনী হইয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ শব্দপ্রতীকের ব্যবহারও অনুকরণের দ্বারা শিখিতে হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ভাষা শিক্ষার অর্থ হইল শব্দগুলিকে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করা। কিন্তু কোন শব্দকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলেও, ঐ ব্যবহারটি কোন্ নিয়মে বা রীতিতে শাসিত হয় তাহা, শিশুতো নয়ই, অনেকেই হয়ত বলিতে পারিবেন না। চিরাচরিত পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে কোন পদের ব্যক্তিগত লক্ষণার্থ ও বস্তুগত লক্ষণার্থ হইতে ভিন্ন যৌক্তিক লক্ষণার্থই (Logical ou Conventional Connotation) ঐ পদ ব্যবহারের সামাজিক প্রথানুযায়ী, সর্বসম্মত নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য যুক্তিসম্মত

লক্ষণবাক্যে কোন পদের পূর্ণ যৌক্তিক লক্ষণার্থ বিবৃত হয় যথা, "মানুষ হইল বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব।" "মানুষ" পদটির ব্যবহারের রীতিসম্মত নিয়ম হইল, যে বস্তুতেই বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণীধর্ম থাকিবে তাহাই 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হইবে, আর যাহাতে ঐ ধর্ম থাকিবে না তাহা ঐ নামে অভিহিত হইতে পারিবে না। ইহাই যেন প্রথা। কোন পদের এইরূপ জাতি-বিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্যই (per Genus et Differentiam) যে একমাত্র লক্ষণবাক্য তাহা না বলিতে পারিলেও, ইহাই যে লক্ষণবাক্যের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অন্য যে কোন প্রকারের লক্ষণবাক্যের কিছু না কিছু দোষ থাকে। এখন কোন পদকে নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা কঠিন নহে। পরের শব্দ ব্যবহার দেখিয়া ও অনুকরণ করিয়াই ঐ ব্যবহার আমরা শিখিতে পারি। কিন্তু কোন পদকে ব্যবহার করিতে পারিলেও এই ব্যবহারের নিয়ম বা প্রথাটিকে জানা কঠিন হইতে পারে। "কলম" শব্দের ব্যবহারে আমাদের ভুল না হইলেও "কলমের" যৌক্তিক লক্ষণার্থ বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মগুলি হয়তো আমরা নাও জানিতে পারি। কোন পদের প্রয়োগনিয়ম বা লক্ষণার্থ বিশদভাবে ব্যক্ত করাকেই লক্ষণবাক্য বলা যাইবে।

সহজেই বুঝা যায় যে, সাধারণ জীবনে নির্ভুল শব্দ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রত্যেকটি পদের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া লক্ষণবাক্য রচনার প্রয়োজন হয় না। বড়দের রীতি পর্যবেক্ষন ও অনুকরণ করিয়া সার্থক শব্দব্যবহার করিতে শিখিলে দৈনন্দিন কাজকর্ম, সামাজিক ব্যবহার ও ভাব বিনিময় সম্ভব হইতে পারে। মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ব্যতীত, পদের সঠিক লক্ষণবাক্য রচনা করিতে সাধারণ মানুষ কখনও ব্যগ্র হয় না। কিন্তু সময় সময় সঠিক লক্ষণবাক্য রচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। প্রথমতঃ কোন সাধারণ পদের সীমান্তবর্তী কোন বস্তু (border-line case) যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন ঐ পদের লক্ষণবাক্য রচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক জীবাণুর কথা জানেন যাহারা প্রাণবান না প্রানহীন তাহা বুঝা দুষ্কর। এমতাবস্থায় "প্রাণ" শব্দের সঠিক লক্ষণবাক্য পাইলে, বিভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দ্ব্যর্থকপদের অজ্ঞানতাপ্রসূত ব্যবহারের নিমিত্ত যুক্তি তর্কে বহুপ্রকার দোষ হইতে পারে। এই দ্ব্যর্থকপদজনিত হেত্বাভাস লক্ষণবাক্য রচনা করিয়া দূরীভূত হয়। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আমাদের মতভেদ, শব্দার্থের অস্পষ্টতা ও নানারূপ ব্যক্তিগত ধারণা হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন অনেকে রুশিয়ার রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রকে "গণতন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহেন না; আবার অন্য কেহ রুশিয়ার গঠনতন্ত্রকেই একমাত্র নির্ভেজাল "গণতন্ত্র" বলিতে চাহেন। এমতা-

বস্থায় "গণতন্ত্রের" সুনির্দিষ্ট অর্থব্যাখ্যা তা লক্ষণবাক্য ঐ মতভেদ দূর করিতে সক্ষম। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাইবে যে বিরোধটি একেবারেই ভাষাগত (verbal); দুইদল "গণতন্ত্র" শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছে। চতুর্থতঃ বাক্যালাপে বা পুস্তকপাঠের সময় কোন অপরিচিত পদের সম্মুখীন হইলে উহার অর্থ যদি প্রসঙ্গক্রমেও পরিষ্কার না হয়, তবে উহার অর্থ সজ্ঞানে বুঝিতে হইবে। তাই লক্ষণবাক্যের সহায়তায় কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য শব্দসম্ভারের উপচিতি বা বৃদ্ধি সম্ভব। পঞ্চমতঃ, আইনের কোন ধারা প্রয়োগ করিতে গিয়া বিচারকের অনেক সময় বিভ্রান্তি হইতে পারে। কোন আইনের বিবরণে হয়তো কোন শব্দের লক্ষণবাক্য দেওয়া আছে; ইহা মনুষ্যসৃষ্ট বলিয়াই হয়তো সকলক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় বিচারককে আইনের নূতন ব্যাখ্যা করিতে হয় ও নূতন লক্ষণবাক্য দিতে হয়। ষষ্ঠতঃ, বিজ্ঞানীকে অনেক সময় বস্তুজগতের সঠিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত পদের লক্ষণবাক্য তৈয়ার করিতে হয়; এইগুলি সর্বদাই জ্ঞানদায়ী (Theoretical) লক্ষণবাক্য। যে বস্তুনিচয়ের উপর ঐ পদের প্রয়োগ হয় তদন্তর্গত লক্ষ্যার্থ এইরূপ লক্ষণবাক্যে পরিষ্কার হয়। "যে রাসায়নিক বস্তুতে হাইড্রোজেন উপাদানরূপে থাকে তাহাই অ্যাসিড্" এই লক্ষণবাক্য সকল অ্যাসিডের এক গুরুত্বপূর্ণ গুণের জ্ঞান দিয়া থাকে। সপ্তমতঃ, গুরুজনদের শব্দব্যবহার লক্ষ করিয়া ও অনুকরণের দ্বারা মাতৃভাষা শিক্ষার পর যদি কেহ অন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে চাহে, তবে বিদেশী শব্দের সমার্থক মাতৃভাষার শব্দ দিয়া লক্ষণবাক্য তৈয়ার করিতে হয়। যথা "Mother অর্থ মা", "Brother অর্থ ভাই" এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য (Synonymous definition) গঠন করিয়াই বাঙালী ছেলেকে ইংরাজী শিখিতে হয়।

অবশ্য প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যে এক ভাষা হইতে ভাষান্তরেই গঠন করিতে হইবে এমন নিয়ম করা চলে না। একই ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি সমার্থক শব্দ দিয়াও ঐরূপ লক্ষণবাক্য গঠন করা যায় যেমন, "পিতার অর্থ বাবা", "ভগ্নীর অর্থ বোন্" ইত্যাদি। এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের প্রয়োজনীয়তা আর সমার্থতার নিয়মের উপর কিছু আলোকপাত করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই জানি যে জাতিধর্ম ও বিভেদক ঘটিত লক্ষণবাক্য রচনার একটি নেতিমূলক নিয়ম আছে যে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্য সমার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া দিতে নাই। যে পদের লক্ষণ রচিত হইতেছে সেই পদ বা উহার সমার্থক শব্দ যদি লক্ষণ উল্লেখ করিবার কালে ব্যবহৃত হয় তবে চক্রকদোষ বা সমার্থতা দোষ হয়। সমার্থতা কাহাকে বলে ইহা লইয়া যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতভেদের অন্ত নাই আর বর্তমান

প্রবন্ধ লেখকের কাছে বিষয়টি আদৌ স্পষ্ট নহে।

প্রথমতঃ, চিরাচরিত যুক্তিবিজ্ঞানে যে আদর্শ লক্ষণবাক্য বা জাতি-বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ও বিধেয় অবশ্যই সমার্থক। "মনুষ্য হইল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব" এই জাতি-বিভেদকাক্রান্ত লক্ষণবাক্যে "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই পদ দুইটি যদি ভিন্ন বস্তুকে নির্দেশ করিত তবে উহা লক্ষণ-বাক্যই হইত না। তাই এক অর্থে "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" সমার্থক। এই কারণে সমার্থতা কখনই লক্ষণবাক্য রচনায় দোষের হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাতি বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্য সম্বন্ধে হয়তো বলা যাইতে পারে যে, লক্ষিতপদ (উদ্দেশ্য) ও লক্ষণনির্ণয়কারী বিধেয়ের অর্থ ভিন্ন, যদিও উহারা একই বস্তুকে নির্দেশ করে। "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" একই বস্তুকে নির্দেশ করিলেও, অর্থাৎ উহাদের বাচ্যার্থ (denotation) এক হইলেও, এমন হয়তো বলা যায় যে উহারা ভিন্নভাবে আমাদিগকে অভিভাবিত করে। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যেও ঐরূপ ধর্ম থাকিতে আপত্তি হয় না। যথা; "সন্ধ্যাতারার অর্থ শুকতারা"। এই দুই শব্দ সমার্থক কেননা, উহারা একই বস্তু নির্দেশ করে। অথচ সন্ধ্যাতারার মানে যে সন্ধ্যায় উদিত হয় আর শুকতারার মানে যে ভোরে উদিত হয়। তাই অভিভাবনের (suggestion) দিক হইতে সন্ধ্যাতারাকে শুকতারা বলা চলে না; আর এই কারণে জাতিবিভেদকঘটিত লক্ষণবাক্যকে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য হইতে পৃথক করা যায় না। আবার "ভগ্নী মানে বোন্" এই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় একই বস্তুকে নির্দেশ করিলেও, 'ভগ্নী' এবং 'বোনের' মধ্যে কোন তফাৎ নাই এমন বলা চলে না। যথেচ্ছভাবে এই দুই শব্দ যে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার হয় না; ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন শব্দের ব্যবহারই সার্থক। অর্থাৎ সকলক্ষেত্রেই এক শব্দ অন্যের যায়গায় বসানো চলে না। যদি যাইত তবে ভাষায় এই দুই শব্দ থাকার অর্থ থাকিত না। সাধারণ বাংলা কথ্য ভাষায় "বোন্" চলিলেও 'ভগ্নী' চলে না। "আজ আমার বোন্ এসেছে" এই কথিত বাক্য ঠিক হইলেও, "আজ আমার ভগ্নী এসেছে" বেমানান। "ভগ্নী আসিয়াছেন" বলিলেই ঠিক হয়। তেমনি "Little means Small" এই প্রতি-শব্দমূলক লক্ষণে "Little" ও "Small" এর ব্যবহারও ভিন্ন। "Little girl" হইতে পারে কিন্তু "Little village" হয় না—"Small village" হইবে। তাই দুটি সমার্থক শব্দের মধ্যেও ভিন্নতা আছে; অন্ততঃ উহাদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে করিতে

হয়, যদিও অর্থে উহারা এক। * "ত্রিভুজ হইল তিনটী সরলরেখাবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র" এই জাতি-বিভেদকসূচক লক্ষণবাক্যেও কখন কখন লক্ষিত পদের স্থলে লক্ষণ উল্লেখকারী অংশকে বসানো চলিবে না। প্রণয়ের "ত্রিভুজ" নিশ্চয়ই স্নেহকামনার তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র নহে! অর্থাৎ "ত্রিভুজের" আলংকারিক প্রয়োগ হইলেও উহার জাতিবিভেদক উল্লেখকারী লক্ষণের আলংকারিক প্রয়োগ হয় না। "মানুষগুলি দৌড়াইতেছে" বাক্যটি বলিলেও, ঐ অর্থ বুঝাইতে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীগুলি দৌড়াইতেছে" বড়ই বিসদৃশ। অন্ততঃ ঐরূপ ব্যবহারে পণ্ডিতম্মন্যতার পরিচয় আছে।

তৃতীয়তঃ, এমন বলা চলে না যে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের কিছুই উপযোগিতা নাই। ইহাও কখন কখন অর্থ বুঝাইতে সাহায্য করে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে যেমন সমার্থতা আছে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্যেও তেমনি সমার্থতা আছে বলিয়া দেখিয়াছি। যৌক্তিক লক্ষণবাক্য যদি অর্থ বুঝাইতে সক্ষম হয়, তবে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যই বা সক্ষম হইবে না কেন? প্রতিশব্দমূলক লক্ষণ, বাচ্যার্থের একটি বস্তুকে অঙ্গুলিনির্দেশে লক্ষণ, দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লক্ষণ, জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণ, সকলেরই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপযোগিতা থাকিতে পারে। প্রতিশব্দাত্মক লক্ষণবাক্যে কোন অপরিচিত শব্দের অর্থ, অন্য একটি মাত্র পরিচিত শব্দের সাহায্যে দেওয়া হয়। অভিধানে অনেক সময় এইরূপ প্রতিশব্দ দেওয়া হয় বলিয়া এইরূপ লক্ষণবাক্যকে অভিধানিক লক্ষণবাক্য (Lexical Definition) ও বলা যায়। যেমন, "লাকের অর্থ ঝাঁপ"। যদি 'লাক' শব্দ কাহারও জানা না থাকে, আর 'ঝাঁপ' শব্দ জানা থাকে, তবে এই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য 'লাকের' অর্থ বুঝাইবে। বিপরীতভাবে যখন 'ঝাঁপ' অপরিচিত ও 'লাক' পরিচিত, তখন "ঝাঁপের অর্থ লাক" লক্ষণবাক্য "ঝাঁপের" অর্থ বুঝাইবে। শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রতিশব্দ কিছুই সাহায্য করে না এমন বলা চলে না। কোন ভাষার কিছু কিছু শব্দ সম্ভারের জ্ঞান হওয়ার পর, এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য দিয়া অপরিচিত শব্দের অর্থ বুঝা যায় এবং ব্যবহারের নিমিত্ত শব্দ সম্ভারের আয়তন বাড়িয়া যায়। পরন্তু মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিখিবার সময় নূতন ভাষার নূতন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে উহার সমার্থক মাতৃভাষার শব্দের সঙ্গে ঐ নূতন

* "Synonym, n. Word identical & coextensive in sense and usage with another of the same language; word denoting the same thing(s) as another but suitable to different context or containing different suggestion." (The Concise Oxford Dictionary)

শব্দের মিলন করিতে হয়। তাই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যে একেবারে মূল্যহীন নহে তাহা নীচের দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করিবে।

(১) কঠিন মানে শক্ত অথবা শক্ত মানে কঠিন।

(২) সন্ধ্যাতারা মানে শুকতারা অথবা শুকতারা মানে সন্ধ্যাতারা।

(৩) পিতা মানে বাবা অথবা বাবা মানে পিতা।

(৪) ফাদার (Father) মানে বাবা অথবা .....

(৫) রুজ (Rouge) মানে লাল অথবা.....

(৬) রাট্ (Rut) মানে লাল অথবা.....

(৭) রেড্ (Red) মানে লাল অথবা .....

আবার, জাতিধর্ম ও বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্যেও কোন শব্দের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু লক্ষণপ্রকাশী শব্দগুলি যদি অপরিচিত হয়, তবে ঐ লক্ষণবাক্য দিয়া কোন লাভ হয় না। যখন লক্ষিতপদ অপরিচিত তখনই লক্ষণ-বাক্যের দাবী উঠে। ঐ অপরিচিত শব্দ যদি তদপেক্ষা অপরিচিত শব্দসমূহ দিয়া ব্যাখ্যাত হয়, তবে জাতিবিভেদক দিয়াও পদের অর্থ বুঝা যাইবে না।

চতুর্থতঃ, লক্ষণবাক্য কোন মানুষের জন্যই রচিত হয় ও তাহার ভাষাজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে। এদিক দিয়াও প্রতিশব্দমূলক ও জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের মধ্যে প্রভেদ নাই। জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যকে সকল ব্যক্তিনিরপেক্ষ, জ্ঞাননিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক, সর্বগত লক্ষণবাক্য বলা যায় না। যে লক্ষণবাক্য কোন কিছুর অর্থ কাহাকেও বুঝাইবার জন্য রচিত নহে, তাহা লক্ষণবাক্যই নহে। প্রতিশব্দ পরিচিত না হইলে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যেমন অর্থহীন, তেমনি জাতি-বিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যও লক্ষণবাক্য-নির্ণয়কারী অংশের সহিত পরিচয় না থাকিলে অর্থহীন হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের শব্দ দুটি যেমন পরস্পর পরস্পরের লক্ষণ, জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যেও উদ্দেশ্য ও বিধেয় পরস্পরের লক্ষণ হইতে পারে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যকে আবর্তন (conversion) করিয়া লিখিলে আবর্তনীয় ও আবর্তিত বাক্যের অর্থের তারতম্য হয় না এমন বলা চলে না। একদিক দিয়া দেখিলে "(শক্ত মানে কঠিন) = (কঠিন মানে শক্ত)" ঠিক হইলেও, অন্যদিক দিয়া দেখিলে, পরিচিত ও অপরিচিত শব্দ ভেদে, দুইব্যক্তির নিকট এই দুই লক্ষণবাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে। পরন্তু জাতিবিভেদকমূলক সার্বিক ভাববাচক (Universal Affirmative, A) নির্ণয়বাক্যের সরল আবর্তন নির্দোষ। এই কারণে, "মানুষ (হয়)

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই লক্ষণবাক্যকে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব (হয়) মানুষ" এই ভাবে সরল আবর্তন করা যায় এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে কেন যে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের" লক্ষণ বলা যাইবে না তাহা বুঝা যায় না। যেমন আগে "মনুষ্য" নাম শুনিবার পর উহার অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলিয়া বুঝিতে পারি, তেমনি আগে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কথা শুনিয়া উহাকেই যে 'মানুষ" বলে তাহা জানিতে পারি। এরূপ অবস্থায় অন্ততঃ কোন প্রত্যক্ষপূর্ব (A priori) অসম্ভাব্যতা দেখা যায় না। তাই জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্য ও তাহার সরলাবর্তিত রূপ উভয়েই সমার্থক লক্ষণবাক্য হইতে পারে। "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবকে বলে মানুষ" এই বাক্যে উদ্দেশ্যের সমার্থক সংক্ষিপ্তরূপ বিধেয়তে পাওয়া যায়, আর "মানুষ হইল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদের সমার্থক বিস্তার হয়। পদের বিস্তার বা সংক্ষেপকরণ এই দুই উদ্দেশ্যই লক্ষণবাক্যের দ্বারা সাধিত হইতে পারে বলিয়া "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা" গ্রন্থে রাসেল্ বলিয়াছেন।

উপরের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রতিশব্দমূলক ও জাতিবিভেদক-মূলক লক্ষণবাক্যকে ভেদহীন বলার মত শ্বাসরোধী সিদ্ধান্ত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। উহাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য স্বীকার করিয়া বলিতেই হয় যে যৌক্তিক লক্ষ্যার্থ বর্ণনাকারী লক্ষণবাক্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাত্ত্বিক (theoretical) লক্ষণবাক্য। অন্য যে কোন প্রকারের লক্ষণবাক্যের কমবেশী তাৎপর্য থাকিলেও, উহাদের কাহাকেও জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ও দোষহীন বলা চলে না। আর এই কারণে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে লক্ষিত পদের সমার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে তাত্ত্বিক লক্ষণের দাবী পূর্ণ হয় না। অঙ্গুলি নির্দেশ বা মস্তক সঞ্চালনে বস্তুর নির্দেশ করিয়া কোন পদের লক্ষণ দিলে, প্রথম শিক্ষার্থী শিশুর নিকট তাহা উপাদেয় হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ বস্তুনির্দেশক লক্ষণবাক্যের অনেক অসুবিধা। যথা, যে বস্তু দৃষ্টির সম্মুখে নাই তাহার এইরূপ লক্ষণ (Ostensive Definition) হয় না; অঙ্গুলি নির্দেশে "ইহা ঘট" বলিলে শিশু অঙ্গুলিকেই ঘট মনে করিতে পারে, অথবা ঘটের বর্ণ, আকৃতি, আয়তন যে কোন একটিকে ঘট ভাবিতে পারে; অথবা যে ভূমির উপর ঘট আছে সেই ভূমিকেও ঘট মনে করিতে পারে। তাই বস্তুনির্দেশক লক্ষণবাক্যের বিকল্প তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব। কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সাধারণপদের লক্ষণ দিলে, অপরিচিত দৃষ্টান্তের বেলা বিভ্রান্তি হইতে পারে। যদি বলা যায় যে "মহাকাব্য হইতেছে রামায়ণ, মহাভারতের মত কাব্য" তবে "প্যারাডাইস লষ্টের" মত কাব্য লইয়া গোলমাল বাধিতে পারে। পদের বাচ্যার্থ

(Denotation) মিল মহোদয়ের মতে উহার অর্থ (meaning) নহে; পদের লক্ষ্যার্থই (connotation) উহার প্রকৃত অর্থ। এই কারণে মিল্ কেবলমাত্র বাচ্যার্থ-সমন্বিত নিজস্ব নাম (Proper name) ও বিশিষ্ট গুণবাচক নামকে অর্থহীন বা অলক্ষণার্থক বলিয়াছেন। এই সকল পদের লক্ষণবাক্য হইতে পারে না। একখানি ছুরি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, উহার ফলায় মরিচা ধরিতে পারে, কিন্তু "ছুরি" শব্দের অর্থ ভাঙ্গেও না, উহাতে মরিচাও ধরে না। তাই "ছুরি" শব্দের বাচ্যার্থ উহার প্রকৃত অর্থ নহে। "ছুরির" বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়া হয়তো উহার সম্বন্ধে এক ভাসা ভাসা বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত অর্থ হইতেছে প্রথাগত যৌক্তিক লক্ষণার্থ, যাহার উল্লেখ করিতে হইলে পদের জাতিধর্ম ও বিভেদক-ধর্মের উল্লেখ করিতে হয়। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য সময় সময় উপযোগী হইলেও, লক্ষণার্থ উল্লেখ করিয়া লক্ষণবাক্যের মত ইহা গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক হয় না। "ভ্রাতা মানে ভাই" এই লক্ষণবাক্যদ্বারা, 'ভাই' শব্দের ব্যবহার জানা থাকিলে, অপরিচিত 'ভ্রাতা' শব্দ হয়তো শিশু ব্যবহার করিতে শিখিবে; কিন্তু এই ব্যবহারের নিয়ম শিখিবে না। 'ভাই'য়ের অর্থ পুরুষ সহোদর (male sibling) এই লক্ষণবাক্য 'ভাই', ভ্রাতা, brother প্রভৃতি সমার্থক শব্দের প্রয়োগনিয়ম বলিয়া দেয় ও উহাই জাতি-বিভেদক সমন্বিত যৌক্তিক লক্ষণবাক্য।

প্রথাগত পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে জাতি-বিভেদক লক্ষণবাক্যকেই প্রকৃত লক্ষণবাক্য বলা হইয়াছে ও অন্যান্য প্রকার লক্ষণবাক্য অস্বীকার করা হইয়াছে। এই মতবাদ যে একদেশদর্শী তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের ঐতিহ্য হয়তো গণিত ও জ্যামিতিশাস্ত্রের লক্ষণবাক্যগুলি বিচার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউক্লিডের লক্ষণবাক্যগুলি জাতি-বিভেদক ঘটিত। এই মতবাদ একদেশদর্শী হইলেও এই জাতি-বিভেদকঘটিত লক্ষণবাক্যই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য থাকিলেও, উহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিশব্দমূলক ও জাতি-বিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের পার্থক্য :—

প্রথমতঃ বলা যায় যে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক অপরিচিত শব্দের স্থলে অন্য একটিমাত্র পরিচিত শব্দ বসিবে; কিন্তু জাতি-বিভেদকমূলক লক্ষণ উল্লেখকারী বিধেয়াংশে একাধিক শব্দ বসিবে। যথা; "লোহিত মানে লাল" প্রতিশব্দগত, "ত্রিভুজ মানে তিনবাহুবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র" জাতি-বিভেদক ঘটিত। জাতি-বিভেদক-মূলক লক্ষণবাক্যে অন্ততঃ একটি শব্দ জাতিধর্ম উল্লেখ করিবে ও অন্য একটি শব্দ

বিভেদকধর্ম উল্লেখ করিবে। আরিষ্টটল মহোদয় লক্ষণরূপ বিধেয়কে, অন্ততঃ দুইটি শব্দের মিলন বলিয়া মানিবেন। অর্থাৎ প্রতিশব্দগত লক্ষণবাক্যের আকার হইল "ক মানে খ" এবং জাতি-বিভেদক ঘটিত লক্ষণবাক্যের আকার হইল "ক মানে খ+গ"।

দ্বিতীয়তঃ, উপরের এই ভাষাগত (verbal) পার্থক্য হইতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্গত হয়। জাতিধর্ম ও বিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদ ও লক্ষণপ্রকাশক শব্দসমূহ সমার্থক হইলেও এখানে লক্ষিত পদের অর্থটি বিশ্লেষিত অবস্থায় পাওয়া যায়; কিন্তু প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এই অর্থ বিশ্লেষণের অভাব থাকে। উপরে প্রদত্ত সকল প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের উদাহরণে এক শব্দের স্থলে অন্য এক শব্দ বসিয়াছে যথা, "ভ্রাতা মানে ভাই"; কিন্তু ভ্রাতার পক্ষে ভাই হইবার জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ গুণের প্রয়োজন তাহার বিশ্লেষণ হয় নাই। "ভ্রাতা হইলে পুরুষ সহোদর" বলিলে জাতিধর্ম ও বিভেদকের সাহায্যে ঐ গুরুত্বপূর্ণ গুণের বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক শব্দস্থলে অন্য একটিমাত্র প্রতিশব্দ বসে; যৌক্তিক লক্ষণে এক অর্থবান শব্দ একাধিক অর্থবান শব্দদ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ এই কারণে সম্ভব হয় যে, লক্ষণপ্রকাশী বিধেয়গত একাধিক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই লক্ষণবাক্যে "বুদ্ধিবৃত্তি" শব্দের অর্থ এক ও "জীব" শব্দের অর্থ ভিন্ন; এই দুই অর্থ মিলিত হইয়া "মনুষ্য" শব্দের সমার্থক হয়। যৌক্তিক লক্ষণবাক্যের বিধেয়গত কোন শব্দই এককভাবে লক্ষিত পদের সমার্থক হয় না। অর্থাৎ, "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন" শব্দ "মনুষ্য" শব্দের সমার্থক নহে কেননা, ভগবান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারেন; এবং "জীব" শব্দও "মনুষ্যের" সমার্থক নহে কেননা গরুও জীব। এই কারণে যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে লক্ষিত পদের অর্থ বিশ্লেষিত (analysed) অবস্থায় ব্যাখ্যাত হয়। ইহা বৈশ্লেষিক লক্ষণ, প্রতিশব্দমূলক নহে।

ভাষায় একটিমাত্র শব্দের একটিমাত্র অর্থ; অবশ্য এই অর্থ সরল বা জটিল হইতে পারে। "লাল" শব্দের অর্থ সরল; এই অখণ্ডার্থ সাক্ষাৎ অনুভূতি বিষয়; যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে ইহা বিশ্লেষিত হইতে পারে না। এই কারণে "লাল" শব্দের যৌক্তিক লক্ষণবাক্য হয় না যদিও প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য হয় যথা "লাল মানে লোহিত"। অর্থাৎ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে কোন অর্থবিশ্লেষণ নাই। কিন্তু শব্দার্থ যদি জটিল অর্থাৎ সখণ্ডার্থক হয় তবে সেই অবয়ব, জটিল অর্থের বিশ্লেষণ করিয়া যৌক্তিক লক্ষণ বাক্য গঠিত হয়। এই কারণে যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে প্রতিশব্দ দিতে নাই;

প্রতিশব্দ দিলে অর্থের বিশ্লেষণ হয় না। জটিল অর্থের দুই দিককে প্রকৃতপক্ষে পৃথক করিতে না পারিলেও, বিমূর্ত চিন্তায় বিশ্লেষণ করা যায়। যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে সাধারণ পদের বিভাজনক্রিয়া উহ্য থাকে। এইরূপ লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদটি কি অর্থে উহার জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতির সদৃশ তাহা যেমন বলা হয়, তেমনি ঐ উপজাতিগুলি হইতে উহার পার্থক্য কোথায় তাহাও বলা হয়। এইভাবে লক্ষিতপদের অর্থ বিশ্লেষিত হইয়া যায় ও বিশ্লেষিত উপাদান দুইটি একত্রে মিলিয়া লক্ষিত পদের সমার্থক হয়। কোনও জটিল অর্থের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন নাম ভাষায় আছে বলিয়া এই বিশ্লেষণ বা বিমূর্ত চিন্তা (abstract thought) সম্ভব হয়। বিশুদ্ধ ধর্ম বা গুণের পৃথক নাম না থাকিলে দ্রব্য হইতে গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে পারিতাম না। ভাষা আগে না চিন্তা আগে উৎপন্ন হইয়াছে এই ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত নহি। ভাষা ব্যতীত চিন্তা হয় কিনা, বা চিন্তা ব্যতীত ভাষা হয় কিনা এ বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। তবে ভাষা ও চিন্তা যে একেবারে একই ইহা না মানিলেও, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে যে এক জটিল অর্থের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন নাম ভাষায় আছে বলিয়াই, সার্থক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। পদার্থের বিশ্লেষণ যথা, শবব্যবচ্ছেদ করিতে হইলে যেমন করাত, ছুরি, স্ক্যাল্‌পেল্, ইত্যাদির প্রয়োজন, তেমনি সখণ্ডার্থক শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য ভাষার অস্ত্র নিতান্তই প্রয়োজন। 'মনুষ্য' পদের জটিল অর্থের যৌক্তিক বিশ্লেষণ, মনুষ্যের জাতির একটি নাম "জীব" ও বিভেদকের অন্য নাম 'বুদ্ধি' আছে বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। প্রতিশব্দ দিলে এই বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না বলিয়া, বিশ্লেষণনিষ্ঠ লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদের প্রতিশব্দ বসাইতে নাই।

অনেক পাঠ্যপুস্তকে চক্রদোষযুক্ত লক্ষণবাক্য ও প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যকে একই নিয়মাধীনে একই দোষযুক্ত বলা হয়। কিন্তু চক্রকদোষ ও প্রতিশব্দাত্মক দোষ পৃথক করা প্রয়োজন। "যিনি বিচার করেন তিনিই বিচারক" এই চক্রকদোষযুক্ত "বিচারকের" লক্ষণবাক্যের লক্ষণ নির্দেশী অংশে একাধিক শব্দ আছে। "বিচারকের" প্রতিশব্দ "বিচারক" নহে। প্রতিশব্দের অর্থ হইল এক শব্দের সমার্থক অন্য একটি শব্দ। যদি বলি "সম্ভরণবীর সম্ভরণ করিয়া থাকেন" তবে চক্রক দোষ হয়; "ভ্রাতা মানে ভাই" প্রতিশব্দাত্মক দোষযুক্ত, চক্রকদোষযুক্ত নহে। চক্রকদোষ হইলে লক্ষিত পদ ও লক্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া এইরূপ দোষযুক্ত লক্ষণবাক্য একেবারেই নিরর্থক। কিন্তু প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক শব্দের ভিন্ন প্রতিশব্দ দেওয়া হয় বলিয়া, ইহার কালবিশেষে কিছু উপযোগিতা দেখা যায়। তবে ইহাতে

অর্থটি বিশ্লেষিত হয় না বলিয়া ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত লক্ষণবাক্যের গুরুত্ব নাই।

নির্দোষ জাতিবিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্য গঠন করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় শাস্ত্রে কোন সাধারণ পদের লক্ষিত সভ্যদের অসাধারণধর্মকেই লক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষণ যদি "অসাধারণ" ধর্ম হয় তবে ইহা বিভেদক মাত্র ও ইহার একমাত্র কাজ হইবে অন্যান্য বস্তু হইতে লক্ষিত পদকে ব্যাবৃত্ত করা। ভারতীয় মতে লক্ষণবাক্য জাতি-বিভেদকঘটিত নহে বলিয়া উহা বৈশ্লেষিক লক্ষণবাক্য নহে। অসাধারণধর্ম বা বিভেদকটিকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করিলেও, লক্ষণবাক্য চক্রক বা প্রতিশব্দাত্মক দোষমুক্ত থাকিতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বিভেদকধর্ম উল্লেখকারী শব্দটি, লক্ষিত শব্দটির সমার্থক নহে। কিন্তু এরূপ লক্ষণবাক্যে পদের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ থাকে না বলিয়া তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। নৈয়ায়িকগণ ঐ অসাধারণধর্মকে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষমুক্ত করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত জাতিঘটিত লক্ষণবাক্যকেই উপাদেয় মনে করিয়াছেন। প্রথমে "জ্ঞান"কে শব্দ-ব্যবহারহেতু, এই অসাধারণধর্মযুক্ত বলিয়া পরে, নির্বিকল্পক জ্ঞানে ঐ ধর্মের অভাব-বশতঃ, অন্নম্ভট্ট 'জ্ঞানে'র জ্ঞানত্বজাতিমত্ত্ব লক্ষণ দিয়াছেন *। ঐরূপ জাতিঘটিত লক্ষণ, যথা, "ঘট অর্থ ঘটত্বজাতিমান" প্রতিশব্দাত্মক না হইলেও প্রায় উহার সীমান্ত স্পর্শ করে। 'ঘটত্ব' জাতি অখণ্ডোপাধি বলিয়া উহার বিশ্লেষণ হয় না। এই কারণে জাতিঘটিত লক্ষণ বৈশ্লেষিক নহে ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উহা নিরর্থক।

* তর্কদীপিকা

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C. GUPTA. from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32E, Lansdowne Road, Calcutta—20

December—1961—200.

UNIVERS

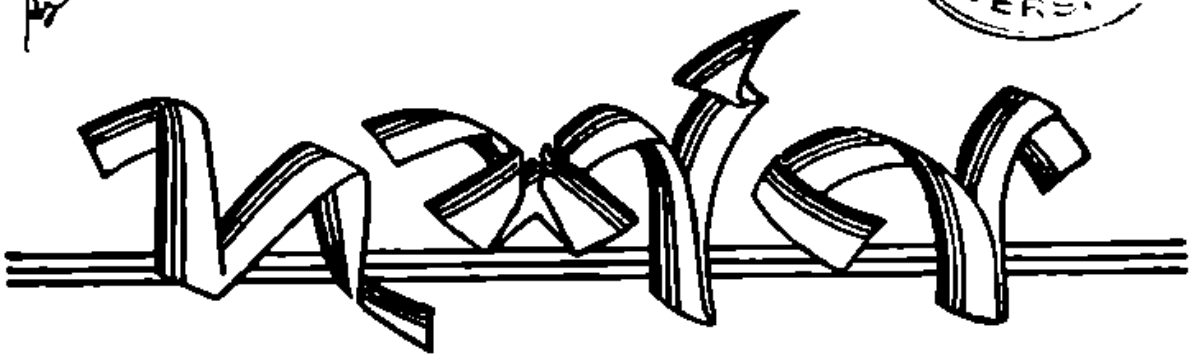

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]　　মাঘ　　১৩৬৭ সন

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

মূল্য ১·২৫　　বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)— ৫৲

দর্শনের কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ঈশোপনিষৎ	শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত	১
২।	জ্ঞানের স্বরূপ	শ্রীঅনাদিকুমার লাহিড়ী	১০
৩।	ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের বিভাগ	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি	১৪
৪।	জগতে অমঙ্গল কেন	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩১
৫।	পুস্তকপরিচয়	শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত	৫৭
৬।	ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশৎ অধিবেশন	শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী	৫৮
৭।	অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লেক্‌চারশিপ ফণ্ড		৩৯
৮।	বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মূল নিয়মাবলী (সংশোধিত)		ক
৯।	বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্য ও দর্শন পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা		ঙ

ঈশোপনিষৎ

শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত

আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির মধ্যে ঈশোপনিষৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাত্র আঠারটি শ্লোকে গঠিত এই উপনিষদে যে তত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তাহা সমস্ত উপনিষদগুলির সারমর্ম এবং ইহাতে সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্টভাবে যে জীবনাদর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

জগতে যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম অথবা পরমেশ্বর তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনিই সকল বস্তুর অন্তরাত্মা এই পরম সত্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে সকল কর্ম করিয়া যাইতে হইবে ইহাই ঈশোপনিষদের মূল শিক্ষা। যিনি নিজের অন্তরে এবং বাহিরে সর্বত্রই এক আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি পার্থিব কোনও বস্তুতেই লোভ করিতে পারেন না, তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা দ্বেষ করিতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত ধ্যান, ধারণা ও কর্ম ঈশ্বরাভিমুখী হইবে এবং তিনি সকল মোহ ও শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইবেন। কিন্তু যিনি সর্বভূতের একাত্মতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পরম শান্তির অধিকার হইয়াছেন এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, পরন্তু কর্ম করিয়াই শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"। ২। সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিষ্কাম ও নির্লোভচিত্তে সকল কর্ম করিতে হইবে এবং নিজের জীবনকে সর্বত্র প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে ঈশোপনিষৎ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন।

বহুকাল হইতেই এদেশে কর্ম ভীতি এবং কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা বিপুল

সংখ্যক ব্যক্তির মনে একটি স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং তাহাদের জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কর্ম (দুষ্কর্মই হউক অথবা সুকর্মই হউক) করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে এবং অনিবার্যভাবে বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে এই চিন্তা বহুযুগ ধরিয়া তাহাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কৈবল্য-বাদী সাংখ্য, অপবর্গবাদী ন্যায়, নির্বাণ-বাদী বৌদ্ধ এবং মোক্ষ-বাদী বেদান্ত এই সকল দর্শনেই পরমপুরুষার্থরূপে জীবের এমন একটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে যাহাতে কর্ম্ম ও ক্রিয়ার কোনও স্থানই নাই। সংসারচক্র হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়াই যদি জীবের অধ্যাত্মিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কর্ম-ত্যাগকে সেই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন কেবল তাঁহাদের মধ্যেই যে কর্ম্মের প্রতি এই বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়. এই ধরণের দার্শনিক চিন্তা আমাদের দেশে যে ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে বাস করিবার ফলে অতি সাধারণ ব্যক্তির মনেও অতি সহজেই জীবন ও কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে এবং এই বিতৃষ্ণার পরিচয় লোক-সাহিত্য এবং লোক সঙ্গীতেও প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি জ্ঞানী তিনি কর্মত্যাগ করিবেন, কারণ তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা তিনি ইহাই বুঝিয়াছেন যে কর্ম মোক্ষলাভের পথে অন্তরায়স্বরূপ। আবার যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষেও কর্মের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যে ভগবানের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার পক্ষে কেবল মাত্র অশ্রুবিগলিতনেত্রে ভগবানের নাম কীর্তন করা এবং ভগবানের মাধুর্য্যরস উপভোগ করাই চরম কাম্য। জ্ঞান বা ভক্তির সহিত কর্মের বিরোধ যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে সমস্ত উপনিষদ গ্রন্থেই মুমুক্ষু ব্যক্তিকে কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ঈশোপনিষৎ পাঠ করিলে তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূর হইবে। ঈশোপনিষদে নৈষ্কর্ম্যবাদের কোনও স্থান নাই। সকলকেই কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিতে হইবে ঈশোপনিষৎ স্বর্থহীন ভাষায় ইহাই প্রচার করিতেছেন। 'কর্ম' বলিতে এখানে কেবলমাত্র বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম বুঝিতে হইবে এরূপ ইঙ্গিত এই উপনিষদে কোথাও নাই। দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হইয়াছে "এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে" (এই প্রকার

তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে কর্ম্মলিপ্ত না হইতে পারে)। এই পংক্তিটি গীতার উক্তি "ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (৩।৫) কে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে 'কর্ম' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই লইতে হইবে অর্থাৎ পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য প্রভৃতি সমস্তই 'কর্ম' শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে।

"কর্ম করিয়া শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই উপদেশ যে কেবলমাত্র অবিদ্বান্‌দের অথবা যাহারা প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করিবারও কোনও পথ নাই। অবশ্য ঈশোপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যা সাধারণতঃ শাঙ্করভাষ্যকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রথম দুইটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা হইয়া থাকে যে যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা পরমেশ্বরের দ্বারা জগতের সমস্ত কিছু আবৃত করিয়া নিরাসক্ত হইবেন এবং যাঁহারা সংসারী হতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম করিবেন। প্রথম শ্লোকে যাঁহাকে সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া নিরাসক্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই আবার তাঁহাকেই কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে একই ব্যক্তিকে এই দুই পরস্পর বিরোধী উপদেশ দেওয়া যাইতে পারেনা এবং দেওয়া হয়ও নাই। কারণ এই দুইটি উপদেশের একই ব্যক্তির জন্য এইরূপ মনে করিলে জ্ঞান ও কর্মের যে চিরন্তন বিরোধ তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। "জ্ঞানকর্মণো বিরোধং পর্বতবদকম্পাং ন স্মরসি কিং" (জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ যে পর্বতের ন্যায় অটল তাহা স্মরণ করিতেছ না কেন?)। সুতরাং যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিবেন এবং আত্মা বা ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী পূর্ব হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া না থাকিলে এবং ঈশোপনিষদের বিভিন্নস্থানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিচার করিলে এই ব্যাখ্যাকে কোনও মূল্য দেওয়া যায় না। এই উপনিষদে এমন কোনও কথা নাই যাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতে পারে যে প্রথম দুইটি শ্লোকে প্রদত্ত দুইটি উপদেশ দুই বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হইতেছে; পরন্তু এই উপনিষদের সমস্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহার মূল সুরই হইতেছে সমন্বয়বাদ এবং এই সমন্বয়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ঈশোপনিষদের উপদেশের অর্থ বুঝিতে হইবে। যাঁহাকে সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মায় সর্বভূত দর্শন করিতে বলা হইতেছে তাঁহাকেই কর্ম করিয়া

শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা করিতে দেওয়া হইতেছে—ইহাই এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। মূল শাস্ত্রে যাহা নাই কোনও বিশেষ মতবাদকে রক্ষা করিবার জন্য সেইরূপ কোনও অর্থ উহাতে প্রক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সর্বভূতের ও সর্ব জীবের একাত্মতা প্রচার করিলেও ঈশোপনিষদে মায়াবাদের কোনও স্থান নাই। জগৎপ্রপঞ্চ যে অলীক বা মিথ্যা অথবা যিনি সর্বাত্মকৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট পরিণামী জগৎ শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এরূপ কথা বলা হয় নাই। পরমাত্মারূপ চরম সত্যবস্তুর জ্ঞানকে যদি বিদ্যা বলা হয়, এবং পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞানকে যদি অবিদ্যা বলা হয় তাহা হইলে ঈশোপনিষদ বলিতেছেন যে, যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা দৃষ্টি-বিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যার উপাসনা করে (অর্থাৎ কেবল মাত্র ঐরূপ বিদ্যাতেই রত থাকে) তাহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। ঈশ ৯
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। ১১

"বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।) পরমপুরুষার্থলাভ করিতে হইলে অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়েরই প্রয়োজন। বিনাশী জগতের জ্ঞান এবং অবিনাশী অব্যয় তত্ত্বের জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বা অসৎ হইতে পারে না।

যে জ্ঞানের বিষয় অনিত্য, পরিবর্তনশীল এবং বহুত্ব-মণ্ডিত জগৎ, অদ্বৈত ব্রহ্মনিষ্ঠ উপনিষদে যে সেই জ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হইবে এবং যাহারা কেবলমাত্র সেইরূপ জ্ঞান লইয়াই ব্যাপৃত, অর্থাৎ অনিত্যবস্তুর চিন্তাতেই নিমগ্ন, তাহারা যে অন্ধকারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরম সত্য তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয় না এবং তাহাদের আত্মা জড়তাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইবে ইহাতে অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু সেই উপনিষদেই আবার যাঁহারা কেবলমাত্র বিদ্যার অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অথবা ব্রহ্মতত্ত্বে রত তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ইহা কিরূপে বলা হইল তাহা উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণের নিকট এক প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু ঈশোপনিষদের ১৮টি শ্লোকের মধ্য দিয়া সমন্বয় বাদের যে মূল সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা ধরিতে পারিলে ইহাকে আর প্রহেলিকা

বলিয়া মনে হইবেনা। একত্ব এবং বহুত্ব, নিত্যতা এবং অনিত্যতা, অবিনাশিতা এবং বিনাশিতা ইহারা যে পরম তত্ত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ ইহাই ঈশোপনিষদের মূল বক্তব্য। এক, নিত্য ও অবিনাশীকে উপেক্ষা করিয়া বহু, অনিত্য ও বিনাশীর যে জ্ঞান তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত। সুতরাং যাহারা কেবলমাত্র এইরূপ জ্ঞানেই রত তাহারা অন্ধকারেই বাস করে আর যাহারা বহু, অনিত্য ও বিনাশীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এক, নিত্য এবং অবিনাশীর ধ্যান করে তাহারা গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন; কারণ নানাবস্তুবিশিষ্ট এই অনিত্যজগতের অন্ততঃ প্রত্যক্ষও ত সকলেরই হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ জগতের জ্ঞান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন তাহা অন্ততঃ কিছুপরিমাণে জ্ঞানও ত বটে; কিন্তু সর্বপ্রকার ভেদ, বহুত্ব এবং বিশেষের সংস্পর্শবর্জিত যে ঐক্য বা নিত্যতা তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কোনও ধারণাই হয় না; সুতরাং একরূপ অদ্বয়-তত্ত্বে যাঁহারা নিরত তাঁহাদের অন্ধকার গভীরতরই বলিতে হইবে। এইজন্যই উপনিষদ বলিতেছেন যে অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়কেই একত্র করিয়া জানিতে হইবে। অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিরূপে ইহাও এক সমস্যা। মৃত্যু বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ "দেহের ধ্বংস" এই স্থলেও তাহা বুঝিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। ক্ষুধা, রোগ, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবের পক্ষে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য্য। কেবল খাদ্য দ্বারা মানুষ বাঁচিতে পারে না ইহা যেমন সত্য তদপেক্ষা অধিক রূঢ় হইতেছে এই যে, খাদ্য ভিন্ন মানুষ বাঁচিতেই পারেনা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আবার কোনওরূপে বাঁচিয়া থাকাই শেষ কথা নয়। "ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি" যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহার অস্তিত্বই সার্থক। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে এবং তাহার ফল অমৃতত্ব—অর্থাৎ সকল মোহ ও শোকের অতীত অবস্থা। বিদ্যা ব্যতীত অবিদ্যা অসম্পূর্ণ, আবার বিদ্যার সাধনা করিতে হইবে বলিয়া অবিদ্যাকে অবজ্ঞা করাও উচিত নয়।

শঙ্কর 'অবিদ্যা'র অর্থ করিতেছেন "বিদ্যাবিরোধী উপাসনাহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম" এবং বিদ্যা'র অর্থ করিতেছেন "দেবতাবিষয়ক জ্ঞান" অর্থাৎ "কর্ম্মবিহীন উপাসনা"। "অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ"। (শঙ্করভাষ্য) 'বিদ্যা'কে 'পরাবিদ্যা' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে লইলে বলিতে হয় যে, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় নিবিষ্ট তাঁহারা গভীর অন্ধকারময় লোকে গমন করেন। ব্রহ্মবাদী শঙ্কর একথা স্বীকার

করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি 'বিদ্যা'র অর্থ 'দেবতাজ্ঞান' করিয়াছেন। কিন্তু 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' কে শঙ্কর যে অর্থে লইয়াছেন ঈশোপনিষদের কোথাও তাহার কোনও ইঙ্গিত নাই। তৃতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোকে আত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সাধককে আত্মায় সর্বভূত দর্শন এবং সর্ব-ভূতে আত্ম-দর্শন করিতে বলা হইয়াছে। আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহাই এই কয়টি শ্লোকের মূল বক্তব্য। কোনও দেবতাবিশেষের ধ্যান করিতে হইবে ইহা বলা হয় নাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে সহসা দেবতাজ্ঞানের অবতারণা যেন অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয়। অপর পক্ষে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা আত্মঘাতী (আত্মহনোজনাঃ) তাহারা মৃত্যুর পর অন্ধতমসাবৃত লোকে গমন করে। আবার নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। ইহা হইতে এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহাদিগকেই আত্মঘাতী বলা হইতেছে এবং অবিদ্যার অর্থ আত্মাসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যার অর্থ 'যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভাব' হইলে 'বিদ্যা'র অর্থ 'যথার্থ আত্ম-জ্ঞান' এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। অন্যান্য উপনিষদের বহুস্থলেও অবিদ্যাকে আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বিদ্যাকে আত্ম-জ্ঞান অথবা ব্রহ্ম-জ্ঞান অর্থেই লওয়া হইয়াছে। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"। (কেন-২।৪)। অর্থাৎ, বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ হয়। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে "ব্রহ্মণো রূপম্" জানিবার কথাই হইতেছে, সুতরাং এখানে 'বিদ্যা'কে দেবতাবিষয়ক জ্ঞান অর্থে লইবার কোনও অবকাশ নাই। "ক্ষরন্ত্বিদ্যাহ্যমৃতং তু বিদ্যা" (শ্বেতাশ্বতর, ৫।১)। এ স্থলেও অবিদ্যার অর্থ যে অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান এবং বিদ্যার অর্থ পরাবিদ্যা অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। একমাত্র ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায় বৈদিক সাহিত্যের যত্রতত্র এই সত্য নানাভাবে নানাভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি", "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা, কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। (মুণ্ডক—১।১।৪)। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা" (প্রশ্ন-৬।৬), "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষসেতুঃ" (মুণ্ডক—২।২।৫)। শঙ্কর নিজেই শারীরক ভাষ্যে বলিতেছেন যে "পণ্ডিতাঃ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ"

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বস্তুর যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ (অর্থাৎ চরম তত্ত্বের জ্ঞান) তাহাকেই বিদ্যা বলেন। সুতরাং ঈশোপনিষদের অন্যান্য অংশের সহিত এবং অন্যান্য উপনিষদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অবিদ্যাকে অপরা বিদ্যা এবং বিদ্যাকে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যা অর্থে ব্যাখ্যা করাই যুক্তি সঙ্গত হইবে। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্বে বিশ্বাসী শঙ্কর অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায় ইহা স্বীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহাকে এই সকল শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া কাল্পনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু ঈশোপনিষৎ নিজেই যখন স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন যে বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়, এবং বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে একত্র করিয়া জানিতে হইবে তখন আমরা কোন্ যুক্তিবলে বলিব যে বিদ্যার অর্থ দেবতা-জ্ঞান এবং অমৃতত্বের অর্থ আপেক্ষিক অমৃতত্ব ?

বস্তুতঃ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে কৃত্রিম ও কাল্পনিক তাহা অপর একটি শ্লোক লইলেই অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় :

"সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥" ১৪

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিতেছেন যে এস্থলে সম্ভূতিকে অসম্ভূতি পাঠ করিতে হইবে ("সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ)। 'অসম্ভূতি'র অর্থ 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি' এবং 'বিনাশ'-এর অর্থ হিরণ্যগর্ভ। সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যানুযায়ী এই শ্লোকটির অর্থ হইবে—"যিনি অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃতা প্রকৃতি এবং বিনাশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এই দুইকে একত্র জানেন তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য অতিক্রম করেন। অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন) এবং অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ করেন" (অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যান)।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'সম্ভূতি'র স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিতে হইবে কেন তাহার সপক্ষে কোনও সুযুক্তি নাই। ইহার পূর্বে দ্বাদশ শ্লোকে 'অসম্ভূতি' এবং সম্ভূতি' এই দুইটি শব্দ আছে। সেই স্থলে শঙ্কর 'অসম্ভূতি'র অর্থ 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি' এবং সম্ভূতির অর্থ "ব্যাকৃত, উৎপত্তিশীল হিরণ্যগর্ভ" করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'সম্ভূতি' এবং 'বিনাশ' এই দুইটি শব্দ পাই। সম্ভূতি এবং বিনাশকে একত্র জানিতে হইবে। 'বিনাশ'-এর অর্থ অসম্ভূতি করা যায় না, কারণ তাহা হইলে 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি'কে বিনাশ বা বিনাশী বলিতে হয়। সুতরাং 'সম্ভূতি'কেই

'অসম্ভূতি' পড়িতে হইবে,—যুক্তিটা বোধ হয় ইহাই। কিন্তু এই যুক্তির যে বিশেষ মূল্য নাই তাহা সহজেই দেখান যাইতে পারে। নবম ও দ্বাদশ শ্লোক তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির প্রায় সমস্ত শব্দই ক্রমানুযায়ী বর্তমান, কেবলমাত্র 'অবিদ্যা'র স্থানে অসম্ভূতি এবং 'বিদ্যা'র স্থানে 'সম্ভূতি' এই দুই শব্দ দেখিতে পাই। ইহা হইতে 'অবিদ্যা' ও 'অসম্ভূতি' এবং 'বিদ্যা' ও 'সম্ভূতি' ইহারা একার্থক না হইলেও ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। দশম ও ত্রয়োদশ শ্লোক একত্র লইলেও বুঝা যায় যে বিদ্যা ও সম্ভব অর্থাৎ সম্ভূতির মধ্যে সম্বন্ধ আছে এবং অবিদ্যা ও অসম্ভব অর্থাৎ অসম্ভূতির মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অবিদ্যা দ্বারা যেমন মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেইরূপ অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং বিদ্যা দ্বারা যেমন অমৃত লাভ হয় সম্ভূতি দ্বারাও তেমনই অমৃত লাভ হয় এইরূপ বলিলেই সঙ্গতি রক্ষা হয়। পরন্তু, 'সম্ভূতি'র স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিলে 'অসম্ভূতি'র উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ হয় এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং এই ব্যাখ্যা পূর্বেকার কয়েকটি শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং মূল শাস্ত্রের কোনও শ্লোকে স্পষ্টতঃ 'সম্ভূতি' শব্দ থাকিলেও তাহাকে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিতে হইবে ইহা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

তাহা হইলে 'সম্ভূতি'র অর্থ কি? 'সম্ভূতি' ও 'বিনাশ'কে যখন (বিদ্যা এবং অবিদ্যার ন্যায়) একত্র জানিতে বলা হইতেছে তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে সম্ভূতি ও বিনাশ পরস্পরবিরোধী। 'বিনাশ' এর অর্থ যদি বিনাশী অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ ধরা যায় তাহা হইলে 'সম্ভূতি'র অর্থ হইবে 'অবিনাশী' অর্থাৎ ব্রহ্ম। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই পংক্তিটির সহিত "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে" এই পংক্তির তুলনা করিলে দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ হইবে—"বিনাশী জগতের দ্বারা (অর্থাৎ জাগতিক দ্রব্য যথা খাদ্যাদি দ্বারা) মৃত্যু উত্তীর্ণ হইলে অবিনাশী ব্রহ্মের দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

পরিপূর্ণ আধ্যাত্ম জীবনের জন্য জ্ঞান ও কর্মের যেরূপ প্রয়োজন ভক্তিরও সেইরূপ প্রয়োজন। ঈশোপনিষদের শেষের চারিটি শ্লোক একটি প্রার্থনা এবং ব্রহ্মের প্রতি উপান্ত উপাসকের ভাব হইতে উদ্ভূত। ঋষি ব্রহ্মকে পূষা নামে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে, সেই আবরণ অপসারিত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর, তোমার পরম মঙ্গলময় রূপ দর্শন করাও"। আবার অগ্নি নামে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমাদিগকে সুপথে সমৃদ্ধির দিকে চালিত কর

আমাদের নিকট হইতে সকলপ্রকার কুটিল পাপ বিদূরিত কর। তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করিতেছি"। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়া জীবের পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরতা এবং তাঁহার অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে পরমেশ্বরকে করুণাময় পরিত্রাতা এবং পবিত্রতার আধার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং নিষ্পাপ নিষ্কলুষ জীবনের জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী সাধকও ঈশোপনিষদের সমর্থন লাভ করিবেন। কিন্তু ঈশোপনিষদে যে ভক্তির কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানের সহিত সম্পর্করহিত অন্ধভক্তি নয়, অথবা কোনও স্বৈরাচারী শাসকের নিকট দুর্ব্বল ব্যক্তির নতিস্বীকারও নয়। ভক্ত যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজের একাত্মতাও উপলব্ধি করিবেন, ইহাই ঈশোপনিষদের উপদেশ। জ্ঞানবর্জিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মবর্জিত জ্ঞান যেমন উভয়েই অসম্পূর্ণ, তেমনই জ্ঞানবর্জিত ভক্তি এবং ভক্তিবর্জিত জ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঈশোপনিষদের দার্শনিক মতকে ভেদাভেদ বাদ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, আবার ব্রহ্ম ও জীবও ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এইভাবে দ্বৈতবাদ বা বহুবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আবার, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ নিরসন করিয়া ঈশোপনিষৎ আমাদের সম্মুখে এক পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

———

জ্ঞানের স্বরূপ

অনাদি কুমার লাহিড়ী

ইংরেজী 'Knowledge' 'জ্ঞান' কথাটির অর্থ এতই অস্পষ্ট ও দুর্নিরীক্ষ্য যে কোন একঅর্থে ইহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। 'জ্ঞানে'র সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও 'জ্ঞান' পদার্থকে এরূপ সহজ এবং সাধারণ আকারে তুলিয়া ধরে যে, ইহার সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা অবান্তর,—দুরূহ ও নিষ্ফল বলিয়া প্রতীত হয়। আলোচনা কালে ইহার ধারণা এমন অপসৃয়মান রূপে দেখা দেয়, ফল যাহার ফলে জ্ঞান' সম্পর্কে অধিবিদ্যাবিষয়ক গবেষণার অসুবিধা সুপ্রকট হইয়া পড়ে। 'জ্ঞান' পদটির অর্থ নিম্নোদ্ধৃত অন্ততঃ তিন প্রকারে সাজানো যাইতে পারে :—

(১) যে কোন সংবিদ্ (সর্ব্বব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক অর্থ) ;

(২) সেই সকল সংবিদ্—যাহাদিগকে হয় 'সত্য' অথবা, 'মিথ্যা' বলিয়া নির্ণীত করা যায় ;

(৩) সেই সকল সংবিদ্—যাহারা সকল সময়েই সত্য হিসাবে নির্ণীত হইবার যোগ্য ; ('জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ও সম্ভবতঃ সুব্যবহৃত অর্থ)

দার্শনিক প্রবর কাণ্ট্ 'জ্ঞান'কে এমন এক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা উপরিউক্ত তৃতীয় অর্থ হইতে সঙ্কীর্ণতর,—এই অর্থে, সার্ব্বিক ও অপরিহার্য্য সংবিদ্ সকলই 'জ্ঞান' গঠন করে।

এখন হইতে আমরা প্রথম অর্থেই 'জ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করিব—কারণ ইহাই জ্ঞানের সর্ব্বব্যাপক অর্থ, যাহা অপরাপর অর্থগুলিকে একভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সময়ে সময়ে আমরা ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ দুইটিরও উল্লেখ করিব। ইহাতে 'জ্ঞানে'র জটিল ও সচরাচর ব্যবহৃত প্রয়োগরূপ আলোচিত হইতে পারে।

'জ্ঞান'-পদের সরাসরি কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভবপর নয় ; সেই কারণে প্রচলিত পদার্থগুলির উল্লেখে এর এক বর্ণনা বা পরিচয় দাঁড় করানো যায়। ভাবরূপ সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলিকে আমরা সচরাচর দ্রব্য, গুণ, সম্পর্ক ও ক্রিয়া-নামক পদার্থগুলির অধীনস্থ করি। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'জ্ঞান'কে কোন্ হিসাবে গ্রহণ

করা যায়—ইহা কি দ্রব্য ? না গুণ ? না ক্রিয়া ?—না সম্পর্ক ?—না কতকগুলির সংমিশ্রণ ?

প্রথমতঃ দেখা যাক্, 'জ্ঞান' দ্রব্য কিনা। 'দ্রব্য' বলিতে আমরা বুঝি এমন এক পদার্থ যাহা গুণ ও ক্রিয়ার একটি বা উভয়ই ধারণ করে। সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ণতা বা অপূর্ণতা, স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা, সত্য বা মিথ্যা প্রভৃতি গুণ জ্ঞানে আশ্রিত হয়। 'উল্লেখ', 'পরিচিতি' প্রভৃতি সম্পর্কও জ্ঞান ধারণ করে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে জ্ঞানকে দ্রব্য বলিতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু আমরা যদি খেয়াল রাখি যে, প্রকৃত দ্রব্য স্ব-নির্ভরশীল হইবে (অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে) এবং স্বয়ং অন্য কোন দ্রব্যের গুণ বা ক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত হইবে না,—তবে আমরা কোন মতেই 'জ্ঞান'কে দ্রব্য বলিতে পারি না। অনেকেই জ্ঞানকে জ্ঞাতার গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত করেন। আশ্রয়হীন জ্ঞানের কল্পনা করা যায় না। ইহা কোন না কোন ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। আবার অনেক চিন্তাশীল-ব্যক্তির মতে জ্ঞান একরূপ সম্পর্কও বটে ; যদিও ইহা বাহ্য-সম্পর্ক না আন্তর সম্পর্ক—সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, জ্ঞান কখনই 'দ্রব্য' রূপে সমাদৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাক্, 'জ্ঞান'কে কেবল গুণ বলা যায় কিনা। যেহেতু 'জ্ঞান', দেহান্তর্গত ও দেহ-বাহ্য বিষয়-সমূহের সহিত সচেতন জ্ঞাতার প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্ভূত, সেইহেতু ইহাকে বিষয়ী-আত্মার অধিকৃত এক নবোৎপন্ন ফল বলিয়া বিবেচনা করা যায়। জ্ঞাতার অতীত অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, সংস্কারাদির দ্বারা সু-নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল চেতনাত্মা সর্ব্বদাই তাহার বিশিষ্ট জ্ঞানাকারে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করে ; আর সেইভাবে 'জ্ঞেয়' বা 'জ্ঞানে'র আকারে মানসিক বস্তুগুলিকে সাজায়। এইভাবে সমুৎপন্ন জ্ঞান বিষয়ী-জ্ঞাতার উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। অতএব যুক্তি যুক্তভাবেই জ্ঞানকে জ্ঞাতার গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সর্ব্বব্যাপক অর্থে যে জ্ঞান—অর্থাৎ টেবিল-চেয়ার, বাস্তুমান ঘণ্টা, সুগন্ধিপুষ্ট বা সুমিষ্ট খাদ্য—প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-রূপ বিশেষ বিশেষ চেতনা বুঝাইতে যে জ্ঞান, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এইরূপ প্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত সংবিদ সকল এক ধারাবাহিক প্রবাহে চেতন-মনের মধ্যে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। ফলে দেখা যায় যে, এই ব্যাপক অর্থে, জ্ঞান জ্ঞাতাকে খুবই স্বল্পকালের জন্য এবং নিতান্ত বাহ্যভাবে উপহিত করে। কিন্তু যখন সঙ্কীর্ণতর অর্থে জ্ঞান বলিতে বুঝি—"বিষয়-শৃঙ্খল-

অনুসারী এবং পারস্পরিক সঙ্গতিতে আবদ্ধ শীল এক ধারণা-শৃঙ্খল"—তখন জ্ঞাতাকে" সুচির-কালের জন্য প্রভাবান্বিত করায় আমরা 'জ্ঞান'কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি। বিক্ষিপ্ত সংবিদ্ হিসাবে 'জ্ঞান' যদি জ্ঞাতার পরিবর্ত্তন-ধর্মী গুণ হয়, নির্দ্দিষ্ট ধারণা সমষ্টি হিসাবে 'জ্ঞান'কে তবে জ্ঞাতার এক অ-পরিবর্ত্তনশীল গুণ বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জ্ঞানের জটিল ও স্থায়ী আকারগুলিও জ্ঞানের সরলতমরূপ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত সংবিৎসকল হইতেই উৎপত্তিলাভ করে।

জ্ঞানের জটিলতর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা সহজেই দেখি যে, বিশেষ অভিজ্ঞতা সকলের নির্বাচন, বিমূর্ত্তন ও সামান্যী করণের ফলে তাহারা রূপ-পরিগ্রহ করে। উচ্চস্তরের জ্ঞানের মধ্যে স্মৃতিও বিশেষ অংশ-গ্রহণ করে। যেহেতু অর্জ্জিত অভিজ্ঞতারাশির সহিত স্মৃতি নূতন কিছুর সংযোগ-সাধন করেনা, সেইহেতু ইহাকে 'জ্ঞান'-আখ্যা দিতে অনেকেই আপত্তি করেন। কিন্তু স্মৃতি যদি পরবর্ত্তী সাফল্য-জনক প্রতিক্রিয়া সকলের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী হয় তবে স্মৃতিকে অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। স্মৃতপদার্থগুলি যদি জ্ঞান গঠন করে, তবে সহজেই বুঝা যায় জ্ঞান এক আকারে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীগুণ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। সযত্নে সঞ্চিত, প্রয়োজনকালে স্মৃত এবং কার্য্যকালে ব্যবহৃত ধারণা সকল জ্ঞাতার অবিচ্ছেদ্য গুণ হিসাবে রূপ-পরিগ্রহ করে। তাকিকের দৃষ্টিতে অবশ্য জ্ঞানের কোন আকারকেই আত্মার স্বরূপান্তর্গত গুণ বলা চলেনা; কারণ কোন জ্ঞানেরই স্থায়িত্ব সচেতন আত্মার বা শুদ্ধচৈতন্যের স্থায়িত্বকালের সম-ব্যাপক নহে। উন্মাদনা, স্মৃতি-হীনতা, স্বপ্নকালীন ক্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অ-প্রাকৃত মানসিক—ব্যাধিতে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল অস্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্র বিবেচনা করিলে, বলিতে হয় যে, ব্যাপক দৃষ্টিতে জ্ঞানের সকল রূপই জ্ঞাতার অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ গুণমাত্র। যখন আমরা বলি 'ক-এর এইরূপ জ্ঞান আছে', 'খ একজন জ্ঞানী বা শিক্ষিত ব্যক্তি'—ইত্যাদি তখন আমরা জ্ঞানকে ব্যক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশক ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পদার্থ-সংলগ্ন বস্তু-গুণ হইতে গুণ হিসাবে 'জ্ঞান' অনেক পৃথক। 'রঙ্' 'শব্দ' প্রভৃতির মত জ্ঞাতার সহিত জ্ঞানের কোন দেশগত বা কালগত সম্পর্ক নাই। জ্ঞাতার সহিত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-রূপ গুণ পরিবর্ত্তনশীল

বা আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এক প্রভাব হিসাবেই দেখা দেয়। জ্ঞাতা তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়-সমূহ হইতে বিশেষ প্রণিধানের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান-রূপগুণ উৎপন্ন করে। বস্তু-গুণের সম্পর্কে কিন্তু একথা আদৌ প্রযোজ্য নহে।

এখন দেখা যাক্ জ্ঞান'কে কোনরূপ সম্পর্ক রূপে স্থির করা চলে কিনা। জ্ঞানকে সম্পর্ক হিসবে স্থির করিবার পূর্ব্বে জ্ঞান ও সম্পর্কের প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ ধারণা রাখা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে যে, উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানের উদ্ভব। উজ্জ্বল রশ্মিজাল যেরূপ সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে সমুদ্ভাসিত করে, সেইরূপ চৈতন্যগুণও তাহার সম্মুখে উপস্থিত বস্তু-সমূহ হইতে স্বীয় প্রণিধানের সাহায্যে জ্ঞানের বিশেষ আকার-সকল প্রস্তুত করিয়া লয়। চৈতন্য বা জ্ঞান-রূপ ক্রিয়া সকল প্রকার জ্ঞানের এক স্থায়ী (আপেক্ষিকভাবে) সর্ত্ত। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নতা জ্ঞাতার সম্মুখে প্রদত্ত বিষয়গুলির বিভিন্নতার উপরই নির্ভরশীল। বিষয়ের উপস্থিতি ও সামগ্র আকারে জ্ঞানের এক অপরিহার্য্য ও নির্দ্দিষ্ট সর্ত। তবে বিষয়-সমূহের বিভিন্নতা ধরিলে, জ্ঞানের এই সর্ত অত্যন্ত অস্থির ও অনির্দ্দিষ্ট। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে জ্ঞান দুইটি সর্তের সমবায়ে উৎপন্ন হয়।

এখন 'সম্পর্কের প্রকৃতি অনুধাবণ করা যাক্। 'সম্পর্ক' বলিতে বুঝায় 'কোন সংযোগকারী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক ঘটনা-শৃঙ্খল'। যখন আমরা বলি যে, দুইটি বস্তু পাশাপাশি বা একটি অন্যের উপর রক্ষিত আছে, তখন আমরা বুঝি কোন এক নির্দ্দিষ্টভাবে বস্তু দুইটি এক পূর্ণ দেশের অন্তর্গত। আবার যখন 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা' পরস্পর এক আন্তর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, তখন সেই সম্পর্ককে আমরা এমন এক কারণ-শৃঙ্খরূপে চিন্তা করিতে পারি যাহাতে কারণ ও কার্য্য পরস্পর সম্পৃক্ত। এখন দেখিতে হইবে যে জ্ঞান তাহার কোন আকারেই সম্পর্ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা। প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে জ্ঞান স্বয়ং—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কে উদ্ভূত এক ফল (এই সম্পর্কটি আলেক্জাণ্ডারের মতানুযায়ী) সহাবস্থিতির হইতে পারে ও কার্য-কারণেরও হইতে পারে। এইরূপে সমুৎপন্ন জ্ঞান আবার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের—উভয়ের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট হইতে পারে। অধিকারী জ্ঞাতার সহিত 'জ্ঞান' আঙ্গিকভাবে বা সংযোগ—প্রভাবাদিভাবে সম্পর্কিত থাকিতে পারে। কোন আকারে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞানের সমবায় সম্পর্কও আবিষ্কার

করা যায়। অপরপক্ষে, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞান উল্লেখ, ব্যাঞ্জনা বা প্রত্যক্ষ পরিচিতির সম্পর্কে যুক্ত থাকিতে পারে। সম্পর্ক হিসাবে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের ক্রিয়া (বা 'জানা')-রে জ্ঞানের ফল (বা 'জ্ঞাত') হইতে কতখানি বিবিক্ত করা যায়। ইহাও পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারভেদে জ্ঞানের মানসিক রূপগুলির (contents) সহিত জ্ঞানের বস্তুগুলির (objects) কি সম্পর্ক আছে। যদি বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানের সাহায্যে স্থির করা যায় যে, জ্ঞানের কোন ফলকে (product) জ্ঞানের ক্ষেত্রে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বন্ধনকারী এক জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় ('process') পর্য্যবসিত করা যায়, তবে সেই জ্ঞান নিশ্চিতই কোন প্রকার সম্পর্ক হইবে। আবার যদি দেখা যায় যে, জ্ঞানের মানসিক রূপ ও বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক পরিপূর্ণ একাত্মতা বা বিভেদের নহে, কিন্তু সেই সম্পর্ক অস্থির ও গতিশীল, তবে সেই অবস্থায় 'জ্ঞান'কে কোন এক সম্পর্করূপে দাঁড় করানো যায়। আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জ্ঞানের এই মানসিক আকার (content) ও বাহ্য বিষয়ের (object) সম্পর্ক বিষয়ে এতই ভিন্নমত পোষণ করেন যে, তাঁহারা জ্ঞানের প্রকৃতি ও মর্য্যাদা সম্পর্কে বিপরীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। ভাববাদীদের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র ব্যক্তি—আত্মায় বিশ্বাসী তাঁহারা জ্ঞানের সকল আকারেই জ্ঞানের মানসিক রূপ (content) ও বস্তুকে একীভূত করেন এবং মনের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। দার্শনিক বার্কলের মতে জ্ঞান অনেকাংশেই এক আন্তর সম্পর্ক—যাহা সম্পর্কের এক পদকে (relatum) গঠনও করে। ইহা এমন এক সম্পর্ক যাহা জ্ঞাতার এক অপরিহার্য্য ধর্ম্মও বটে। জ্ঞান একরূপ সম্পর্কই—কারণ 'জানা'র আকারে জ্ঞান এমন এক ভাব সমষ্টি গঠন করে যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক শৃঙ্খলে বিধৃত। হে-গেল প্রমুখ দার্শনিকগণের ব্যাপকাত্মক ভাববাদে জ্ঞানের মানসিক বিষয় (content) ও বাহ্য-বস্তু কেবলমাত্র অবাস্তব ধর্ম্মে পৃথক—মূলতঃ তাহারা সর্ব্বব্যাপক একই আত্মা বা ভাবের ভিন্নরূপ অভিব্যক্তিমাত্র।

এই মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সারভূত যে জ্ঞান তাহা স্বয়ং দ্রব্যস্বরূপ এবং ইহার দ্বারা সম্মিলিত দুইটি পদেরই গঠনকারী।

কাণ্টের দর্শনে জ্ঞানের বিষয় ও বস্তু (content ও objct) অভিন্ন এবং উভয়ই মনের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু বা স্ব-স্বরূপ বস্তুনিচয় (things-in-themselves)

হইতে পৃথক। এই মতে আমরা জ্ঞানের দুইটি ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা লক্ষ্য করি। জ্ঞান বলিতে যখন বুঝি যে সংশ্লেষাত্মক, অভিজ্ঞতাপূর্ব্ব (synthetic, apriori) এক বচন সমষ্টি—তখন জ্ঞানকে যেন ইহার প্রক্রিয়া হইতে পৃথক এক সিদ্ধ ফল রূপে গণ্য করা হয়। আর সেই আকারে জ্ঞানকে কখনই এক সম্পর্ক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু অন্যত্র জ্ঞানের উৎপত্তি বর্ণনাকালে কান্ট্ এ কথাও বলেন যে, উপস্থাপিত ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় সমূহের (sense-manifold) সংস্পর্শে বোধি ও বুদ্ধি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে (forms of sensibility ও categories of understanding) জ্ঞাতা জ্ঞান গঠন করে; এবং নির্দ্দিষ্ট ছাঁচগুলিকেও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মাত্র পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই রূপ ব্যাখ্যানে জ্ঞান এক আন্তর সম্পর্ক হিসাবেই আত্ম-প্রকাশ করে; কারণ এই জ্ঞানের সম্পর্কিত পদ-দ্বয়ের অন্ততঃ একটিকে জ্ঞান নিজে গঠন করে। এই মতে, জ্ঞানের মানসিক বিষয় ও জ্ঞানের বস্তুকে (content ও object) পরস্পর পৃথক করা যায় না।

সাধারণভাবে বলিতে হইলে, বাস্তববাদী সকল দর্শনেই জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুকে—বস্তু-স্বাধীনতার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, একাত্ম করা হইয়াছে। জ্ঞানের বস্তু সকলকে মনের অতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে ধরা হয়; আর 'জ্ঞান'কে বস্তুর আকস্মিক ও অবান্তর বাহ্য পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। কতিপয় নব্য-বস্তুবাদী মতে 'জ্ঞান' স্নায়ু-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিশিষ্ট এক বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি মাত্র। এই মতে, জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগকারী এক বাহ্য-সম্পর্কবিশেষ ও একই কালে জ্ঞাতার সচল ধর্ম্মও বটে।

সাধারণভাবে প্রায় সকল সমালোচনা-মূলক বাস্তববাদীদর্শনে জ্ঞানের বিষয় (content) ও বস্তুর (object) মধ্যে এক ভেদ-রেখা টানা হয়। এই মতানুযায়ী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-বস্তুর মধ্যবর্ত্তী 'জ্ঞানের বিষয়' বাহ্য-বস্তুর এমন এক ছায়া বা ইঙ্গিত যাহার ভিত্তিতে বস্তুর স্বরূপ জানিবার প্রয়াস করা হয়। জন লক্ প্রমুখ কতিপয় দার্শনিকের মতে 'জ্ঞানের বিষয়' এক মানসিক ধারণা। সেই হিসাবে ইহাকে জ্ঞাতার ধর্ম বলা যায়। কিন্তু অপর কয়েকজনের মতে—যেমন নব্য সমালোচনা মূলক বাস্তববাদে, 'জ্ঞানের বিষয়' সকল মানসিক বা বাহ্য কোন পদার্থ নয়—কিন্তু একরূপ ভাববস্তু। ব্যাপক অর্থে, মানসিক বিষয়গুলিকে যদি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এই জ্ঞান স্বয়ং কোন সম্পর্করূপে গণ্য হইতে পারে না। ব্র্যাড্‌লের দর্শনে,

আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ এক নূতন সম্পর্কের ধারণা লক্ষ্য করি। বচন বা বচনের সমষ্টি হিসাবে 'জ্ঞান' অবশ্যই সম্পর্ক-রূপী; আর এই জ্ঞান কখনই প্রকৃত বস্তু বা সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেনা। সংযোগ-কামী চিন্তার এবং চিন্তাও চিন্তেতরে পার্থক্যে উদ্ভূত ফল হিসাবে 'জ্ঞান'-কে এক অর্থে সম্পর্ক-রূপী বলা যায়; যদিও এই 'জ্ঞান' এক আংশিক বস্তু-সত্তার মর্য্যাদা উপভোগ করে ও পরিশেষে, পরমতত্ত্বে রূপ-পরিবর্তন করে।

নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুর মধ্যে বা জ্ঞানের ক্রিয়া ও ফলের মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞানের সম্পর্কের রূপ এক নয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের বস্তুর সহিত মিলিয়া যায়। আর এই জ্ঞানে, ক্রিয়া ও ফলের মধ্যেও পার্থক্য ও বিশেষ সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ--গোচরীভূত সংবিদ সকল সহজভাবে জ্ঞানের বস্তুর দিকে আগাইয়া যায়।

এই একই তথ্য 'বেদান্ত পরিভাষা'য় প্রকারান্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যইন্দ্রিয়দ্বারের মাধ্যমে বহির্গত হইয়া বিষয়-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্তরে, 'জ্ঞান'কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগকারী এক সম্পর্ক-হিসাবে গণ্য করা যায়। 'স্মৃতি'তে স্পষ্টভাবেই বিষয় ও বস্তুর মধ্যে এক ভেদলক্ষ্য করা যায়। কারণ অন্ততঃ 'সজীবতা' ও 'কালে'র দিক হইতে স্মৃত বিষয়-সকল, স্মৃতির বস্তু সকলের সহিত এক হইতে পারে না। জ্ঞাতার স্বরূপের সহিত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধফল হিসাবে স্মৃতির বিষয়গুলিকে জ্ঞাতার একরূপ গুণ বলা চলে। আবার যেহেতু, স্মরণকে ক্রিয়ার আকারে ধরা যায় এবং স্মৃতি-ছায়াগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবেই সচল ও বস্তু-সূচক বলা যায়, সেহেতু স্মৃতির বিষয়কে এক ধরণের সম্পর্করূপে গণ্য করা যায়; এই সম্পর্ক জ্ঞাতা ও অতীত বস্তু সকলকে সংযুক্ত করে। চিন্তা, অনুমান, তর্ক প্রভৃতি জ্ঞানের জটিল প্রকারগুলিতে আমরা বিষয় (যাহা জ্ঞানের ফলও বটে) ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করি। অতীন্দ্রিয় বস্তু-সকল, মানসিক বা তর্ক-সিদ্ধ ঘটনাকারে নির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের দ্বারা সূচিত বা উল্লিখিত হয়। আর এই সকল বিষয় স্বয়ং সম্পর্ক-হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অধ্যাস, অমূল-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অ-প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহে, ব্যাপক অর্থে যে-জ্ঞান, তাহা সম্পর্কের এক পদ গঠনকারী আন্তর-সম্পর্ক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অতএব আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে

পারি যে জ্ঞানের মাত্র কয়েকটি প্রকারই সম্পর্করূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এখন আমরা জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক বিশেষ দার্শনিক মত আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, জ্ঞান তাহার কুটস্থ স্বরূপে কেবলমাত্র মূল্যবান নহে, জগতের এক (বা একমাত্র) সার পদার্থ। বলা হয় যে আরও অনেক বস্তুর মত, জ্ঞানেরও দুইটি দিক্ আছে—(১) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মিলনে উদ্ভূত এবং স্বীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে সুপ্রকাশ, একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য দিক ও (২) শুদ্ধ চৈতন্যরূপী, অভিজ্ঞতাতিরিক্ত অপর একটি দিক। জ্ঞানের এই বাহ্য দিক্ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি।

বর্তমানে, আমরা জ্ঞানের এই 'চৈতন্য'রূপী সার প্রকৃতির স্বরূপ পরীক্ষা করিব। 'চৈতন্য' বলিতে আমরা যদি অদ্বৈত বেদান্তের নিরাকার, অনির্দ্দেশ্য পরম সত্তা বুঝি, তবে আমরা সেইরূপ চৈতন্যকে কখনই 'জ্ঞান' আখ্যা দিতে পারি না। শুদ্ধ চৈতন্য—জ্ঞানের এক নিয়ত, অপরিহার্য সর্ত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কখনও 'জ্ঞান' গঠন করে না। সর্বব্যাপক অর্থেও আমরা যে 'জ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করি, তাহা উৎপত্তিলাভের জন্য 'জ্ঞাতা' ও জ্ঞেয় বস্তু—উভয়েরই প্রয়োজন অপেক্ষা করে। বস্তুহীন, নিরাকার চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহা **কোন কিছুকে, কোন কিছুর নিকট** প্রতিভাত করে না। কর্ম্মকর্তৃ-বিরোধের জন্য একই বস্তু, একই কালে কখনও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—উভয়রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। আর সেই কারণে, এই অনির্দ্দেশ্য চৈতন্য নিজেকে নিজের বিষয় করিতে পারে না। স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ চৈতন্য পরমতত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সেই কারণেই, ইহা স্বাতিরিক্ত বস্তু উল্লেখকারী 'জ্ঞান' বলিয়া কখনই বিবেচ্য হইতে পারে না। সুতরাং 'জ্ঞান' হইতে হইলে 'জ্ঞান'কে অবশ্যই ইহার সর্ব্বজনস্বীকৃত (বাহ্য) অভিজ্ঞতা-মূল স্বরূপটি ধারণ করিতে হইবে। 'জ্ঞানে'র এই অভিজ্ঞতা-পর স্বভাবের বিমূর্ত্তন করিলে আমরা 'জ্ঞানের কোন সার-স্বরূপে উপস্থিত হই না—বরং 'জ্ঞানে'র সার-ধর্মেরই বিনাশ ঘটাই। অদ্বৈত-বাদী বেদান্তীরা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন যে, শুদ্ধ চৈতন্য দ্রষ্টাহীন ও দৃশ্যহীন দৃকমাত্র। কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকৃত যে 'জ্ঞান' তাহা 'জ্ঞাতা' ও জ্ঞেয়বস্তু'-রূপ অপরিহার্য সর্ত্ত দুইটির অপেক্ষা করে। অদ্বৈত প্রমাণশাস্ত্রে, বৃত্তিনামধেয় মানসিক প্রকার রূপ কতকগুলি স্বীকৃত সত্যের সাহায্যে 'জ্ঞান-প্রক্রিয়া'র ব্যাখ্যা করা হয়। আর এই সকল মানসিক রূপ বা বৃত্তি—কেবলমাত্র চৈতন্য, জড়ধর্মী সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ এবং বস্তুর সমবায়ে সমুৎপন্ন হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট আকারসকল বিশিষ্ট যে মন তাহাও প্রকাশ্য বা

অপ্রকাশ্যভাবে কোন না কোন জ্ঞাতার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। এমন কি চরম-পূর্ব অবস্থায় 'আমিই ব্রহ্ম'—এই প্রকার যে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় তাহাতেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক সূক্ষ্ম ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং এই জ্ঞানাবস্থা—অবিভাজ্য, অনির্দ্দেশ্য নিরাকার চৈতন্য রূপ পরম-সত্তার এক নীচের স্তরের সূচনা করে। অতএব শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে ইহাকে জ্ঞানোত্তর পরমার্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানেরই প্রয়োজনীয় বা সত্তাধর্মী অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ স্বভাব হিসাবে এই চৈতন্যকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

এখন এক আপত্তি উঠিতে পারে যে চৈতন্যকে অদ্বৈত-বেদান্তের নিরাকার, অনির্দ্দেশ্য ও শুদ্ধ চৈতন্য হিসাবে না ধরিয়া রামানুজীদের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ও সাকার চৈতন্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। রামানুজের মতে, চৈতন্য সর্ব্বদাই সবিকল্পক এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের নির্দ্দেশকারী। চৈতন্যমাত্রই কোন কাহারও কর্তৃত্বাধীন, কোন কিছু সম্পর্কীয়। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে এইরূপ চৈতন্য একই কালে সার বস্তু ও গুণ—উভয়ই। নিত্য যে আত্মা বা অহং-কর্ত্তা তাহা নিজে চৈতন্যও বটে আবার চৈতন্য-গুণ-বিশিষ্টও বটে। সুতরাং রামানুজ-বর্ণিত চৈতন্যকে 'জ্ঞান' আখ্যা দিলে, 'জ্ঞান' চরম ও নিত্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ আমাদের ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, জ্ঞান গুণ ব্যতীতও দ্রব্য বা সার-বস্তু হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই মতে কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ ইহা বুঝা কষ্টসাধ্য যে, একই চৈতন্য সারবস্তুও বটে আবার গুণও বটে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল অবচ্ছেদক জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদসীমা দেখায়, সেগুলি অভেদাত্মক চৈতন্যকে জ্ঞানের সাধারণ সর্ত্ত হিসাবেই মাত্র সূচিত করে, কিন্তু তাহাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আখ্যা লাভ হইতে বঞ্চিত করে। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মের জ্ঞান ও (ব্রহ্ম জ্ঞানের কর্ত্তা হিসাবে—যদি আদৌ সেকথা বলা চলে) কেবল চৈতন্যাশ্রয়ী জ্ঞান উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, আমরা চৈতন্যকে একই কালে সারবস্তু ও গুণ দুই-ই বলিতে পারি না। 'জ্ঞান' সম্পর্কে এমন মতও দেখা যায় যে 'জ্ঞান' মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ বস্তু এবং শিক্ষার কার্য হইল অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত বা দূরীভূত করিয়া স্বাভাবিক জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈত-মতেরই এক ভাষ্য। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমরা বলিতে পারি যে 'জ্ঞান'কে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নেতিবাচক ভাবে ব্যাখ্যা করিলে জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। 'ব্রহ্ম' ও 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ সমার্থক পদ নহে। অতএব জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।—'জ্ঞান'

প্রধানতঃ গুণের পর্যায়ে পড়ে। আমরা দেখিয়াছি যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' এক বিশেষ প্রকার সম্পর্কও বটে ; কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের সম্পর্ক-রূপ দেখা যায়, সেই সকল স্থলে, 'জ্ঞান' 'গুণ-হিসাবেও এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদা বজায় রাখে। অতএব কোন রূপেই 'জ্ঞান' কেবলমাত্র সার চৈতন্য নয়।

'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' বিভাগ অনুসারে, আমরা সম্ভাবনার দিক হইতে 'জ্ঞান'কে নিম্নলিখিত চারিটি পর্য্যায়ে বসাইতে পারি :—(১) 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ 'নিষ্ক্রিয়' (২) 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ 'সক্রিয়', (৩) 'জ্ঞান' 'সক্রিয়' 'নিষ্ক্রিয়' উভয়ই ; (৪) 'জ্ঞান' সক্রিয়ও নহে, নিষ্ক্রিয়ও নহে—নিরপেক্ষ এক পদার্থ।

'জ্ঞান' সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় -এই আলোচনার প্রাক্কালে আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র প্রক্রিয়া হিসাবেই (process-wise) 'জ্ঞানের' সম্পর্কে এই বিতর্কের অবতারণা সম্ভবপর। কেননা, সিদ্ধ ফল হিসাবে 'জ্ঞান' সকল সময়েই নিষ্ক্রিয়। এখন উল্লিখিত চারিটি পর্য্যায়ের প্রথম তিনটি দর্শনের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

(১) প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের মতে, জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তাঁহার নিকট মন এমন এক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানশূন্য স্বচ্ছ পদার্থ যাহার উপর বাহ্য অভিজ্ঞতা বিশেষ রূপ বসায়। 'সংবেদন' ও 'চিন্তন'—রূপ দুই দ্বারপথে ধারণা-সকল উৎপত্তিলাভ করে। সংমিশ্রণের নিতান্ত প্রাকৃতিক (বা যান্ত্রিক) নিয়মাবলীর সাহায্যে সেই সকল ধারণার নানারূপ সংগঠন সম্ভব হয়। সরল বা মিশ্র—কোনরূপ ধারণা গঠনেই মনের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার হয় না। জ্ঞানের সংজ্ঞাদানকালে লক্ বলেন যে, জ্ঞান ধারণাসকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষকারী এক পদার্থ। কিন্তু এই 'প্রত্যক্ষ' সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। লকের এই অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তি-সিদ্ধ পরিসমাপ্তির পথে টানিয়া আনিয়া 'হিউম' বলেন যে, 'জ্ঞান' বস্তুতঃ সংবেদন-ধারামাত্র—আর এই সকল সংবেদন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও বাহ্য উপায়ে সংযুক্ত হয়।

সমালোচনা : 'জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়'—এই যে মত উপরে প্রকাশিত হইল, তাহা কতকগুলি সুস্পষ্ট প্রমাদের জন্য কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রধানতঃ লকের মতবাদ সমালোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে পারি :—

(ক) কাণ্টের কথা স্মরণ করাইয়া আমরা বলিতে পারি যে, মনের সংশ্লেষধর্মী ক্রিয়া ব্যতীত কোন জ্ঞানই গঠিত হইতে পারে না। সংশ্লেষাত্মক মনের এই ক্রিয়া—

প্রত্যক্ষ, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা রূপ তিন প্রধান ক্রিয়ার মাধ্যমে সুব্যক্ত হয়। কোন সংশ্লেষনকারী, অভেদাত্মক চৈতন্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদনগুলি ভিত্তিহীন এবং কোনরূপ সংঘটন-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কাণ্টের অনেক পরে ব্রাড্‌লে সহ-মিশ্রণ নীতি (Doctrine of Association) নামক অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তি-শাস্ত্রের যে মনোবিজ্ঞানী ভিত্তি—তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এই নীতি-অনুসারে, বিশেষ, একক পরমাণু-স্বভাব মানসিক বিষয় সকলের সংযোগ-সাধনেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু ব্র্যাড্‌লে প্রশ্ন করেন যে, যে মানসিক অংশ সকল আবির্ভূত হইতে না হইতেই তিরোভূত হয়—তাহারা কি ভাবে অন্যকে বিধৃত করিবার কোন সাধারণ ভিত্তি সূচিত করে? ব্র্যাড্‌লে আরও বলেন যে, যে সহ-মিশ্রণের জন্যও মানসিক বিষয় সকলের পক্ষে প্রভেদ ও রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক নিয়ত অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা বাদীদের বিপক্ষে ব্র্যাড্‌লে এই মতবাদ প্রচার করেন যে, সকল সহ-মিশ্রণই জাতি-সকলের মধ্যেই সংঘটিত হয় ('All association is between universals'). 'সহ-মিশ্রণের নীতি সমালোচনা করিয়া তিনি 'বচন' (বা 'ভাবনা') সম্পর্কীয় মতবাদে উপনীত হন। তাঁহার মতে, 'ভাবনা'—উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ঐক্য বিধানকারী এক ক্রিয়া।

(খ) অতি প্রাথমিক প্রত্যক্ষ সমূহেও মানসিক বিচার নিহিত থাকে। অতএব, ধারণা সমূহের প্রাকৃতিক সংগঠন বা সংবেদন সমূহের বহিঃ প্রকাশ এবং (লকের মতানুযায়ী) পরবর্তীকালে, সেই সকলের বাহ্য প্রকৃত বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ—প্রভৃতি স্বীকৃত ভিত্তি সকল মনোবিজ্ঞান-সম্মতও নহে যুক্তি বিজ্ঞান সম্মতও নহে—অলীক কল্পনামাত্র এবং সেই কারণে অগ্রাহ্যযোগ্য। সমালোচনা হিসাবে বলা যায়, জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ ও সহজভাবেই বস্তুর নির্দেশ করে।

(গ) স্বীয় অভিজ্ঞতা বাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া লক্ যদি বলেন যে ধারণা সকলের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য বোধগ্রাহী প্রত্যক্ষ স্বয়ং প্রাকৃতিকভাবে ধারণার বাহ্য সংযোগে উৎপন্ন হয়— তবে এই প্রত্যক্ষের স্বরূপ বোধের জন্য দ্বিতীয় এক প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয়; তজ্জন্য আবার তৃতীয় এক প্রত্যক্ষের আবশ্যক হয়—এবং এইভাবে এক অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। অপরপক্ষে, উল্লিখিত প্রত্যক্ষ যদি সংশ্লেষাত্মক ও সক্রিয় প্রনিধানের আকার ধারণ করে—তবে প্রত্যক্ষ স্বয়ং এক প্রকার জ্ঞান বলিয়া, জ্ঞানের এই সক্রিয়তা অপরাপর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত না করার কোন

যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। তাহা হইলে, 'জ্ঞান যে নিষ্ক্রিয়'—সেই মতবাদ একেবারে বাতিল হইয়া যায়।

(২) 'জ্ঞান যে সক্রিয়'—এই মতের প্রধান ও বলিষ্ঠ পরিপোষক হইলেন দার্শনিক লাইবনিৎস্। তাঁহার মতে, প্রতি নিশ্ছিদ্র চেতনাণুর ('windowless monad'-এর) অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয়ের উপর বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন চেতনাণু যত সক্রিয় হইবে তত বেশী পরিষ্কার ও পরিস্ফুটভাবে জ্ঞানের প্রকাশ করিবে। জ্ঞানের পরিচায়ক যে নিরন্তরক্রিয়া তাহা অস্ফুট ক্রিয়াবেগে (appetition) বা অচেতন মানসিক বিষয়ের চেতনাবস্থার প্রতি নিরন্তর গতির মাধ্যমে অনুভূত হয়। লাইবনিৎস্ দর্শনে 'অন্ধ ক্রিয়াবেগ' জ্ঞানের নিয়ামক বলিয়া তাঁহার মতে জ্ঞান শতকরা শতভাগই ক্রিয়া। স্বামী বিবেকানন্দের এক নেতিবাচক মতে, 'জ্ঞান' আত্ম-সচেতনতার প্রকাশ হইলেও, সিদ্ধ বিষয় বলিয়া আদৌ ক্রিয়াত্মক নহে।

সমালোচনা : জ্ঞানের এই ক্রিয়াবাদ সম্পূর্ণ আকারে, বিশেষতঃ সকল প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। যদিও আমরা স্বীকার করি যে জ্ঞানের মধ্যে মনের এক সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়া অন্তর্নিহিত থাকে, তৎসত্ত্বেও আমরা ইহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না যে, সকল প্রকার 'জ্ঞান সম্পূর্ণ ক্রিয়া'। অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় যে, ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষসমূহে আমাদের মন অতি সামান্য অংশেই ক্রিয়াধর্মী। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থও সজাগ থাকিলে, স্বাভাবিক-ভাবেই জ্ঞান উৎপত্তি-লাভ করে। অনুমান তর্ক প্রভৃতি জ্ঞানের উচ্চতর প্রকারেও আমরা উপাদান হিসাবে যে সকল অভিজ্ঞতাগুলিকে পাই সেইগুলিও প্রায় বিনা আয়াসে অল্পাধিক নিষ্ক্রিয়ভাবে পাই। অনেক জ্ঞানই আমরা এত শীঘ্র লাভ করি যে, সে সকলে মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। আবার ইহাও সত্য যে, যে জ্ঞান লাভে মানসিক অনুশীলনের প্রয়াস তীব্রভাবে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানে ত্রুটি বা অস্পষ্টতা প্রায়ই দেখা যায়। অতএব জ্ঞান যে পুরাপুরি এক ক্রিয়া সেই মত একদেশদর্শী, অসংস্কৃত ও দোষযুক্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(৩) 'জ্ঞান যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়ই'—এই মতের বিশিষ্ট পরিপোষক হইলেন কাণ্ট। তাঁহার মতানুসারে, ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান সমূহের উপর মানসিক প্রকারগুলির প্রয়োগের ফলে জ্ঞান উদ্ভূত হয়। দেশাকারে ও কালাকারে রূপায়িত প্রত্যক্ষগুলি বা বোধিগুলি ইন্দ্রিয় পথে উপস্থিত হয় আর চৈতন্যের ঐক্যশক্তি কল্পনাকারের মাধ্যমে, বুদ্ধির নির্দিষ্ট ধরণগুলির সাহায্যে তাহাদের উপর ক্রিয়া করে।

স্বরূপাবস্থিত (সর্গনবীন) বস্তুসমূহ হইতে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রভাব লাভ করে এবং ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রভাব সকল হইতে 'জ্ঞান বা জ্ঞাত বস্তুসমূহ' (phenomena) গঠন করে। এইভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞান নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার এক সংমিশ্রণ।

সমালোচনা : আলোচিত মত তিনটির মধ্যে শেষোক্ত মতটিই যুক্তিযুক্ত। ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় ও সক্রিয় মনের ক্রিয়া—এই উভয়ের সংমিশ্রণে সংগঠিত জ্ঞান আংশিকভাবে সক্রিয় ও আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কাণ্টের মতের কিছু সংশোধন প্রয়োজন। প্রথমতঃ চিন্তার স্ব-বিরোধ না ঘটাইয়া বিজ্ঞাত বস্তু ও স্ব স্বরূপাবস্থিত বস্তুর মধ্যে আমরা সীমারেখা টানিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ কাণ্টের মতানুযায়ী আমরা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানিতে পারি না। কারণ অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যেও আমরা মনের বিচার-শক্তির অন্তর্ভুক্তি ও কতকগুলি সাধারণ (ও ব্যাপক) জাতির প্রয়োগ লক্ষ্য করি। প্রাথমিক প্রত্যক্ষ-সমূহেও মনের সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। সংবেদন ও উপলব্ধির মধ্যে কোন অস্বাভাবিক পৃথকীকরণ (বা বিমূর্ত্তন) স্বীকার করা যায় না।

ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষরূপে কতকগুলি জ্ঞানে যেমন নিষ্ক্রিয়তার অংশটি প্রধান, সেইরূপ অনুমান, তর্কাদি অপর কতক প্রকার মানসিক অনুশীলন সম্বলিত জ্ঞানে সক্রিয়তার অংশই সুব্যক্ত। অতএব বলা যায় যে, জ্ঞানে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মাত্রাগত তারতম্য আছে।

প্রসঙ্গত ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন আমরা বলি যে, জ্ঞানের এক ক্রিয়ার দিক আছে, তখন এই ক্রিয়া বলিতে আমরা যেন দৈহিক ক্রিয়া না বুঝি। যদিও অবধারণ, পর্যাবেক্ষণ প্রভৃতির দিগ্‌দর্শনকারী হিসাবে, জ্ঞানে পেশী-নিয়ন্ত্রণাদি দৈহিক ক্রিয়া অল্পাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তথাপি এই ক্রিয়ার উপর ভিত্তি-স্থাপিত মানসিক ক্রিয়ার সহিত এই দৈহিক ক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা সমজাতীয়তা নাই। কতকগুলি জ্ঞানে যেরূপ জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় অত্যধিক মানসিক অনুশীলনের সহিত কিছু দৈহিক ক্রিয়া সহ-গমন করে—সেইরূপ অপর কতক জ্ঞানে, ইহার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

যেহেতু আমরা জ্ঞানের স্বরূপ-বিশ্লেষণে দেখিয়াছি যে জ্ঞান অংশতঃ সক্রিয়

মূল সিদ্ধান্ত :—এখন আমরা এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান মুখ্যতঃ এক প্রকার গুণ ও বাহ্যতঃ এক প্রকার সম্পর্ক। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞান সক্রিয় ও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে। নেতিবাচক ভাবে বিচার করিলে, স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছি যে 'জ্ঞান' তাহার আন্তর স্বরূপেও দ্রব্য বা নিছক সারতত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

ন্যায় শাস্ত্রে অনুমানের বিভাগ

শ্রীকীর্তোদ চন্দ্র মাইতি এম. এ.

ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত অনুমানের বিভাগ বিবেচনায় প্রথমেই যাহা লক্ষ্য করিবার তাহা এই যে ১।১।৫ গৌতমসূত্রোল্লিখিত (ক) পূর্ব্ববৎ (খ) শেষবৎ ও (গ) সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ বিভাগকে আদিভাষ্যকার বাৎসায়ন ভিন্ন কেহই অঙ্গীকার করেন নাই, "অথতৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমাং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টং চ"—নির্দেশ অস্বীকার করিয়া পরবর্তী সকল নৈয়ায়িক যেভাবে অনুমানের বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে এই শাস্ত্রের পুনর্জাগরণের অনেক সুবিধা হয়।

পরবর্তী গ্রন্থ ন্যায়বার্ত্তিক-কার উদ্যোতকর সূত্রনির্দিষ্ট 'ত্রিবিধ' শব্দের বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—"ত্রিবিধমিতি। অন্বয়ী, ব্যতিরেকী, অন্বয়ীব্যতিরেকীচেতি"। তিনি "ত্রিবিধ"শব্দকে 'শেষবৎ' প্রভৃতি বিভাগের বিবেচনার শেষে (১) প্রসিদ্ধ (২) সৎ ও (৩) অসন্দিগ্ধ এই ত্রিবিভাগেরও উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ এমতে অনুমানের বিভাগ নয় প্রকার। তবে ১।১।৩৭-৪ সূত্রবার্ত্তিক আলোচনা দেখিলে মনে হয় আচার্য উদ্যোতকর নিজ নির্দিষ্ট বিভাগের তৃতীয়টী অর্থাৎ "অন্বয়ব্যতিরেকী" অনুমানকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। "অসন্দিগ্ধে"র লক্ষণরূপে—"অসন্দিগ্ধমিতি সজাতীয়াবিনাভাবি" বলিয়া অনুমানের সহিত 'অবিনাভাবে'র সম্বন্ধ নির্দেশ দেখা যায়।

ন্যায়বার্ত্তিক—তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মূলবার্ত্তিকাভিমত সমগ্র নয়টি বিভাগই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু মূল গ্রন্থ নির্দিষ্ট পথে "অন্বয়ব্যতিরেকী" অনুমান বিভাগকে ১।১।৫ সূত্রটীকায় সুপ্রাতষ্ঠ করিয়া ১।১।৩৫ সূত্রের 'কেবল ব্যতিরেকী' বিভাগের ও সঙ্কেত করিয়াছেন, বার্ত্তিককারের সৎ' বিভাগ (বাৎসায়ন) ভাষ্য সূত্র—"সদ্বিষয়ং চ প্রত্যক্ষং সদসদ্বিষয়ং চানুমানমিতি ভাষ্যম্" —বিবেচনা প্রসঙ্গে "অনুমানস্য প্রত্যক্ষবৈলক্ষণম্" প্রকরণ রূপে যে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন তাহা নব্য অন্বীক্ষিকীর (Neo-logic) গুরুত্বপূর্ণ অংশসন্দেহ নাই। তিনিই ১।১।৩ সূত্রে 'শক্তি নিরূপণ' প্রসঙ্গে ব্যাপ্তি লক্ষণ সঙ্কেতিত করিয়াছেন।

মধ্যবর্তী অন্য কোনও গ্রন্থ নাম অজ্ঞাত থাকায় পরবর্তী গ্রন্থকার হিসাবে ও অংশতঃ নিষ্ক্রিয়—অতএব চতুর্থ সম্ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান সক্রিয় ও নহে, নিষ্ক্রিয় ও নহে —এই মত সহজেই বর্জ্জিত হয়:

গৌড়-নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের গ্রন্থদ্বয় বিষয় আমাদের আলোচনার সহায়ক, হয়ত তিনিই বাচস্পতির পরবর্তী নৈয়ায়িক। এই জয়ন্তনৈয়ায়িকের "ন্যায়মঞ্জরী"তে ১।১।৭ (পৃ—১৪২) এবং ।১।৩৭ (পৃঃ—২য় খণ্ড। ১৩৪ সূত্র) প্রসঙ্গে বাচস্পতির স্থাপিত "অন্বয় ব্যাতিরেকী" —ও আলোচিত "কেবল ব্যাতিরেকী" (পৃঃ—২য় খণ্ড। ১৩৭) স্থাপনার এবং "কেবলান্বয়ী"র উল্লেখ পাওয়া যায়; তৎপূর্বে ১ম সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৯ম পৃষ্ঠায় এক কারিকা দ্বারা এই শাস্ত্রে সর্বপ্রথম "পরার্থানুমানে"র বীজ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

ন্যায়াভিধানে অবয়বাঃ পরম্ প্রত্যুপ যোগিনঃ।
পরার্থমনুমানং চ তদাহ ন্যায় বাদিনঃ।

কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার "ন্যায়কলিকা" নামক ন্যায়নিবন্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত নয়টি—বিভাগের আলোচনা ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত একেবারে "পরার্থনুমান" বিভাগও স্বীকার করিয়াছেন, ইহার কারণ স্বরূপ "বৈশেষিকের" পদার্থ সংগ্রহভাষ্য বা বৌদ্ধাচার্য ধর্ম-কীর্তির "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থের প্রভাব গণ্য হইতে পারে। "ন্যায়কলিকা" গ্রন্থে উদ্যোত করের বিভাগ স্বীকারে "অন্বয়ব্যাতিরেকবান প্রথমঃ। ব্যতিরেকী দ্বিতীয়ঃ। কেবলান্বয়ী-হেতুর্নাস্তেব" উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্ব্যতীত বাচস্পতির অতি মূল্যবান সর্বলোকসিদ্ধ নিয়ম অস্বীকার করিয়া নব্য ন্যায়ের বীজস্বরূপ—"অবিনাভাবো-ব্যাপ্তি নিয়ম প্রতিবন্ধঃ সাধ্যাবিনাভাবিত্বামিত্যর্থঃ—(পৃঃ—২) সূত্র মিলে। তবে "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে কার্যকারণ মূলীভূত সমবায়কে "শেষবৎ" ও "পূর্ববৎ" অনুমানের সহিত আলোচনা (পৃঃ—১০৬) করিতে দেখা যায়।

উল্লিখিত তাৎপর্যটীকা-কার মৈথিল সবিশভ গ্রামবাসী বাচস্পতি মিশ্রের পৌত্র 'কেশব মিশ্র' "তর্কভাষা" নামক গ্রন্থে অনুমানের বিভাগরূপে স্বার্থ ও পরার্থ এই দ্বিবিধ মাত্র স্বীকার করিয়াছেন'। জয়ন্ত ভট্টের সূত্র সংশ্রব বর্জিত "ন্যায়কলিকা" নিবন্ধানুরূপ এই গ্রন্থে অনন্তভট্ট পুত্র কেশবই সর্বপ্রথম বৌদ্ধমত সিদ্ধ অনুমান বিভাগদ্বয়ের আলোচনায় বলিয়াছেন—"তচ্চানুমানং দ্বিবিধং স্বার্থং চেতি। স্বার্থং স্বপ্রতিপত্তিহেতুঃ। এতদ্ভিন্ন পরার্থানুমানের অবয়বীভূত হেতুলক্ষণ প্রসঙ্গে "কেলান্বয়ী, কেবল ব্যাতিরেকী ও অন্বয়ব্যাতিরেকী" বিভাগত্রয়ের আলোচনা দেখা যায়। কাজেই মিশ্র কেশবের মতে এই ত্রিবিধ বিভাগ মূল অনুমানের বিভাগ না হইয়া পরার্থনুমানের হেত্ববয়বের বিভাগ মাত্র। অর্থাৎ "তর্কভাষা"কার স্বীয় পিতামহ মত অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ ভিন্নমতের কারণ স্বীয় গ্রন্থের উপর তৎপ্রণীত টীকা "তর্কদীপিকা" গ্রন্থ (অক্সোর রাজদরবারে রক্ষিত হস্তালিপি হইতে) মুদ্রিত না হওয়া

পর্য্যন্ত জানা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত নব্যন্যায়ের সম্পূর্ণ বিকাশের পরে যিনি নব্যন্যায় প্রকরণ স্রষ্টার তনয় হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন সূত্র প্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেই বর্ধমানোপাধ্যায় রচিত উক্ত গ্রন্থের "তর্কপ্রকাশ" নাম্ন মূলাবান টীকাও আলোয়ার রাজদরবারের দুর্ভেদ্য গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার করিয়া মুদ্রণ করা আবশ্যক।

অনুমানের প্রকৃত বিভাগরূপে পরিগণিত না হইলেও ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থরূপে পরবর্তী প্রকরণ "সপ্তপদার্থী"তে কেবলান্বয়ী (কলিকাতা সংস্করণ, সূত্র ১২৮) কেবল ব্যতিরেকী (ঐ—১২৯) ও অন্বয় ব্যতিরেকী (ঐ—১৩০) স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগদ্বয় (ঐ—১৩২ সূত্র) স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত দেখিতেছি। বিভাগদ্বয় ব্যাখ্যায়—"স্বার্থত্বমর্থরূপত্বম্। পরার্থত্বম্ শব্দরূপত্বম্" পাইতেছি। এই সূত্রের পরবর্তী অংশে পরার্থ অনুমানেই যে অনুমান প্রমাণে গ্রাহ্য তাহা প্রশস্তপাদের "পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ" ভাষ্যাভিমত এক সিদ্ধান্তে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অনুমানের পূর্ব্বাচার্য স্বীকৃত বিভাগ পরার্থের সহিত উল্লিখিত স্বার্থ বিভাগ উভয়কে উক্ত সূত্র শেষাংশ আলোচনা দ্বারা অনুমানের বিভাগ বলিয়া স্বীকারের সুবিধা আইসে।

এখন প্রশ্ন এই যে গৌতম সূত্র স্বতন্ত্র এই বিভাগদ্বয়ের স্বরূপ কি? "স্বার্থত্বম্—অর্থরূপত্বম্" সূত্র ব্যাখ্যায় জিনবর্ধন সুরি বলিয়াছেন—"যৎপরবচনানপেক্ষমর্থং পদার্থনেবাবলোক্য অনুমিতিজ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎস্বার্থম্" এবং "পরার্থত্বম্ শব্দরূপত্বম্" সূত্র ব্যাখ্যায় উক্ত ব্যাখ্যাকারের অনুরূপ উক্তি এই এই যে—"শব্দঃ পরোপদেশঃ বাক্যং তদ্রূপত্বম্ পরার্থত্বম্"। গ্রন্থখানির Introduction এ সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় স্বার্থ ও পরার্থ শব্দদ্বয়ের অনুবাদরূপে স্বার্থ for one's self ও পরার্থ—for another বলিলেও জিনবর্ধনের ব্যাখ্যাদ্বয় হইতে স্বার্থ Immediate ও পরার্থ-mediate অনুবাদ সঙ্গত বলিয়া সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থের নিজস্বকৃত "তর্কদীপিকা" টীকায় অন্নমভট্ট স্বার্থানুমান তত্ত্ব নির্ণয়ে বলিয়াছেন—সামান্য লক্ষনা প্রত্যাসাত্তি জ্ঞান সদৃশবাৎ (পৃঃ—৩৮) এবং আচার্য Athlye মতে প্রত্যাসাত্তি is a kind of immediate inference। আমাদের এই অনুবাদ যথার্থ কিনা পরবর্তী আলোচনার দ্বারা বিবেচনা করা যাইবে।

যে সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তু এই প্রবন্ধের উপযোগী হইতে পারে অথচ মুদ্রনাভাবে তাহারা অপ্রাপ্য তাহাদের বিবেচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পরবর্তী গ্রন্থকাররূপে সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্যের "ন্যায় লীলাবতী" আমরা আলোচনা

করিব। গ্রন্থখানিতে পূর্বালোচিত "সপ্তপদার্থীর" মত ন্যায় বৈশেষিক প্রকরণ বলিয়া কেবল ন্যায়সূত্র নির্দিষ্ট "পূর্ববৎ, শেষবৎ" প্রভৃতি অনুমান বিভাগের আশা না রাখিয়া অন্যান্য বিভাগের আশা করা স্বাভাবিক কিন্তু ইহাতে অনুমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেরূপ কিছুই নাই। পরন্তু "ন্যায়" শব্দের ব্যাখ্যারূপে-ন্যায় পরার্থানুমানম্" বলিয়া উক্ত বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা ৫৯৯—৬০৫ পর্যন্ত দেখা যায়। তবে "বৈধর্ম্য পরিচ্ছেদে"র গুণ লক্ষণ প্রকরণে—"অনুমানং স্বার্থং পরার্থং চ। স্বার্থং ব্যাপ্তি পক্ষ ধর্মতা সংবেদনম্ অনুমিতৌপয়িক সমস্তরূপোপেত বস্তুবাচকং বাক্যং পরার্থম্ (পৃঃ—৭৭৫—৭৭৪)" উক্তি করিয়া অনুমান বিভাগও তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির 'প্রকাশ' টীকাকার বর্ধমানোপাধ্যায় মূলের অনুমানের শেষে "ব্যাপ্তি পৃঃ—৪১৭।৮)" প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় "কেবলান্বয়ী' ও "ব্যতিরেকী" প্রসঙ্গের সামান্য-মাত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত উপায় কারক ৬০০ পৃষ্ঠার প্রকাশে "স্বস্বার্থ বিশিষ্টজ্ঞানং" বলিয়া ন্যায় পরীক্ষা প্রসঙ্গে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা দ্বারা অনুমান বিভাগ বুঝায় কিনা তাহা বুঝিতে গেলে অন্যান্য উপটীকাকার না হউক অন্ততঃ রঘুনাথের "দীধিতি"র মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাচস্পতির 'তাৎপর্যটীকা'র উপর উদয়নের "পরিশুদ্ধি" রচনার ফলে মূল গৌতমসূত্র আলোচনায় যে উপেক্ষাভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উক্ত বর্ধমানোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত নব্যন্যায় গঠন মূলক যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ সৃষ্ট হইতেছিল তাহাদের মধ্যে একমাত্র "মনিকণ্ঠ মিশ্র" প্রণীত "ন্যায়রত্ন" গ্রন্থ আমরা মুদ্রিত অবস্থায় পাইতেছি। এই পুনর্গঠন যুগের অন্যতম মুদ্রিত গ্রন্থ শশধরাচার্যের "ন্যায় সিদ্ধান্তদীপ" এবং ইহা আদৌ ন্যায় গ্রন্থ নহে পরন্তু সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা প্রকরণ, কাযেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুপযোগী। মনিকণ্ঠের "ন্যায়রত্ন" সূত্রাত্মক নহে, সম্পূর্ণরূপে বিচার মূলক। প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণদ্বয়ের আলোচনা ইহাতে নাই এবং ইহা একেবারে বৈশেষিক সংস্রব শূন্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক ব্যাপার এই যে, যে অনুমান প্রমাণ আলোচনায় গ্রন্থখানির অধিকাংশ অংশ ব্যবহৃত সেই অনুমানের আলোচ্য কোনও প্রকার বিভাগ লইয়া গ্রন্থকার একেবারে মাথা ঘামান নাই। কেবল গ্রন্থের প্রথমে তর্কপাদ আলোচনায় একবার (পৃঃ—১৭) এবং পরবর্তী ব্যাপ্তিবাদ আলোচনায় দুইবার (পৃঃ—৪৪।৪৬) "কেবলান্বয়িনি" শব্দটীর উল্লেখ পাইতেছি।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—কার শ্রীহর্ষের পরবর্তী টীকা উপটীকা বর্জিত এই গ্রন্থখানিতে এরূপ নিরাশ হওয়ায় আমরা সত্যই বিমূঢ় সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা নব্যন্যায়ের পরিণতির যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। গৌতম সূত্র বর্জিত হইলেও নব্যন্যায়ের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ গঙ্গেশের "তত্ত্বচিন্তামণি"তে আমরা চতুর্বিধ প্রমাণ বিষয়ের আলোচনা পাইতেছি। তবে চারিখণ্ডের মধ্যে 'অনুমান খণ্ড'ই যে পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া টীকা উপটীকা সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রালোচক মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু মূল অনুমান চিন্তা মণিগ্রন্থে 'পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট' বিভাগত্রয়ের আলোচনা নাই; তবে ১৭।১৮।১৯ প্রকরণে যথাক্রমে 'কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি ও অন্বয়ব্যতিরেকি' বিভাগত্রয় বিবেচিত হইয়াছে। ইহারা যে অনুমানের বিভাগ পরন্তু পরার্থানুমানের অবয়বের বিভাগ নহে, তাহা গণ্য করিয়া 'কেবলান্বয়ি'র প্রথমেই বলা হইয়াছে যে—"তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি 'কেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকিভেদাৎ'। তবে ইহারা যে স্বার্থানুমান বিবেচনা সংশ্লিষ্ট তাহা বলিতে গিয়া অন্বয়ব্যতিরেকির প্রথমে—"তহি সংশয় প্রসিদ্ধং সাধ্যং তস্য চ ন ব্যতিরেক নিশ্চায়কত্বমিত্যুক্তত্বাৎ স্বার্থানুমানে তদভাবাচ্চ" এবং শেষে (অর্থাপত্তিরপূর্বে)—"অন্যচ্চ ব্যতিরেকি প্রকার স্বার্থএব—পরংপ্রতি সাধ্যা প্রসিদ্ধা প্রতিজ্ঞাদ্যসম্ভবাদিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্"—উক্তি দ্বারা বুঝা যায়। অনুমান চিন্তামণি কার গঙ্গেশ যে এই প্রমাণের দ্বিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন তাহার প্রমাণে উল্লিখিত উদ্ধৃতিদ্বয় ছাড়া ৪র্থ প্রকরণ পূর্ব্বপক্ষ পরিচ্ছেদের শেষে—"স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তি স্বরূপ নিরূপনং বিনা কথায়াম প্রবেশাদিতি" এবং অবয়ব প্রকরণের প্রথমে—"তচ্চানুমানং পরার্থং ন্যায় সাধ্যমিতি ন্যায়স্তদবয়বাশ্চ" উক্তিদ্বয় দ্বারা সুপরিস্ফুট। "কেবলান্বয়ী" ও কেবল—"অন্বয়ব্যতিরেকি বিশেষদ্বয় সামগ্রীচিন্তাভাব" উক্তিদ্বারা ইহারা অস্বীকৃত হইয়াছে। তবে অন্বয়ব্যতিরেকি বিভাগ যে মীমাংসা দর্শনের অন্যতম প্রমাণ "অর্থাপত্তি"র সম্যক বিবেচনার উপযোগী তাহা স্বীকার করিয়া এতৎ সংশ্লিষ্ট প্রকরণরূপে উক্ত প্রমাণ আলোচিত দেখা যায়; অর্থাৎ মণিকার পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ হইতে এই অর্থাপত্তি প্রকরণ পর্যন্ত অংশে অন্তঃশীলারূপে স্বার্থানুমানের আলোচনা চালাইয়া গিয়াছেন।

যদিও আচার্য গঙ্গেশ ব্যাপ্তি ও সামানাধিকরণ্য ভিত্তিতে তাঁহার নিজস্ব পন্থায় অনুমান প্রকরণ ও তদ্বিভাগ আলোচনা করিয়াছেন তথাপি ন্যায়সূত্র এবং বৌদ্ধন্যায় স্বতন্ত্র এই ত্রিবিধ বিভাগের গুরুত্ব পরীক্ষা জন্য "ন্যায় ভাস্কর" প্রভৃতি গ্রন্থের অভাবে

কেশব মিশ্র প্রণীত "তর্কভাষা"র অনুমান বিভাগ প্রকরণের সহিত তুলনামূলক বিবেচনা আবশ্যক। হয়তো গঙ্গেশ পুত্র বর্ধমানের "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" গ্রন্থমুদ্রিত অবস্থায় হাতে পাইলে আমাদের আরও সুবিধা হইত কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি, স্বর্গত গঙ্গানাথ ঝা সংগ্রহীত দুইখানি এবং বিশ্বভারতী সংগ্রহীত একখানি মিলাইয়া প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বর্তমান পন্থা ছাড়া উপায় নাই। জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়কলিকা" নিবন্ধেই আমরা দেখিয়াছি যে পরার্থানুমান (পঞ্চরাত্রি) অবয়ব ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইহা স্বার্থানুমান নিরপেক্ষ নিজস্ব ধারা চালিত। চিন্তামণি গ্রন্থেও আমরা সেই নীতি স্বীকৃত দেখিতেছি কিন্তু "তর্কভাষা" ইহা অস্বীকার করিয়া স্বার্থানুমানকে কোনও ভিত্তিতে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পরার্থানুমানের অবয়ব বিবেচনায় উক্ত ত্রিবিধ বিভাগের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের মূল্যবান টীকাদ্বয় উদ্ধার করিয়া তৎসাহায্যে এই প্রয়োগের কারণ নির্ধারণ আমাদের বিষয়বস্তুর সম্যক আলোচনার জন্য আবশ্যক। কারণ ইহার ফলে গঙ্গেশ ও বর্ধমানোপাধ্যায় এই পিতা পুত্রদ্বয়ের ন্যায় ধারণার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের কারণ ধরা পড়িবে।

আমরা আচার্য গঙ্গেশের পরবর্তী প্রায় সকল ন্যায় রচয়িতাকে গৌতম সূত্রসিদ্ধ বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগ স্বীকার করিতে দেখিতেছি। কাযেই কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ পদার্থকে অনুমানের বিভাগরূপে স্বীকারের কোনও সার্থকতা নাই; তবে অবয়বের পরিবর্তে ন্যায় পরীক্ষার ব্যবহার চলিতে পারে এবং অনুমান চিন্তামণি মতানুযায়ী অন্বয়ী ব্যতিরেকী সিদ্ধ অর্থাপত্তিকে পরার্থের অনুক্রমরূপে স্বীকারের আবশ্যকতা আছে; তর্কভাষা—কার প্রভৃতি মতে অর্থাপত্তির ভিত্তিমূলক অন্বয়ব্যতিরেকীকে পরার্থানুমান প্রসঙ্গেই আলোচিত দেখা যায়।

এখন বিবেচ্য এই যে স্বার্থানুমানের বিস্তৃত বিবেচন উদ্দেশ্যে কি সূত্র নির্দিষ্ট করা যায়। আচার্য গঙ্গেশের "স্বার্থানুমানোপযোগী ব্যাপ্তি স্বরূপ নিরূপনং বিনা কথায়াম প্রবেশাদিতি"—সূত্র হইতে "কথা" এই সুনির্দিষ্ট সূত্রকে আমাদের এই বিবেচনোদ্দেশ্যে পাইতেছি। ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য টীকায় ১।২।১ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—তথাচ প্রবক্তৃক বিচার বিষয় বাক্য সন্দর্ভঃ কথেতি (চৌখাম্বা সংস্করণ; পৃঃ—৩:৫)। আচার্য মণিকণ্ঠের ন্যায়রত্ন মতে—"পারিভাষিকাভিধান মানহেতু ভাসাদি নিরাকর্তব্যতা জ্ঞান জন্যং বাক্যং কথা (পৃঃ—১৪৬)"; এই কথার উপযোগীতা সম্বন্ধে উক্ত ন্যায়রত্নকারের অন্যতম উক্তি

এই যে—"তত্ত্বমুক্তং স্বকথায়ামুপেক্ষনীয়াস্যাসুদ্ভাব্যত্বাৎ প্রথমবাদো নোদ্ভাবয়তি (পৃঃ—১৪৫)" অর্থাৎ কথাদ্বারা স্বার্থানুমানে উদ্ভাবন (conversion) ক্রিয়া সম্পাদন হইতে পারে। জগৎগুরু জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন "ন্যায় সিদ্ধান্তমালা" গ্রন্থে এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে এই উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্ভাবন ব্যতীত আরও দুইটী উপযোগীতার উল্লেখ অনুমান চিন্তামণির উল্লিখিত "অন্বয়ব্যতিরেকী" প্রকরণে এবং অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটির প্রথমটি উত্থাপনকে obversion রূপে এবং অন্যটী উপস্থাপনকে Inversion রূপে স্বার্থানুমানের গ্রাহক বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যকতা আছে।

পরার্থানুমানের অবয়ব সংখ্যা পঞ্চবিধ বলিয়া সাধারণতঃ গ্রাহ্য করা হইয়া থাকে ; কিন্তু তদ্ভিন্নরূপও যে স্বীকৃত ছিল তাহার উল্লেখ "ন্যায়রত্ন" গ্রন্থের—"প্রতিজ্ঞা হেতুদাহরণ রূপমবয়বত্রয়মিত্যন্যে (পৃঃ—১৩৫)" উক্তি হইতে পাইতেছি। কাযেই বর্ত্তমান পরার্থানুমানকে ত্রাবয়বীরূপে সহজেই স্বীকার করা যায় এবং বর্ধমানের 'কিরনাবলীপ্রকাশ' টীকামতে ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কথাগুলির গুণ ও ব্যাপকতার বিভিন্নতানুযায়ী ইহার অঙ্গ নির্ণীত করা যাইতে পারে। উক্ত টীকামতে—"মূর্তিবৃত্তি-তাবচ্ছেদক গুণব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব ইত্যর্থঃ (পৃঃ—১৭)" এবং এই সূত্র হইতে অঙ্গ সমূহকে মূর্তি (Moods) বলা যাইবে। সূত্রটী হইতে আরও পাওয়া যায় যে মূর্তত্ব শব্দটীকে তিন অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে ; যথা—(১) সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থে লইলে একটি ন্যায়ের তিনটি কথারই গুণ এবং ব্যাপকতা দ্বারা তাহার যে আকার নির্ণীত হয় তাহাই তাহার মূর্তি (২) তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যাপক অর্থে লইলে একটি ন্যায়ের হেতুবাক্য দুইটির গুণও ব্যাপকতার দ্বারা যে আকার নির্ণীত হয় তাহাই মূর্তি এবং (৩) সঙ্কীর্ণ অর্থে লইলে যে কথা সমষ্টিকে ন্যায়াকারে ধরিয়া একটি বৈধসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহাই মূর্তি। এইখানে বলা প্রয়োজন যে আচার্য গঙ্গেশ তাঁহার অন্বয়ব্যতিরেকী প্রকরণে সংশয় কারণক অর্থাপত্তি (উত্তরপক্ষ) বিচারে সামান্যতোদৃষ্ট বিভাগের সাহায্য লইয়াছেন।

সকল ন্যায়ের বৈধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য "ন্যায়লীলাবতী" গ্রন্থে 'পরার্থানুমান' প্রসঙ্গে একটী সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায় এবং তাহাকে মৈথিল সূত্র (Dictum-de-omni-nullo) বলা যায় ; লীলাবতীর সূত্রটী এই যে—"অতএব হেতুপদমপি সাধ্যস্বরূপ মাত্রবৎ (পৃঃ—৬০৩)" এবং ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

বর্ধমানোপাধ্যায় ও ভগীরথ ঠক্কুরের যে টীকা পাওয়া যায় তাহা যথাক্রমে Whately ও Mill এর উক্ত Aristetle's dictum ব্যাখ্যানুরূপ।

স্বার্থ ও পরার্থানুমান বিভাগ গৌতম সূত্র স্বতন্ত্র হইলেও বিভিন্ন ন্যায় প্রকরণ প্রমাণে স্বীকৃত বলিয়া উল্লিখিত ১।১।৪ সূত্রের "অথতৎ (স্বার্থং তৎপরং পরার্থম্।)" অংশ ব্যাখ্যারূপে সহজেই গ্রহণীয়; কিন্তু অবশিষ্ট সূত্রানুযায়ী বিভাগ ত্রয়ও যে এই শাস্ত্রের পুনর্জাগরনে সহায়ক হইতে পারে তাহা প্রবন্ধান্তরে বলা যাইবে। মোট কথা প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্যায় প্রস্থান স্বীকার করিয়া নব্য আন্বীক্ষিকীর বিকাশ হইতে পারে।

॥ জগতে অমঙ্গল কেন ? ॥

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিকের "দর্শন" পত্রিকায় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "মঙ্গলময় ও অমঙ্গল" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন যে জগতে যদি এক মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন তাহা হইলে জগতে অমঙ্গল কেন হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে যে ইহার সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে হিন্দু দর্শনেও এ সমস্যার সমাধান নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শঙ্কর-বেদান্তে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদে বলা হইয়াছে যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে "ব্রহ্ম সত্য ও জগত মিথ্যা"; জগৎ যখন মিথ্যা তখন মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই। কিন্তু যতক্ষণ ব্রহ্ম-উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের অমঙ্গলের সহিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। অমঙ্গল প্রধানতঃ দুইপ্রকার, দুঃখ এবং পাপ। দুঃখ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ, তাহার ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে কৃত কাজের ফল।

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪

একব্যক্তি দুঃখী অন্যব্যক্তি (অপেক্ষাকৃত) সুখী, এজন্য যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বরের বৈষম্য আছে, এবং লোকে দুঃখভোগ করে এজন্য যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বর নিষ্ঠুর (ঈশ্বর মঙ্গলময় নহেন), তাহার উত্তর এই যে "সাপেক্ষত্বাৎ"; ঈশ্বর যে কাহাকেও সুখ দেন, কাহাকেও দুঃখ দেন, তাহার কারণ এই যে পূর্বকৃত পুণ্য ও পাপ অনুসারে ঈশ্বর জীবকে সুখ ও দুঃখ দেন, পূর্বকৃত কর্মের মধ্যে ইহজন্মের কর্মও আছে পূর্বজন্মের কর্মও আছে। যদি বলা যায় যে যখন জগৎ সৃষ্টি হয় তখন যে সকল প্রাণী সৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যেও সুখ ও দুঃখ থাকে, সৃষ্টিরপূর্বে তাহারা কি কর্ম্ম করিতে পারে যাহার জন্য তাহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে যে প্রলয় ছিল, তাহার পূর্বেও সৃষ্টি ছিল, এই সকল জীব পূর্বের সৃষ্টিতেও ছিল, তখন তাহারা যে সকল পাপ-পুণ্য করিয়া পূর্বের সৃষ্টিতে ফল ভোগ করে নাই, বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সেই সকল কর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে একটা সৃষ্টি ছিল, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই কথা ব্যাসদেব সূত্রাকারে বলিয়াছেন,

ন, কর্মাবিভাগাৎ, ইতি চেৎ, অনাদিত্বাৎ (ব্রহ্ম-সূত্র ২।১।৩৫)

ন (ঈশ্বর যে জীবকে তাহার পূর্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন তাহা হইতে পারে না)।

কর্মাবিভাগাৎ (প্রলয়ের সময় কর্মের বিভাগ থাকে না বলিয়া), ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি করা যায়, তাহার উত্তর এই যে) অনাদিত্বাৎ (সৃষ্টি অনাদি, প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে একটি সৃষ্টি ছিল)। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শঙ্কর ঋগ্বেদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথা পূর্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্বের সৃষ্টি অনুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় আমাদিগকে এই মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে আমরা চিন্তা করিব যে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে আমরা কোটি কোটিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সকল জন্মে আমাদের যে সকল আত্মীয়স্বজন ছিলেন তাঁহারা এখন কোথায়, সেই সকল জন্মে আমরা যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া উৎফুল্ল বা ম্রিয়মান হইয়াছিলাম এখন তাহার ক্ষীণ স্মৃতিও নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মেও আমাদের যে সকল আত্মীয়স্বজন আছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক অতি অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুর পরে কে কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। বর্ত্তমান জন্মে আমরা যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহারাও কিছু কাল পরে থাকিবে না, তাহাদের স্মৃতিও থাকিবে না, সুতরাং বর্ত্তমান জন্মের আত্মীয়স্বজনের জন্য বেশী চিন্তা করা উচিত নয়; বর্ত্তমান জন্মের সুখ দুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়; চিত্ত স্থির করিয়া সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তাই করা উচিত, যাহাতে মৃত্যুর পর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি, আর এই দুঃখময় সংসারে আসিতে না হয়।

কেহ পাপ কর্ম করিলে দুঃখ পাইবে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বভাব হইলে এরূপ ব্যবস্থা হইত না, ইহাই শঙ্করী প্রসাদবাবুর অভিমত বলিয়া বোধহয়; এজন্য তিনি বলিয়াছেন। "ঈশ্বরের কর্মফলকে বিনষ্ট করিবার শক্তি নাই।" বোধহয় তিনি মনে করেন যে ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হইতেন এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান হইতেন তাহা হইলে জীব যে সকল পাপ আচরণ করিত ঈশ্বর তাহাদের কর্মফল বিনষ্ট করিয়া দিতেন; তাহা হইলে জীবকে দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু তাহা হইলে জগতে পাপের স্রোত বাড়িয়া যাইত, তাহা কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এজন্য আমাদের মনে হয় যে কর্মফল

নষ্ট করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি কর্মফল নষ্ট করেন না, কারণ তিনি মনে করেন যে কর্মফল নষ্ট করা উচিত নয় ; লোকে পাপ করিলে পাপের ফল দুঃখ ভোগ করা উচিত। তাহা হইলে পাপ করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে, এই ভাবে তাহার মঙ্গল হইবে। মনে হয় যে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষি এবং শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণও মনে করিতেন যে পাপ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হইলে ন্যায্য ব্যবস্থা, ইহা ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে। Dr Annie Besant এর কন্যা রুগ্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া মারা গিয়াছিল, খৃষ্টান ধর্ম্মে ইহার যুক্তি সঙ্গত হেতু না পাইয়া তিনি খুব অশান্ত হইয়া ছিলেন। পরে হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ বালিকা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়া ইহজন্মে দুঃখ পাইল। এই চিন্তা তাঁহার অশান্ত চিত্তকে স্থির করিয়া ছিল। তিনি এরূপ ভাবেন নাই "ঈশ্বর কেন তাহার কর্মফল নষ্ট করিয়া তাহাকে সুখী করিলেন না?" Max Muller এরও এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইয়া ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "Why was one child born blind or brought up in a society where its moral nature must suffer shipwreck? Why are the bad so often triumphant and the innocent trampled under foot?" এইরূপ আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত কোনও ধর্ম বা দার্শনিক মত ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। বেদান্ত মতে ইহা পূর্বজন্মের কর্মফল। "But whatever we may think of the premises on which this theory rests its influence on human character has been marvellous. পূর্বজন্মে কি কার্য করিয়াছি তাহা মনে নাই, অথচ ইহজন্মে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে—Max Muller বলিয়াছেন, "But why should we remember our former life if we do not even remember the first two, three or four years of our present life?" তিনি মনে করেন যে Wordsworth এর এই কবিতাতে পূর্ব-জন্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং আজকাল সাধারণতঃ সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে আমরা পূর্বেও জন্মিয়াছিলাম।

The soul that rises with us, our life's star,
Has had elsewhere its setting
And comth from afar.
(The Vedanta Phulosophy, Chapter III)

শঙ্করীপ্রসাদ বাবু গীতার নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "ইহা বৃথা স্তোকবাক্য বলিয়া মনে হয় :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

গীতোক্ত ভগবানের বাক্যকে স্তোক বাক্য বলিবার সাহস প্রাচীন আচার্যদের ছিল না। শঙ্করীবাবু কি ইহা দেখিয়াছেন যে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াও পাপ হইতে মুক্ত হন নাই? বলা বাহুল্য এইরূপ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা অতি দুরূহ। বর্তমান যুগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনেই এই ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দেখাযায়, এবং তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে বোধহয় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।

এপর্য্যন্ত আমরা অমঙ্গলের একটা দিক আলোচনা করিলাম, জগতে কেন দুঃখ আছে। অতঃপর অমঙ্গলের আর একটা দিক আলোচনা করা যাইবে, লোকে পাপ করে কেন। ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হন তাহা হইলে তিনি কাহাকেও পাপ করিতে দিতেন না। এ বিষয়ে বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে যাহার যেরূপ চেষ্টা ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ কর্ম করিতে প্রবৃত্তি দেন, যাহার উত্তম কর্ম করিবার চেষ্টা থাকে ঈশ্বর তাহাকে উত্তম কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, সে উত্তম কার্য করিয়া তাহার ফলে সুখ ভোগ করে। যাহার মন্দ কর্ম করিবার চেষ্টা থাকে ঈশ্বর তাহাকে মন্দ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, সে মন্দকর্ম করিয়া তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করে। যে পূর্বে ভাল কাজ ভাল চিন্তা করিয়াছে, সে ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করে। যে পূর্বে মন্দ কাজ করিয়াছে সে মন্দ কাজ করিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর তদনুসারে ভাল বা মন্দ কাজ করিতে প্রবৃত্তি দেন। অনাদিকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয় নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা যায় :

কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (২।৩।৩৩)

জীবই কর্তা, জীব যদি কর্তা না হইত তাহা হইলে শাস্ত্র যে বলিয়াছেন এই সকল কার্য্য করিবে, এই সকল কার্য্য করিবে না, শাস্ত্রের সেই সকল বাক্য নিরর্থক হইত। যাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই তাহাকে আদেশ দিয়া লাভ কি?

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ (২।৩।৪১)

জীব পর অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে কর্তৃত্ব লাভ করে, কারণ এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। কৌষিতকী উপনিষদ (৩।৮) বলিয়াছেন,

এষ হি এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো।
লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু
কর্ম কারয়তি তং যম্এভ্যো লোকেভ্যঃ অধোনিনীষতে।

"ইনিই অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাকে সাধুকর্ম করান, যাহাকে এই লোক হইতে উর্ধ্বে লইতে ইচ্ছা করেন, ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান যাহাকে এই লোক হইতে নিম্নে লইতে ইচ্ছা করেন।

কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধ অবৈরর্থ্যাদিভ্যঃ (২।৩।৪২)

জীবের সমস্ত পূর্বকৃত প্রযত্ন দেখিয়াই ঈশ্বর জীবকে বিশিষ্ট কর্ম বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধান ও নিষেধ সমূহ ব্যর্থ হইত।

সুতরাং বেদান্তের মতে জীবই কর্তা, কিন্তু ঈশ্বর জীবকে জীবের পূর্বকর্ম অনুসারে কর্তৃত্ব প্রদান করেন, যাহার চিন্তা ভাল, চেষ্টা ভাল সে ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি পায় সে ভাল কাজের কর্তা হয়। যাহার চিন্তা মন্দ চেষ্টা মন্দ সে মন্দ কাজ করিবার প্রবৃত্তি পায়, সে মন্দকাজ করে। এইভাবে পূর্বের চেষ্টা অনুসারে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তা হয়। এই যুক্তিও সংসারের অনাদিত্বের উপর নির্ভর করে। পূর্বকৃত কর্মের দুইটি ফল, এক সুখ দুঃখ ভোগ, আর এক শুভ বা অশুভ প্রবৃত্তি লাভ। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হইয়াও, জীবের পূর্বকৃতকর্ম অনুসারে কাহাকেও ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি দেন, কাহাকেও মন্দকাজ করিবার প্রবৃত্তি দেন, কাহাকেও সুখ দেন কাহাকেও দুঃখ দেন। ঈশ্বর যে ভাল-মন্দ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দিতেছেন আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা মনে করি যে জীব স্বাধীন কর্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব ঈশ্বরের অধীন কর্তা।

পূর্বে যে সকল যুক্তির দ্বারা দেখান হইল যে ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও জগতে সুখ দুঃখ এবং পাপ পুণ্য সঙ্গত হয় সেই সকল যুক্তি, বৈশিষ্ট্যাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদেও প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্মসূত্রের পূর্বোদ্ধৃত সূত্রগুলি সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং একভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এজন্য মনে হয় যে ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে জগতে সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য থাকিতে পারে, তাহার যুক্তি সঙ্গত কারণ পাশ্চাত্য দর্শনে নাই; কিন্তু বেদান্ত দর্শনে পুনর্জন্ম বাদ এবং জগতের অনাদিত্ববাদের দ্বারা এবিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

ইহা সত্য যে জগৎ অনাদি এই কল্পনা আমাদের পক্ষে করা দুরূহ। তাহার কারণ আমাদের মনের শক্তি ক্ষুদ্র। অপর পক্ষে ঈশ্বর একবারই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পূর্বে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার সৃষ্টি করিবার কখনও ইচ্ছা হয় নাই, এরূপ মতও সন্তোষজনক নহে।

পুস্তক পরিচয়

ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. প্রণীত। নির্মল সাহিত্য প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৸৶ + ১৩৫; মূল্য—ছয় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাণী নিকেতন—২১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ এবং বি, সরকার এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

এই পুস্তকখানি পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বি, এ, পরীক্ষার্থী দর্শনের ছাত্রদের জন্য লিখিত। বর্তমানে ত্রৈবার্ষিক বি, এ, পাস্ পরীক্ষার্থীদিগকে বৌদ্ধ, ন্যায় ও বৈশেষিক এই তিনটি দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করিতে হয় এবং ইহা ছাড়া সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয় জানিতে হয়। অনার্স পরীক্ষার্থী-দিগকে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত (অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত)—এই দর্শনগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে হয়। পুরাতন ব্যবস্থায় বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগকেও ভারতীয় দর্শনের এই সকল শাখার সংক্ষিপ্তসার পাঠ করিতে হয় এবং বিশেষভাবে ন্যায় বৈশেষিক ও বেদান্ত পাঠ করিতে হয়। এই পুস্তক-খানি উভয় শ্রেণীর ছাত্রদেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনসমূহের শ্রেণী বিভাগ, ভারতীয় দর্শনে বিচারের স্থান, ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ, ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি ও ভারতীয় দর্শনসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর একাদশটি অধ্যায়ে বেদোপনিষদের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ও ছয়টি আস্তিক দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বি, এ, পরীক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই এই পুস্তকে আছে এবং তাহারা ইহা পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গলা জানেন এবং ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পুস্তকখানিতে বহু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। যেগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়াছে সেগুলি ছাড়াও বিস্তর ছাপার ভুল আছে। এগুলি সংশোধন করা উচিত। পৃঃ ১২২ "যখন আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ....

ইত্যাদি—এই অনুচ্ছেদটিতে লেখকের বক্তব্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাকে সংশোধন করিয়া লেখা আবশ্যক।

যে সকল মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক বা বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি উল্লেখ করিলে বুদ্ধিমান ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকার হইত।

আমরা এই পুস্তকখানির বহুপ্রচার কামনা করি এবং আশা করি যে লেখক ইহার পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশৎ অধিবেশন

"বিশ্বভারতী" বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে, গতবৎসর অক্টোবর মাসে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশত্তম অধিবেশন শান্তিনিকেতনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশন রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর অঙ্গ হিসাবে ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর, ১৯৬১, অনুষ্ঠিত হয়। এইবারকার অধিবেশনে সভাপতির কার্য করিবার জন্য আমন্ত্রিত অন্ততঃ তিনজন অধ্যাপক শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ষট্‌ত্রিংশত্তম দর্শন মহাসভার মূল সভাপতি, বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী টি. আর. ভি. মূর্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে শ্রীহুমায়ুন কবীর কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। "নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা" শাখার মনোনীত সভাপতি, মহীশূরের মহারাজাও আসিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅনিরুদ্ধ ঝা মহাশয় কাজ করিয়াছেন। "দর্শনের ইতিহাস" শাখার সভাপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও পীড়িত ছিলেন বলিয়া উপস্থিত হন নাই। ঐ শাখার সমুদায় প্রবন্ধাবলী অন্যান্য শাখায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। মনোনীত সভাপতিদের মধ্যে কেবলমাত্র, "তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা" শাখার সভাপতি অধ্যাপক জে. এন. মহান্তি এবং "মনোবিজ্ঞান" শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীওয়াই. মাসিহ (Y. Masih) উপস্থিত ছিলেন। সর্বশুদ্ধ প্রায় দেড়শতাধিক ডেলিগেট্ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বৎসর "বৃদ্ধ জয়ন্তী বক্তৃতা" দেন চীনাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীতান্‌-য়ুন-শান্‌। তিনি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বেদান্তদর্শনের উপর "শ্রীমন্ত প্রতাপ শেঠ ভাষণ" দেন বোম্বাই এল্‌ফিনষ্টোন্‌ কলেজের অধ্যাপক শ্রী জে. এন্‌. চাব্‌। উপরন্তু এই অধিবেশনে দুইটি—আলোচনা-চক্র (সিম্‌পোসিয়া) অনুষ্ঠিত হয়; একটির বিষয় ছিল,—"দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ" ও অপরটির বিষয় ছিল, "রাষ্ট্রব্যবস্থা দর্শন—ভিত্তিক হইবে কি না?" খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বহু মৌলিক প্রবন্ধাদি বিভিন্ন শাখা সভাতে পঠিত ও আলোচিত হয়।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের আবাসিকবৃন্দ গীতিআলেখ্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের দর্শন এবং "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করিয়া সমাগত সভ্যবৃন্দের পরিতোষ সম্পাদন করেন। দুইদিন বৃষ্টি হওয়াতে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের কিছু অসুবিধা হয়। বিশ্বভারতীর দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ডেলিগেটদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন বর্তমান বৎসরের বড়দিনের ছুটিতে চণ্ডীগড়ে (পাঞ্জাব) অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লেক্‌চারশিপ্‌ ফণ্ড

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামনীষী অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামের সহিত বাঙ্গলাদেশের দর্শানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচয় আছে। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বিভিন্ন কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং একসময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ দি ফিফ্‌থ অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ দর্শন-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার বিদ্যা ও দর্শন-সাধনার খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই আদর্শ শিক্ষক ও জ্ঞানতপস্বীর সহিত যাঁহারাই সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে সম্প্রতি শ্রীহুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, অধ্যাপক টি. এম্. পি মহাদেবন, অধ্যাপক টি, আর, ভি, মূর্তি, অধ্যাপক জে, এন্, চার্, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের দ্বারা তাঁহার দর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ধনভাণ্ডার (অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লেক্‌চারসিপ ফণ্ড) গঠন করা হইতেছে। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের গুণানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই (বিশেষভাবে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রদিগকে) এই ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দেয় অর্থ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এচ-ডির নিকট ৫৯ বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যিনি চেক্ দিতে চাহেন তাঁহাকে "The Honorary Treasurer, K. C. Bhattacharya Lectureship Fund" —এই নামে চেক্ লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের মূল নিয়মাবলী

(সংশোধিত)

নাম—

১। এই পরিষদটি "বঙ্গীয় দর্শন-পরিষৎ" নামে অভিহিত হইবে।

উদ্দেশ্য—

২। বাঙ্লা ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিচারমূলক আলোচনা, তদ্বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ এবং তদনুরূপ উপায়ে বাঙ্লা ভাষায় দার্শনিক চিন্তার প্রসার এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সভ্য—

৩। এই পরিষদে **সাধারণ ও ছাত্র** এই দুই প্রকার সভ্য গৃহীত হইবে।

৪। সাধারণ ও ছাত্র সভ্যের বাৎসরিক চাঁদার হার যথাক্রমে ৫৲ (পাঁচ টাকা) এবং ২৲ (দুই টাকা)। ইহারা পরিষদের মুখপত্র বিনামূল্যে এবং পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কম মূল্যে পাইবে।

৫। সাধারণ সভ্যদের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও সভাপতি ইত্যাদি নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইবার এবং ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

৬। সকল প্রকার সভ্যেরই প্রথম সভ্য হইবার সময়ে পরিষদের আবেদনপত্র স্বহস্তে যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া সম্পাদকের নিকট দিতে হইবে।

৭। ১লা বৈশাখ হইতে পরিষদের বৎসর গণনা করা হইবে। পরিষদের সভ্যপদ ছাড়িয়া দিতে চাহিলে বৎসর আরম্ভ হইবার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে পরিষৎ-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—

৮। পরিষদের কার্য্যাবলী ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে উক্ত সমিতিই নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

১০। এই সমিতিতে সভাপতি, পরিষদ্-সম্পাদক, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সম্পাদক পদবলে সদস্য থাকিবেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই এবং অন্যান্য সদস্য প্রতিবৎসর পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতি হইতেই ইঁহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতিই পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবে।

১১। এই সমিতির অধিবেশনে চারিজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

১২। প্রয়োজন অনুসারে এই সমিতির অতিরিক্ত সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে।

অধিবেশন ও সভা—

১৩। প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে কলিকাতায় ও ইহার সহরতলীতে বিভিন্নস্থানে পরিষদের অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনসমূহে বাঙ্‌লাভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার আলোচনা এবং দর্শন-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদি হইবে।

১৪। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রথমে পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। এই বাৎসরিক অধিবেশনে একাধিক সভার অনুষ্ঠান হইবে। এই সকল সভায় সভ্যগণ-কর্ত্তৃক দার্শনিক বিচার (Symposium), প্রবন্ধ-পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রভৃতি হইবে।

১৫। সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ও কাল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিবে। সাধারণতঃ এই অধিবেশন প্রতিবৎসর বৈশাখের প্রথমার্দ্ধে হইবে।

১৬। এতদ্ব্যতীত পরিষদের অন্যূন ১০ জন সভ্য বিশেষ কারণ দেখাইয়া লিখিত সম্পাদককে আনুরোধ করিলে তিনি পরিষদের সাধারণ অধিবেশন বৎসরের অন্য সময়েও আহ্বান করিতে পারেন।

১৭। বাৎসরিক অধিবেশনের একটী সভা '**পরিচালনা সভা**' (Business meeting) বলিয়া অভিহিত হইবে। ঐ সভায় পরিষদের পরিচালনা-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইবে; যথা :—(ক) পরিষদ্-সম্পাদক-কর্ত্তৃক বিগত বৎসরের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-পাঠ; (খ) কোষাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পাঠ; (গ) নূতন বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি-গঠন; (ঘ) নূতন বৎসরের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পত্রিকা সম্পাদক-নির্ব্বাচন; (ঙ) বিবিধ।

১৮। সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে এবং বাৎসরিক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে লিখিয়া জানাইবেন, এবং পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাদির সংবাদ সভ্যদের জানাইবেন।

১৯। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সম্পাদক পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২০। পরিষদের গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রস্তাব সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে পরিষদ্-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে; এবং পরিষদ্-সম্পাদক ঐ প্রস্তাব পরিষদের সকল প্রকার সভ্যকে অধিবেশনের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে লিখিয়া জানাইবেন। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ত্রিচতুর্থাংশ সংশোধক সভ্যের সম্মতি ব্যতীত মঞ্জুর হইবে না।

মুখপত্র—

২১। 'দর্শন' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিষদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রিকায় কেবলমাত্র দর্শন-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইবে।

২২। পত্রিকা সম্পাদনের জন্য একজন সম্পাদক অথবা একটী সম্পাদকীয় সমিতি (Editorial Board) নিযুক্ত থাকিবে এবং এই সম্পাদক অথবা সম্পাদকীয় সমিতির সদস্যগণ প্রতিবৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

২৩। এই সম্পাদকীয় সমিতি পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন ব্যাপারে যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

দর্শনের নিয়মাবলী—

২৪। 'দর্শন' প্রতিবৎসর বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ও মাঘ এই চারি মাসে যথাক্রমে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে—সাধারণতঃ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

২৫। দর্শন-পত্রিকার বৎসর পরিষদের বৎসরের ন্যায় বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। যিনি যে বৎসরের জন্য গ্রাহক হইবেন বা পরিষদের সভ্য থাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন।

২৬। 'দর্শনে'র বাৎসরিক মূল্য—ডাকমাশুলসহ ৫৲ (পাঁচ টাকা)। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা।

২৭। 'দর্শনে'র বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইলে ইহার বাৎসরিক মূল্য (পাঁচ টাকা) অগ্রিম দিতে হইবে। কোন সংখ্যা পৃথকভাবে কিনিলে ডাকমাশুলের ব্যয় গ্রাহক বহন করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ভি. পি. ডাক-যোগে পত্রিকা পাঠান হইবে।

২৮। 'দর্শনে'র পুরাতন সংখ্যা সম্ভব হইলে যথামূল্যে পাওয়া যাইবে।

২৯। 'দর্শনে'র প্রবন্ধ-সমূহ যথাসম্ভব পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ-সমূহ হইতে সংগৃহীত হইবে এবং সাধারণতঃ পরিষদের সভ্যগণ-কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি দর্শনে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে—অর্থাৎ পরিষদের সভ্য নহেন এমন ব্যক্তির প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে পারে।

৩০। 'দর্শনে' প্রবন্ধ ছাপাইতে হইলে লেখক পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা মুদ্রিত অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় উহা লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

৩১। প্রবন্ধ-নির্বাচনে পত্রিকা-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে। প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ ডাক টিকিট না পাইলে লেখককে ফেরত পাঠান হইবে না।

৩২। 'দর্শনে' কেবল সাম্পাদকীয়-সমিতি-কর্তৃক অনুমোদিত বিজ্ঞাপন ছাপান হইবে। বিজ্ঞাপনের চাঁদার হার ঐ সমিতির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

সঙ্কলন—

৩৩। পরিষদ্ হইতে বাঙলা ভাষায় লিখিত দার্শনিক পুস্তকাদি প্রকাশিত ও সঙ্কলিত হইবে। গ্রন্থকারের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পাদকীয় সমিতি এই সকল সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকাদির মূল্য পরিষদের সভ্যদের জন্য যথারীতি ধার্য্য করিয়া দিবেন।

৩৪। আবশ্যকতা অনুসারে সম্পাদকীয় সমিতি পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিবার অধিকার থাকিবে।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্য ও 'দর্শন' পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা

	নাম	ঠিকানা
১।	অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম,এ,পি,এচ্-ডি,	৪২বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলি-২৯
২।	,, ,, রাসবিহারী দাস, এম, এ, পি, এচ্-ডি	১৪০সি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯
৩।	,, ,, ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম,এ,পি,এচ্-ডি,	শান্তিনিকেতন, বোলপুর
৪।	,, ,, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম,এ,ডি-লিট.	টাকী গভর্ণমেণ্ট কলেজ, টাকী
৫।	শ্রীমতী মলিনী দাস, এম, এ	১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৬।	শ্রীজানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	১১৫, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা-২০
৭।	অধ্যাপক শ্রীশৈলজাকুমার ভট্টাচার্য্য, এম,এ,ডি-ফিল,	৪৮সি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলি-৬
৮।	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দাশ, এম, এ,	২০৪৩বি, রাসবিহারী এভিঃ, কলি-২৯
৯।	,, কিরণবালা মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ফ্লাট নং ২,১৬১এ, রাসবিহারী এভিঃ, কলি-১৯	
১০।	শ্রীতারকচন্দ্র রায়,	১৭, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট, কলিকাতা-২৯
১১।	অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,	১২, বিপিনপাল রোড, কলি-২৯
১২।	,, ,, কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, ডি-লিট,	৩০ ২, হালদার বাগান লেন, কলি-৪
১৩।	,, ,, গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ,	৬৬।২, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪।	,, ,, পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ,	৪, মল্লিকাডাঙ্গা রোড, বরানগর, কলি-৩৬
১৫।	,, ,, কালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম, এ,পি,এচ্-ডি.	বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন
১৬।	,, ,, অমিয় কুমার মজুমদার, এম-এ,	হুগলি মোহসিন কলেজ, চুঁচুড়া
১৭।	,, ,, কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,	ফ্লাট নং ১৬, ব্লক K, সি,আই, টি, বিল্ডিংস কৃষ্ণোযার রোড, কলিকাতা-১৪।
১৮।	,, ,, অতুকুল মুখোপাধ্যায়, এম,এ,	১৮, টাগোর টাউন, এলাহাবাদ
১৯।	শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়	১৩সি, রামমন্ন রোড, কলি-২৫
২০।	অধ্যাপক শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্,এ, ডি-ফিল্,	৩২, বাউন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২১।	,, ,, শিবপদ চক্রবর্ত্তী, এম,এ,	১৪।১, সুর্যসেন ষ্ট্রীট, কলি-১২
২২।	,, ,, সুধীরকুমার নন্দী, এম্,এ, ডি-ফিল্,	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

নাম	ঠিকানা
২৩। অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্.এ	প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া
২৪। " " রণবীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, এম্.এ	সরশিং দত্ত কলেজ, হাওড়া
২৫। শ্রী.যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	৫৬, ষ্ট্রেইট মাইল রোড, জামসেদপুর
২৬। শ্রীনবীগোপাল সেনগুপ্ত	১৩২।এসি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
২৭। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	প্লট নং ২৩৮, ব্লক এ, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলি-২৮
২৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০
২৯। অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নী দাস ভট্টাচার্য্য, এম্.এ,	প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
৩০। " " অজিতকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্, ও,	টাকি কলেজ, টাকি
৩১। শ্রীপুলিনবিহারী হালদার	১৪, দীনবন্ধু মুখার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া
৩২। অধ্যাপক শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, এম্, ও, ডি-ফিল্	কাঁড়গ্রাম কলেজ, কাঁড়গ্রাম
৩৩। " " সুবোধকুমার দে, এম্, ও,	১।৩.৩, দমদম রোড, কলি-২
৩৪। " " রমেশচন্দ্র মুন্সী, এম্, ও,	৮৭।১২, বোসপুকুর রোড, কলি-৩১
৩৫। গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা	১, বঙ্কিম চাটোর্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২
৩৬। অধ্যক্ষ মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ	আগরতলা, ত্রিপুরা
৩৭। গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী	বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন
৩৮। ডাঃ নক্ষত্রলাল গাঙ্গুলী	বীরহাটা, সি, টি রোড, বর্দ্ধমান
৩৯। অধ্যক্ষ ভিক্টোরিয়া কলেজ	কুচবিহার
৪০। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস	৪০২।১, নেতাজী সুভাষ বসু রোড, পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০।
৪১। অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্.এ.	১৬, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬
৪২। " " রামচন্দ্র পাল, এম্.এ. ডি-ফিল্	কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
৪৩। " " প্রমদানাথ চৌবে, এম্, ও	১।২, গোপাল ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-২৫
৪৪। গ্রন্থাগারিক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ	৩ এবং ৪, কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, কলিকাতা
৪৫। শ্রীমতী শেফালী ঘোষ, এম্.এ	২২এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-২
৪৬। অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত, এম্,এ	টাকী গভর্ণমেন্ট কলেজ, টাকী, (২৪ পরগণা)
৪৭। " " রোহিণীরঞ্জন আচার্য, এম্,এ	১৮৮।৪৮, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলি-৩১
৪৮। শ্রীমতী সুজাতা সিংহ, এম্,এ,	মাঃ লেফ্‌টেনাট কর্ণেল এস্,এম্, সিংহ, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, আর, জি কর, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৪

নাম	ঠিকানা
৪৯। শ্রীপ্রহ্লাদ ভট্টাচার্য্য	২৭এচ্, সিমলা রোড, কলিকাতা-৭
৫০। সেক্রেটারী কুচবিহার ডিষ্ট্রিক্ট, লাইব্রেরী এসোসিয়েসন	কুচবিহার
৫১। শ্রীমতী নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ.	৩৪।সি।১, সুরেন সরকার রোড, পোঃ বেলিয়াঘাটা রোড, কলি-১০
৫২। শ্রীমাংবেন্দ্র মিত্র	৮৭।বি, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯
৫৩। শ্রীমতী কৃষ্ণজাহ্নবী বসু, এম্.এ,	শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বসু, কুলিনপাড়া, পোঃ খড়দহ (২৪ পরগণা)
৫৪। শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম্.এ	২৪০, শিবপুর রোড, হাওড়া
৫৫। অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্.এ	৩১৭।১০, রসা রোড, সাউথ, কলিকাতা-৩৩
৫৬। " " সতীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্.এ	১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯
৫৭। শ্রীমতী সুহিতা চৌধুরী, এম্.এ	১৮১।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬
৫৮। অধ্যক্ষ আনন্দচন্দ্র কলেজ	জলপাইগুড়ি
৫৯। শ্রীমতী ভারতী ঘোষ, এম্.এ	মেদিনীপুর উইমেন্স কলেজ, মেদিনীপুর
৬০। অধ্যাপক শ্রীসলিলাক্ষ গুপ্ত, এম্.এ, পি.এচ্.ডি. ডি-লিট্	৩৯, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯
৬১। অধ্যক্ষ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ	২০, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
৬২। শ্রীমতী দীপ্তি সেন	অমরাবতী, পোঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা
৬৩। " কমলা চট্টোপাধ্যায়	পাচতলা, বি-৫, নিউ সি, আই, টি রোড এণ্টালী, কলি-১৪
৬৪। অধ্যাপক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ	২৭এ, হরিতকীবাগান লেন, কলি-৬
৬৫। শ্রীমতী প্রার্থনা রায়	১০১, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৬৬। " কনিকা গুপ্ত, এম্.এ	৭, বামুরায় ঘোষ লেন, কলিকাতা-৫
৬৭। অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু, এম্.এ	মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, ২০, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলি-৩
৬৮। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী	পি ১১৪, লেক টেরাস, কলি-২৯
৬৯। অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ, এম্.এ	ব্লক E/২৩+২৪ ২৫৬, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬
৭০। শ্রীমতী শোভারাণী বসু, এম্.এ. ডি-লিট্	ডি ১৭, লেডি'স কলোনী হিন্দুবিশ্বালয়, বারাণসী-৫
৭১। শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়	৩২, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলিকাতা-১৯

নাম	ঠিকানা
৭২। অধ্যক্ষ, কান্দীরাজ কলেজ	কান্দী (মুর্শিদাবাদ)
৭৩। শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত, এম্,এ	১৮।৭৪, ডোভার লেন, কলি-২৯
৭৪। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়	৩, আউটরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭৫। অধ্যাপক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্,এ	৬৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯
৭৬। " জীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহি, এম্,এ	কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
৭৭। " প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, এম্,এ	লালবাগান, পোঃ চন্দননগর, জেঃ হুগলি
৭৮। শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, এম্,এ	ফ্লাট নং ২৯, ব্লক্ H, সি, আই, টি বিল্ডিংস ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪
৭৯। ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি-এস,সি	৬৭, যতীন দাস রোড, কলি-২৯
৮০। অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য্য, এম,এ	১৮৮ ২, অশোকনগর পোঃ হাদুরা, ২৪ পরগণা
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	মহিষাদল রাজ কলেজ, মহিষাদল, মেদিনীপুর
৮২। " শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	৪১।৩এবি, চারু এভিনিউ, কলি-৩৩
৮৩। " অনাদিকুমার লাহিড়ী, এম,এ	১।১।১, আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২
৮৪। অধ্যক্ষ মেদিনীপুর কলেজ	মেদিনীপুর
৮৫। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সাহা, এম,এ	২, নীরদবিহারী মল্লিক রোড, কলি-৪
৮৬। " " প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, এ	কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম
৮৭। রেজিষ্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	যাদবপুর, কলিকাতা-৩২
৮৮। শ্রীমতী গৌরীরাণী সেন, এম, এ	সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, ৭২, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৫
৮৯। শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য্য, এম,এ, পি-এচ্-ডি	১০৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৯০। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	২, মদনমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৬
৯১। অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম,এ	১৭।১, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলি-৬
৯২। " " মণীন্দ্রকান্ত দত্ত, এম,এ	৪, মধুপালু লেন, কলিকাতা-৫
৯৩। " " নীরদবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম,এ	পুরাতন চক্, বর্দ্ধমান
৯৪। " মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এম,এ	৬ ১এ, প্রতাপাদিত্য রোড, কলি-২৬
৯৫। " বিশ্বনাথ সেন, এম,এ	৮বি, মধুর সেন গার্ডেন লেন, কলি-৬
৯৬। " বিরজাবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম,এ	মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

নাম	ঠিকানা
৯৭। অধ্যাপক শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন, এম,এ	১৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৯৮। " " ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম,এ	সেণ্ট জোসেফ'স কলেজ, দার্জিলিং
৯৯। শ্রীমতী বন্দনা সেন, এম,এ, বি-টি	মহারাজাধীরাজ উদয়চাঁদ উইমেন্স কলেজ, বর্দ্ধমান
১০০। অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী, এম,এ, পি,এচ,-ডি	৩বি, নবীন সরকার লেন, কলি-৩
১০১। অধ্যক্ষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ	নৈহাটি
১০২। শ্রীমতী ঋতা দাস	দি এবোড (The Abode) ৪৪।১বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১০৩। অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম,এ	১৮।১, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলি-৪
১০৪। " " অনিলকুমার সরকার, এম,এ, ডি-লিট	University Park Peridenya, Ceylon
১০৫। শ্রীমতী গোপালী মুখোপাধ্যায়	কালি গলি, কটক-২
১০৬। গ্রন্থাগারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী	বালুরঘাট
১০৭। অধ্যাপক শ্রীকালীপদ বক্সী, এম,এ	৪বি, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলি-২৬
১০৮। " " মৃণালকান্তি ভদ্র, এম,এ	৯, সত্যেন রায় ব্রাঞ্চ রোড, কলি-৩৪
১০৯। শ্রীমতী অলকা ঘোষ	উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি
১১০। অধ্যক্ষ গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ	১১, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলি-২০
১১১। শ্রীমতী রুবী মুখার্জ্জী	কাঠগড়াপাহি, কটক-১
১১২। অধ্যক্ষ গুরুচরণ কলেজ, শিলচর	শিলচর, আসাম
১১৩। অধ্যাপক শ্রীদারুনাথ বসু, এম,এ	৬৯৭, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলি-৩৪
১১৪। শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র	৪।২বি, কাঁটাপুকুর লেন, কলি-৩
১১৫। " রমা ঘোষ, এম,এ	ফ্লাট নং ৪, ১৩, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলি-৪
১১৬। প্রতিভা সরকার	২৮।৭, গড়িয়াহাট রোড, কলি-২৯
১১৭। লীলিমা দেবী	কেয়ার অফ অধ্যাপক এস্, কে, নন্দ এম্ পি, সি, কলেজ, পোঃ বারিপদ ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা
১১৮। গ্রন্থাগারিক, যোগমায়া কলেজ	৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কলি-২৬
১১৯। শ্রীঅমলকুমার ঘোষ	৩ : , রাজেন্দ্র রোড, কলিকাতা-২৩
১২০। অধ্যক্ষ শ্রীচৈতন্য কলেজ	পোঃ বৈগাছি, হাবড়া, ২৪ পরগণা
১২১। অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রশেখর দেবনাথ, এম,এ	হুগলি মোহসিন কলেজ, চুঁচুড়া
১২২। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য	বোসের ঘাট, কনকশালী, পোঃ চুঁচুড়া

নাম	ঠিকানা
১২৩। শ্রীকৃষ্ণকান্ত মল্লিক	৩২এ, উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, কলি-৩
১২৪। ,, শিবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৩৩, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩
১২৫। ,, অবনীভূষণ রায়	২০, হরচন্দ্র মল্লিক লেন, কলিকাতা-৫
১২৬। ,, বৈজনাথ ভিওয়ানিওয়ালা	৩, গোয়েঙ্কা লেন, কলিকাতা
১২৭। শ্রীমতী করুণা ভট্টাচার্য্য, এম,এ	২৪ নং কক, এ, আই, ডব্লিউ, সি, ওয়ার্কিং গার্লস হোষ্টেল, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪
১২৮। অধ্যক্ষ মহারাজাধিরাজ, উদয়চাঁদ উইমেন্স কলেজ	বর্দ্ধমান
১২৯। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি, এম,এ পি-এচ্-ডি	পি ৫১৯ বি পঞ্চিতিয়া এক্সটেনশন, কলিকাতা-৪২
১৩০। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম,এ	পো: ব্যবস্থারহাট, মেদিনীপুর
১৩১। অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	৫৭, বক্সিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলি-৪
১৩২। শ্রীমতী বেলা রায় চৌধুরী, এম, ও	৬৬এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলি-৬

Statement about ownership and other particulars about the newspaper **Darsan** *to be published in the first Issue every year after the last day of February.*

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly.
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane,
5.	Editor's Name	Sri Kali Krishna Banerjee
	Nationality	Indian
	Address	Flat No. 16, Block K. C. I. T. Buildings, Cristopher Rd., Cal.14
6.	Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total Capital.	Bangiya Darsan Parisad 20/2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4

1. Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particular given above are true to the best of my knowledge and behalf.

Dated 24th March, 1962

K. C. Gupta
Signature of Publisher

21 AUG 1962

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১·২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C. GUPTA. from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32E, Lansdowne Road, Calcutta—20

April—1962—200.